জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৯

দ্বিতীয় খণ্ড } ঊনবিংশ বর্ষ { ষষ্ঠ সংখ্যা

নূতন মনোবিদ্যা

ডক্টর শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র এম-এ, পিএইচ-ডি

মানুষের মন স্বতঃই বহির্মুখী। বাহিরের জিনিষের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া তাহার পক্ষে স্বাভাবিক ও সহজ; অন্তরের জিনিষের খবর লওয়া কঠিন, তাই সাধন-সাপেক্ষ। কেবল শিশুরাই শুধু বাহিরের জিনিষ লইয়া ভুলিয়া থাকে। শিশুর বয়স বৃদ্ধি হইলে, কিশোর যৌবনে পদার্পণ করিলে বাহিরের জিনিষ শুধু বাহিরের জিনিষ হিসাবে আর তাহার মনে স্থান পায় না। বাহিরের জিনিষ যখন নিজের মনের প্রতিবিম্বরূপে, নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির বিষয়রূপে সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখনই তাহার হাকে যুবকের মন সাড়া দেয়। মন তখন সুখদুঃখ অনুভব করিতে শিক্ষা করিয়াছে, নিজের দিকে চাহিতে আরম্ভ করিয়াছে, অন্তর্দৃষ্টির সূচনা হইয়াছে। জীবনধারণের জন্য যতটুকু আবশ্যক, সাধারণতঃ ততটুকু অন্তর্দৃষ্টিই বিকশিত হয়। ততটুকুই যথেষ্ট।

ব্যষ্টি মন যে পথ ধরিয়া বিকশিত হয় সমষ্টি মনের বিকাশের পথও তদ্রূপ। তাই বিজ্ঞানচর্চ্চার প্রথম যুগে পদার্থবিদ্যাই একমাত্র আলোচনার বিষয়,—সমষ্টি মন তখন শিশু-মনের মতই বহির্মুখী। Newton, Kepler, Galileo, এই যুগের পুরোহিত। তাহার পর এই সমষ্টি মন যখন নিজের দিকে ফিরিল, মনোবিদ্যার চর্চ্চা,

আরম্ভ হইল। Fechner, Wandt প্রভৃতি এই যুগের প্রবর্ত্তক।

মনোবিদ্যার আলোচনায় দেখা গেল, মন সমতল ভূমি নহে। এখানে পর্ব্বত আছে, সমুদ্র আছে, আগ্নেয়গিরি আছে, স্রোতস্বতী-ধারা আছে, সুগন্ধ পুষ্প-পরিপূর্ণ উদ্যান আছে, আবার জঘন্য কীট পতঙ্গাদি সমাকুল অন্ধকারময় গহ্বরও আছে। কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে আমরা মনের এই পরিচয়ই পাই। সাহিত্যে বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া প্রেমের বন্যা বহে, করুণাধারায় জগৎ প্লাবিত হয়, প্রতিজ্ঞা হিমালয়ের মত অটল থাকে, Vesuviusএর অগ্ন্যুদ্গীরণের ন্যায় হঠাৎ ক্রোধের বিকাশ হয়, হিংসার বিষ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, আবার প্রশান্ত মহাসাগরের মত স্থির ধীর উদার চরিত্র বিরাজ করে।

কিন্তু যুগের হাওয়ার পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। এখন হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ কত উচ্চ, কেবলমাত্র তাহা জানিয়া লোকে সন্তুষ্ট হয় না; সেই অত্যুচ্চ শিখরে কি আছে তাহা জানিবার জন্য তথায় অভিযান করে। মহাসাগরের মহা গভীরতার বিষয়ে শুধু জ্ঞান লাভ করিয়া তৃপ্তি হয় না, তাহার সর্ব্বনিম্ন স্তরে কি রত্ন লুক্কায়িত আছে তাহা জানিবার জন্য মানুষ তথায় পৌঁছিতে চেষ্টা করে। বহির্জগতে যেরূপ, অন্তর্জগতেও সেইরূপ। মানব-মনের উচ্চাকাঙ্ক্ষার মূল কি, মনোরাজ্যের সর্ব্বনিম্ন স্তরে কি আছে তাহা জানিবার কৌতূহলও অদম্য হইয়া উঠিল। তাই মনের মধ্যেও ডুবুরী নামিতে লাগিল। Vienna সহরের এক মহাপণ্ডিত প্রথম এই গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে সাহস করিলেন। তিনি তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধিরূপ আলোকের সাহায্যে সেই প্রদেশে লুক্কায়িত চিন্তা-কণার ও ভাব-সমষ্টির সাক্ষাৎলাভ করিলেন। বাহিরে আসিয়া তিনি সেই বিষয় সকলকে জানাইলেন। কিরূপে, কোন্ পথে তথায় প্রবেশ করিতে পারা যায়, তাহারও ইঙ্গিত করিলেন। কেহ বিশ্বাস করিল, বহু লোক করিল না। ক্রমে অনেকেই তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথে যাইতে আরম্ভ করিলেন ও তাঁহার আবিষ্কারের সত্যতা উপলব্ধি করিয়া মোহিত হইলেন। Viennaর সেই পণ্ডিতের, সেই প্রথম পথনির্দ্দেশকের নাম Sigmund Freud। আজ তাঁহার নাম বিশ্ববিখ্যাত; তাঁহার প্রবর্ত্তিত পথ সর্ব্বজনবিদিত।

সেই সর্ব্বজনবিদিত মনোবিশ্লেষণের পন্থার নাম Psycho-Analysis বা মনসমীক্ষণ। সর্ব্বজনবিদিত হওয়ায় একদিকে যেমন এই বিদ্যার ব্যাপ্তির পরিচয় পাই, অন্যদিকে তেমনি এই সম্বন্ধে ধারণার বৈলক্ষণ্যও যথেষ্ট দেখি। অসম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক ধারণারও অভাব নাই। যাহা হউক, সেই সমস্ত প্রচলিত ধারণার যথার্থতা বা অযথার্থতা বিচার না করিয়া এই প্রবন্ধে মনসমীক্ষণ সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কয়েকটী কথা বলিবার চেষ্টা করিব।

কারণ বিনা কার্য্য হয় না, এ কথা প্রাকৃতিক ব্যাপার সম্বন্ধে মানিয়া লইতে কাহারও আপত্তি হয় না। ইহাই হইল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানবিদ্দের গোড়ার কথা। কিন্তু, মানসিক ব্যাপারে এই রীতি মানিয়া লইতে পূর্ব্বে অনেকেই ইতস্ততঃ করিয়াছেন, এখনও করেন। মনোবিদ্যা বিষয়েও এই রীতি যে সম্পূর্ণ গ্রাহ্য, শুধু যুক্তিশাস্ত্রের দিক্ হইতে নয়, দৈনন্দিন মানসিক কার্য্যকলাপের বিশ্লেষণ হইতেও তাহা দেখা যায়। যেমন প্রাকৃতিক ব্যাপারে, তেমনি মানসিক ব্যাপারেও আকস্মিক (chance) বলিয়া কোন জিনিষ নাই। হঠাৎ আমার মনে কোন চিন্তার উদয় হইল, হঠাৎ অস্বাভাবিক ক্রোধের উদ্রেক হইল, এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কিন্তু অনুসন্ধান করিলে কি কারণে ঐ চিন্তার, ঐ ভাবের উদয় ঐ সময়ে হইয়াছিল, তাহা ধরা পড়িবে। বস্তুতঃ এই কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ মানসিক ব্যাপারেও মানিয়া লইতে না পারিলে মনসমীক্ষণ সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা করা অসম্ভব হইবে। প্রশ্ন হইতে পারে, তবে কি মানুষের ইচ্ছা, মানুষের চিন্তা স্বাধীন নয়? সমস্ত কার্য্যকলাপই কি তাহার নিয়মের দাস? তাহা হইলে ধর্ম্ম, সমাজনীতি প্রভৃতির অর্থ কি? এই প্রবন্ধে ধর্ম্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিবার অবকাশ হইবে না; শুধু এই কথা বলিয়া রাখিতে চাই যে, ধর্ম্ম সমাজনীতি সংক্রান্ত ধারণা ও আদর্শসমূহও মনের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত মনের আইন মানিয়া তাহারাও চলে। ধর্ম্মভাবেরও পরিণতি হয়, সমাজনীতিরও ক্রমবিকাশ আছে।

মনসমীক্ষণ মনকে বল ও গতিধর্ম্মশালী (dynamic) বলিয়া মানে। প্রাকৃতিক ব্যাপার যেমন এক জড়শক্তির নানা রকমের বিকার মাত্র, মানসিক ব্যাপারও সেইরূপ এক মানসিক শক্তির নানা ভাবের অভিব্যক্তি মাত্র।

মনসমীক্ষীদের এই ধারণা মনোবিজ্ঞানক্ষেত্রে নূতন নহে। তবে মনের বিভিন্ন স্তরের কল্পনা ও তাহাদের কার্য্যাবলীর বিচারই মনসমীক্ষণের নূতন ও অমূল্য দান।

আমরা যখন কোন একটী বস্তুর দিকে চাহিয়া থাকি, তখন সেই বস্তুটিই আমরা সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কার রূপে দেখিতে পাই। তার আশপাশের দ্রব্যাদিও দেখিতে পাই বটে, কিন্তু ততটা পরিষ্কার ভাবে নয়। আরও দূরের জিনিষ আর দেখিতে পাই না। মনোজগতেও এইরূপ। এখন এই মুহূর্ত্তে যে বিষয়টী চিন্তা করিতেছি, সেইটীই সর্ব্বাপেক্ষা পরিস্ফুট ভাবে মনের সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে যাহা চিন্তা করিয়াছি, যাহা এখনও আবার মনে করিতে পারি, তাহা অত পরিস্ফুট নহে, তাহা মনে ঠিক এই স্তরের নিম্নে আছে। আবার অনেক চেষ্টা করিয়াও যাহা এখন একেবারেই মনে করিতে পারি না, মনের সর্ব্বনিম্ন স্তরে তাহাদের স্থান কল্পনা করিতে পারি। এই তিনটী স্তরের নাম যথাক্রমে conscious বা সংজ্ঞান, pre-conscious বা আসংজ্ঞান ও un-conscious বা নির্জ্ঞান।

এই যে কোন কোন কথা একেবারেই মনে করিতে পারি না, তাহা সকলেই জানেন। ভুলিয়া যাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ভুলিয়া যাওয়া স্বাভাবিক হইলেও, কি ভুলিয়া যাইব, আর কি মনে করিয়া রাখিব, তাহার মধ্যে যে একটী সমস্যা রহিয়া যাইতেছে তাহা অনেকেই উপলব্ধি করেন না। বাল্যকালের একটী কথা কেন ভুলিয়া গিয়াছিলাম, সেই সময়ের আর একটী কথা কেনই বা মনে করিয়া রাখিলাম, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিবার বিষয়। এই অনুসন্ধানের ফলেই নির্জ্ঞান সম্বন্ধে এবং সঙ্গে সঙ্গে মনের কার্য্যপ্রণালীর সম্বন্ধে Freud অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি মনোবিদ্যার দিক্ হইতে এই চর্চ্চা আরম্ভ করেন নাই। তিনি চিকিৎসক; মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের চিকিৎসাকল্পে, বিশেষতঃ একটী হিষ্টিরিয়া রোগীর চিকিৎসাকালে তিনি এই সমস্ত তত্ত্বের সন্ধান পান। ক্রমশঃ এই তত্ত্বানুসন্ধানই তাঁহার প্রধান কার্য্য বলিয়া গ্রহণ করেন; এবং সেই অবধি, মনো-বিদ্যালোচনার সেই শুভ মুহূর্ত্ত হইতেই, এই কার্য্যে তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।

সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে তাঁহার মতে কামই আমাদের অনেক কার্য্যের, অনেক চেষ্টার মূল। এ কথায় চমকিত হইবার, কিম্বা ভ্রূ কুঞ্চিত করিবার কিছুই নাই। কাম শব্দ অতি ব্যাপক। ইহাতে শুধু স্ত্রীপুরুষের রমণেচ্ছাই বুঝায় না। চতুর্ব্বর্গের ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষে কাম শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হয় Freudএর Libido বা কাম সেই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। মানুষ সমাজে বাস করে। সমাজের আইন মানিয়া তাহাকে চলিতে হয়; তাই তাহার সমস্ত প্রকারের অসামাজিক ইচ্ছা পূরণ হইতে পায় না। ইচ্ছা হইলেই আর এক জনকে মারিয়া ফেলা যায় না। কতক ইচ্ছা তাই দমন করিতেই হয়। এরূপ অসামাজিক ইচ্ছা যে মানুষ মাত্রেরই, এমন কি সামাজিক হিসাবে খুব উন্নত ব্যক্তিরও মনে মাঝে মাঝে উদয় হয়, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। সাহিত্যিকদের মধ্যে সমালোচককে দুই ঘা কসাইয়া দিবার ইচ্ছা বোধ হয় খুব বিরল নহে। সকলের অপেক্ষা অসামাজিক ইচ্ছা এবং সেই জন্য সকলের চেয়ে বেশী অবদমিত হয় কাম-সংক্রান্ত ইচ্ছা। তাই মন-সমীক্ষণশাস্ত্রে কামের কথা এত বেশী থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মন বল ও গতিধর্ম্মী। যে সমস্ত ইচ্ছা অবদমিত হয় অর্থাৎ নির্জ্জনে চলিয়া যায়, তাহারা তথায় নিশ্চেষ্ট থাকে না। জোর করিয়া ডোবান গোলার মত ক্রমাগতঃ উপরে উঠিবার চেষ্টা করিতে থাকে; কিন্তু সোজা পথে উপরে উঠিতে তাহারা বাধা পায়। কোথা হইতে বাধা আসে, তাহাই এইবার বলিব।

সভ্যতার ও সমাজের কতকগুলি আদর্শের ভিতর দিয়া শিশু-মন গঠিত হইতে থাকে। শিশু সে আদর্শগুলিকে বিচার না করিয়া অজ্ঞাতসারেই গ্রহণ করে। সর্ব্বোচ্চ এবং সর্ব্ব-নিম্ন স্তরের সংঘাতে ক্রমশঃ মনের মধ্যেই একটী ব্যবধানের সৃষ্টি হয়। Freud তাহার নাম দিয়াছেন Censor বা প্রহরী। প্রহরী বা Censor এর কাজ কি, আমাদের রাজনৈতিক অবস্থার কৃপায় তাহা বুঝিতে আর কষ্ট করিতে হইবে না। মনের প্রহরী যাহা কিছু অসামাজিক বলিয়া মনে করে, তাহাই অবদমন করে। যে ইচ্ছা অবদমিত হয়, তাহা যে বাস্তবিক আমাদের নিজের মনেরই ইচ্ছা তাহা জানিতে পারি না। প্রশ্ন হইতে পারে,

এরূপ অবদমিত ইচ্ছা যে আছে তাহা স্বীকার করিব কেন? এ প্রশ্ন স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত।

আমরা দেখিতে পাই সমুদ্রের স্রোত একদিকে কিন্তু উহাতে ভাসমান বরফের স্তূপ অন্যদিকে চলিতেছে। উহা হইতে এই তথ্যে উপনীত হওয়া গেল যে, বরফস্তূপের যতটুকু অংশ উপরে দেখিতেছি, ততটুকুই উহার সব নয়। নীচে আরও আছে; এবং নীচের জলের স্রোতের টানে অন্যদিকে চলিতেছে। আগ্নেয়গিরি হইতে হঠাৎ ধূম নির্গত হইতে থাকিলে এই সিদ্ধান্তই করি যে, যদিও অগ্নি দেখিতে পাইতেছি না, গিরি-গুহাভ্যন্তরে উহা বিদ্যমান আছে। এইরূপ সর্ব্বাবস্থাতেই কার্য্য দেখিয়া আমরা কারণ অনুমান করি এবং পরে তাহার সত্যতা পরীক্ষা করি। মানসক্ষেত্রেও ঠিক ঐ ভাবেই বিচার করিতে হইবে। একটী লোকের অপর কোন ব্যক্তির সহিত ব্যবহারে যদি দেখিতে পাই যে, দ্বিতীয়োক্তটী ঘরে আসিলেই প্রথমোক্তটী উঠিয়া যায়, অন্য লোকের সহিত মিষ্ট আলাপন করিলেও ইহারা দুজনে পরস্পরের সহিত মন খুলিয়া কথা কয় না, তাহা হইলে উহারা স্বীকার না করিলেও বুঝিতে পারা যায় যে, উহাদের মধ্যে সদ্ভাবের নিশ্চয়ই প্রাচুর্য্য নাই। সেইরূপ, নিজের ব্যবহার নিজেই বিশদভাবে পর্য্যালোচনা করিলে যদি এইরূপ কোন ঘটনার আভাস পাই, তাহা হইলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হয় যে, আমার মনে কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতি শত্রুভাব লুক্কায়িত আছে। সংজ্ঞানে তাহার প্রতি বিরূপতার কোন কারণ খুঁজিয়া না পাওয়া যাইলেও নির্জ্ঞানে তাহার কারণ বিদ্যমান আছে বুঝিতে হইবে। আবার শুধু যুক্তির দিক দিয়া নয়, যখন দেখা যাইতেছে Freud এবং অন্যান্য দেশে আরও অনেক চিকিৎসক যেমন Ferenzei, Jones, Brill,—আমাদের গিরীন্দ্রশেখর বাবুও ঐ তথ্য ভিত্তি করিয়া মানসিক ব্যাধির প্রতিকারে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন;—তখন নির্জ্ঞান মনে অবদমিত ইচ্ছা প্রভৃতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস দৃঢ়তর না হইয়া আর পারে না।

সাধারণতঃ নির্জ্ঞানের ও সংজ্ঞানের মধ্যে একটা আপোষ বন্দোবস্ত থাকে। সেই বন্দোবস্তের ব্যতিক্রম ঘটিলেই দৈনন্দিন ব্যবহারে তাহা ধরা পড়িয়া যায়। সামান্য বাতিক হইতে আরম্ভ করিয়া দুরারোগ্য মানসিক ব্যাধি পর্য্যন্ত তাহা হইতে ঘটিতে পারে। অধিকাংশ মানসিক রোগের লক্ষণগুলি অবদমিত ইচ্ছার প্রতীক মাত্র; কিম্বা সেই ইচ্ছাকে সংজ্ঞান আক্রমণ করিতে না দিবার ছল মাত্র।

সহজ মানুষেরও অবদমিত ইচ্ছার কাল্পনিক পরিতৃপ্তি অনেক প্রকারে হয়। একটী উপায় স্বপ্ন। প্রথমেই বলিয়া রাখি, এই স্বপ্ন সম্বন্ধে কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে অসমর্থ। একদিন স্বপ্ন দেখিলাম বহুদিন-বিস্মৃত বহুদূরস্থিত কোন বন্ধু মৃত্যুশয্যায় শায়িত আছে, শয্যাপার্শ্বে তাহার আত্মীয় স্বজন ক্রন্দন করিতেছে। এক সপ্তাহ পরে স্বপ্ন সত্যে পরিণত হইল। এই ধরণের দৃষ্টান্ত হয় ত কেহ কেহ নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে উপস্থিত করিতে পারিবেন। প্রশ্ন এখানে, স্বপ্ন ভবিষ্যদ্‌বাণী কি না। এরূপ দৃষ্টান্ত স্বপ্ন-সাহিত্যে বেশী আছে বলিয়া আমার জানা নাই। স্বপ্নের ভবিষ্যৎ-নির্দ্দেশ বৈজ্ঞানিক প্রমাণ-সাপেক্ষ কি না তাহাও অনুসন্ধান করা আবশ্যক। যুক্তিসম্মত সহজ সরল ব্যাখ্যা থাকিতে অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নয় বলিয়াই মনে হয়।

স্বপ্ন যে ইচ্ছারই পরিস্ফূর্ত্তি, ছোট শিশুদের স্বপ্নে তাহা বেশ প্রতিপন্ন হয়। ছেলেকে লইয়া Botanical gardenএ যাইবার প্রস্তাব হইল। তাহাতে সে বেশ মাতিয়া উঠিয়া অনেক আশা অনেক কল্পনা করিল। কিন্তু কার্য্যগতিকে যাওয়া ঘটিয়া উঠিল না, ছেলে দমিয়া গেল। রাত্রে স্বপ্ন দেখিল, সে Botanical gardenএ বেড়াইতেছে। এখানে কার্য্যতঃ যে ইচ্ছা পূরণ হইল না, স্বপ্নে তাহা কাল্পনিক ভাবে চরিতার্থ হইল। বয়স্ক ব্যক্তিদের ইচ্ছা সব সময়ে অত সরল কিম্বা অত নির্দ্দোষ হয় না। তাই সেই সব ইচ্ছা অত সহজে সংজ্ঞানে আসিতে পারে না। তখন ইচ্ছার এক একটী অংশ এক একটী প্রতীকের সাহায্যে স্বপ্নে দেখা দেয়। নিজের হিংস্র-প্রকৃতি ব্যাঘ্রের রূপে দেখা দিল; যাহার উপর আক্রোশ সে হয় ত অন্য ক্ষুদ্র জন্তুরূপে আসিল এবং স্বপ্নে দেখিলাম ব্যাঘ্র ভীষণভাবে ক্ষুদ্র জন্তুটীকে আক্রমণ করিয়াছে। এইরূপে নিজের বাসনা চরিতার্থতা লাভ করিল। যেরূপ দেখি সেই ভাবেই লইলে স্বপ্ন সম্পূর্ণ নিরর্থক বলিয়া মনে হওয়া বিচিত্র নয়। Freud বলেন, স্বপ্নে যাহা বাস্তবিক দেখি, তাহা উহার manifest content বা ব্যক্ত অংশ। উহার অনেকটীই প্রতীক দিয়া গঠিত। সেই সমস্ত প্রতীকের অর্থ নির্ণয় করিতে পারিলে যাহা পাই, তাহা উহার latent content বা স্বপ্নের অব্যক্ত অংশ। এই অব্যক্ত অংশের ভিতর অসামঞ্জস্য কিছুই থাকে না। পরস্পর সঙ্গতিসম্পন্ন পরিষ্কার অর্থ তাহা হইতে পাওয়া যায়। এবং সেই অর্থ আবার অতৃপ্ত অবদমিত বাসনার পরিতৃপ্তি। এক ব্যক্তি স্বপ্ন দেখিল যে, সে খালি পায়ে, কেবলমাত্র চাদর গায়ে দিয়া রাস্তায় বেড়াইতেছে। ঐ বেশ অশৌচের প্রতীক। বিশ্লেষণে জানা গেল, সে তাহার পিতার মৃত্যুকামনা করিতেছে।

সুস্থ ব্যক্তিদের ইচ্ছার নির্জ্ঞান হইতে সংজ্ঞানে আসিবার আর একটী উপায়ের নাম Sublimation অর্থাৎ উদ্গতি। কোন অসামাজিক ইচ্ছার পরিতৃপ্তি না হওয়াতে যদি সেই বৃত্তি কোন সমাজ-অনুমোদিত পথ অবলম্বন করিয়া বাহিরে প্রকাশ পায় তাহাকে বলে উদ্গতি। শিশুকালে অন্যের কোন অঙ্গ দর্শন বাসনা হইতে পরিণত বয়সে চিকিৎসা-শাস্ত্রে প্রগাঢ় অনুরক্তি হওয়া ও তাহাতে পারদর্শিতা লাভ করার কথা নূতন নহে। ব্যর্থপ্রেমিক হঠাৎ শিকারী হইয়া দক্ষিণ আফ্রিকার জঙ্গলে বড় বড় জানোয়ার শিকার করিয়া বেড়াইতে লাগিল, কিম্বা হঠাৎ অসম্ভব রকম ধার্ম্মিক হইয়া উঠিল, এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব কি? সাহিত্যে এরূপ চরিত্র আপনারা নিজেরাই অনেক সৃষ্টি করিয়াছেন।

এইরূপ সমস্ত সোজাসুজি পথ যখন উন্মুক্ত না থাকে, তখনই রোগের সূত্রপাত হয়। মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের অবদমিত বাসনা যে কত রকমে নিজেদের চরিতার্থতা লাভে প্রয়াস পায়, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক একটী রোগীর এক একটী পথ। তবে কতকগুলি বড় বড় লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া রোগসমূহের শ্রেণী-বিভাগ করা হইয়াছে। কিন্তু সে সমস্ত বর্ণনা করা আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। অসংখ্য রোগীর আত্মকথা শুনিতে শুনিতে Freud আর একটী সারবান তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে ও সেইমত কার্য্য করিতে পারিলে সমাজের প্রভূত কল্যাণ হইতে পারে। এই তথ্য শিশুমন-সম্বন্ধীয়।

সাধারণতঃ সকলেরই ধারণা, শিশুমন বড় নির্দ্দোষ; সেখানে যে কাম-বাসনার কালিমাময় কোন আঁচড় পড়িতে পারে, এ কথা বাতুলের প্রলাপের ন্যায় উড়াইয়া দিবার যোগ্য বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। কাম-বাসনা কালিমাময় কি না বা মনে তাহার উদ্রেক হওয়া দোষের কি না সে বিচার মনোবিদ্‌রা করেন না। যাহা হয়, তাহা লইয়াই তাঁহাদের কারবার। সুতরাং ঐ বিশেষণগুলি বাদ দিয়া তাঁহারা বলেন শিশু-মনে কামের উদ্রেক হয়। কিশোরবয়সে হঠাৎ একদিন কামচেতনা জাগে না। কিশোর-বয়সপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই নানা স্তরের ভিতর দিয়া ঐ কামপ্রবৃত্তি আস্তে আস্তে অগ্রসর হয়। এমন কি Freudএর মতে পাঁচ বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বেই মানবচরিত্রের মূলভিত্তি স্থাপিত হইয়া যায়। কাম-প্রবৃত্তির এই ক্রম-জাগরণের একটী বিশেষ ধারা আছে ও অনেকগুলি স্তর আছে। মানসিক রোগীমাত্রেরই রোগের কারণ নির্ণয় করিতে যাইয়া দেখা গিয়াছে যে, এই ধারার কোন না কোন ব্যতিক্রম হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে শিশুদিগের পিতামাতার কিম্বা অন্য যাঁহাদের উপর তাহাদের ভার ছিল, তাঁহাদের অজ্ঞতা নিবন্ধনই উহা ঘটিয়াছে; কতক ক্ষেত্রে সহজাত দোষই ইহার কারণ।

এইবার, আমাদের সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে অবদমিত ইচ্ছা কিরূপে আপনাকে ব্যক্ত করে তাহার কিছু পরিচয় দিব। একটী পরিচিত নাম প্রয়োজনের সময় বিস্মৃত হওয়া বোধ হয় কোন না কোন সময়ে সকলের অভিজ্ঞতাতেই আসিয়াছে। মনসমীক্ষণের দ্বারা অনেক সময় দেখা যায়, সেই নামের সহিত কোন একটী অপ্রীতিকর ঘটনা জড়িত আছে। সেই অভিজ্ঞতাটী পুনরায় মনে আনিতে চাহি না; তাই তাহার সহিত জড়িত নামটীও ভুলিয়া যাই। হাঁসপাতালে কোন রোগীর একটী নার্সের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছিল। কিন্তু হাঁসপাতাল হইতে ফিরিবার পর নার্সকে পত্র লিখিবার সময় তাহার বড় মুস্কিল হইতে লাগিল। কিছুতেই নার্সের পদবী মনে করিতে পারে না। নার্সের চিঠি দেখিয়া কিছু সুবিধা হইল না, কারণ সমস্ত চিঠিতেই সে গোড়ার নামই সই করিয়াছে। একবার ক্রমান্বয়ে তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত পদবী মনে করিতে পারিল না এবং পত্রও পাঠাইতে পারিল না। বিশ্লেষণে জানা গেল, লোকটী পূর্ব্বে আরও দুইটী মেয়েকে ভালবাসিয়াছিল। তিনজনেরই প্রথম নাম একই। সে নাম সে ভুলে নাই। পদবীটি ভুলিয়া যাইয়া তিনজনকে এক করিয়া মনে মনে সে

তাহার প্রেমের পাত্রের নিকট খাঁটীই রহিয়া গেল। আমাদের যাহা দেয় তাহা ভুলিয়া যাই যেমন রবিবাসরের চাঁদা প্রভৃতি কিন্তু যাহা প্রাপ্য তাহা মনে থাকে। পকেটের চিঠি পকেটেই থাকিয়া যায়, ডাকে দিতে ভুলিয়া যাই। কোন জায়গায় যাইবার কথা দিয়া যাইতে ভুলিয়া যাই। অনেক সময় একটী কথার পরিবর্ত্তে অন্য কথা ব্যবহার করিয়া বসি। সাধারণতঃ ঐরূপ ভুলমমূহ আকস্মিক বলিয়া চলিয়া যায়। একটী মহিলা বার্ণার্ড সএর লেখা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতে যাইয়া বলিলেন "I think very highly of all my writings." তিনি নিজে ছোট গল্প লিখিতেন। এখানে ভুলের অর্থ সকলেই উপলব্ধি করিবেন। Dr. Jonesএর এক বন্ধু মোটরে আস্তে আস্তে বেড়াইতেছিলেন, এমন সময় একটী লোক সাইকেলে রাস্তার ভুল দিক দিয়া অতি বেগে আসিয়া ধাক্কা লাগাইল, তাহার যান চুরমার হইয়া গেল। সারাইয়া লইয়া Jonsএর বন্ধুর নিকটে ৫০ ডলারের এক বিল পাঠাইল। বন্ধু দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় আদালতে নালিশ করিল। বন্ধুর সহিত দেখা হইতে Jones মামলার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বন্ধু বলিলেন "জজসাহেব অসাবধানতার সহিত সাইকেল চালাইবার জন্য কয়েদীকে তিরস্কার করিয়াছেন।" Jones বলিলেন, "কয়েদীকে? ফরিয়াদিকে বল!" বন্ধু বলিলেন "হ্যাঁ, কিন্তু উহার জেলে যাওয়াই উচিত ছিল।" এখানে ইচ্ছা কথার ভুলে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে। খামে ভুল ঠিকানা লেখা, জিনিষপত্র, যেমন ছাতা লাঠি ইত্যাদি এখানে ওখানে ফেলিয়া যাওয়া, প্রভৃতি যতই অকারণ ও অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হউক না কেন, সকল ভুলেরই কারণ আছে, অনুসন্ধান করিলে বাহির করা যায়। মোটামুটি বলিতে গেলে, যে সমস্ত অভিজ্ঞতার সহিত কোন ন কোনরূপ অপ্রীতিকর স্মৃতি জড়িত থাকে, তাহা সহজে পুনরায় মনে আসে না। অনেক সময়ে তাহার বিপরীতও হইতে পারে; যেমন কোন বন্ধু-গৃহে বই ফেলিয়া আসিবার কারণ সেই বন্ধুগৃহে পুনরায় যাইবার ইচ্ছা। সমস্ত ভুলই ঠিক এক নিয়মের মধ্যে ফেলা যায় না। প্রত্যেকটী ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিচার করিতে হইবে। মনসমীক্ষণ করিলে প্রতেকেটীর কারণ আবিষ্কার করিতে পারা যায়।

মনসমীক্ষণ সম্বন্ধে নানা দিক হইতে নানা রকমের প্রশ্ন উত্থাপিত হইলেও এবং সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে নানাবিধ মতদ্বৈধ থাকিলেও উহার উপকারিতা সম্বন্ধে মতভেদের আর কোনও কারণই নাই। দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক ঘটনা হইতে আরম্ভ করিয়া সুস্থ ও অসুস্থ লোকের মানসিক অবস্থার, সামাজিক, রীতিনীতির, পুরা কালের আচার ব্যবহারের, ধর্ম্ম-কর্ম্মের এমন একটী সুন্দর সহজ সঙ্গত ব্যাখ্যা মনসমীক্ষণ দেয় যে, তাহা অপূর্ব্ব আবার মানসিক রোগ সারাইবার, শিশুচরিত্র গঠন করিবার, সমাজের দোষগুণ ফুটাইয়া তুলিবার এরূপ মহামূল্য উপায় পূর্ব্বে আর দেখা যায় নাই। একটী কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করি। বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানক্ষেত্রে মনসমীক্ষণ সর্ব্বাপেক্ষা মহার্ঘ দান। ইহার প্রভাবে ভবিষ্যতে সমাজের সমস্ত কর্ম্মধারার যে আমূল পরিবর্ত্তন হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। যিনি এই অমূল্য দান করিয়াছেন আমরা সম্প্রতি তাঁহার সপ্ততিতম জন্মমহোৎসব করিয়াছি। আশা করি তিনি এখনও বহু বৎসর জীবিত থাকিয়া মনে বিজ্ঞানশাস্ত্রের এবং তাহার ভিতর দিয়া অন্য সমস্ত শাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধন করিতে থাকিবেন।

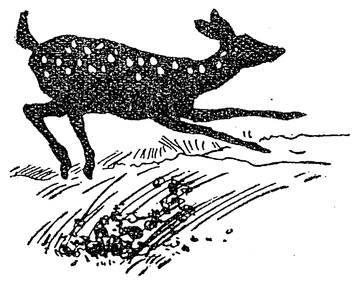

অস্তাচল

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় কাব্যবিনোদ বি-এ

(২৩)

পরদিন সকালে অনি চাকরদিগকে দিয়া সমস্ত ঘর-বাহির পরিষ্কার করাইল। লাইব্রেরীর বিশৃঙ্খল বইগুলি, স্তূপীকৃত সাময়িকপত্র সকল ও অন্যান্য আস্‌বাবপত্রের অবস্থা দেখিয়া তাহার কান্না পাইয়াছিল। এই কয় মাসের মধ্যে মেজরের যত চিঠি-পত্র আসিয়াছে, তাহার অধিকাংশই তদবস্থায় টেবিলের উপর পড়িয়া আছে; মেজর সেগুলিকে খুলিয়া পড়িবার অবসর পর্য্যন্ত পান নাই। অনি বাছিয়া বাছিয়া অল্পকখানি পত্র খুলিয়া ফেলিল; বিশেষ করিয়া রেজিষ্টার্ড পত্রগুলি। মহাজন ননীলাল মল্লিক, প্রাপ্য টাকার দলিল কিম্বা হাণ্ডনোট লিখিয়া দিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছেন, অথচ মেজর সে পত্রগুলি যে অবস্থায় আসিয়াছিল, ঠিক সেই অবস্থাতেই ফেলিয়া রাখিয়াছেন। এটর্ণির সেই সমস্ত চিঠি একত্র করিয়া অনি ভগ্‌লুকে দিয়া মেজরের নিকট পাঠাইয়া দিল। এখানে আসা অবধি সে মেজরের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সংস্কারে এতো গভীর ভাবে মনঃসংযোগ করিয়াছিল যে, তখনো পর্য্যন্ত মেজরের সহিত তাহার কোনো কথাবার্ত্তা বলিবার সুযোগ হয় নাই। কিম্বা অনি হয়তো ইচ্ছা করিয়াই তাহা এড়াইয়া চলিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। মেজরও পূর্ব্বের ন্যায় কোনো সময়ের জন্যই অনির সম্মুখীন হন্ নাই। অনির সুনিপুণ হস্ত-স্পর্শে অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই বিশৃঙ্খল গৃহের শ্রী ফিরিয়া আসিল। মেজরের মদ্যপানের সাজ-সরঞ্জামগুলিকে অনি স্বহস্তে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙিয়া ফেলিল। খোয়ারা ও বাবুর্চ্চি কেহই তাহার কার্য্যে বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না।

বিকালে গাজুর নিকট হইতে অনি টাকাকড়ির সমস্ত হিসাব বুঝিয়া লইল। লেখা-পড়া না জানার অছিলায় সকল বিষয়ের সঠিক হিসাব ও কৈফিয়ৎ না দিতে পারিলেও, বর্ত্তমান খরচের ভিতরের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে অনির কিছুমাত্র বাকী রহিল না। মাসের চার দিন না যাইতেই বেতনের টাকা প্রায় অর্দ্ধেক শেষ হইয়া গিয়াছে! গাজুর নিকট হইতে চাবি চাহিয়া লইয়া অনি টাকাকড়ি সমস্তই মেজরের দেরাজের মধ্যে রাখিয়া তালা বন্ধ করিয়া দিল; ও খরচ সম্বন্ধে গাজুকে বার বার সাবধান করিয়া বলিয়া দিল—যেন সে প্রয়োজন মত পয়সা সাহেবের নিকট চাহিয়া লয়।

* * *

অনির অনুরোধ মত, সন্ধ্যার কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বেই নিরঞ্জনবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সহসা জীবনের এত বড় একটা কর্ম্মক্ষেত্রে নিরঞ্জন-দাকে পাইয়া অনি যেন মনে মনে অনেকখানি সবল হইয়া উঠিয়াছিল। বিপর্য্যয়ের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া সে বহুদিন হইতেই এই নিরঞ্জনদার ন্যায় উদার ও সহৃদয় হিতৈষী বন্ধুকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল।

নিরঞ্জনবাবু আসিতেই, অনি তাঁহাকে দেখাইয়া গাজুকে পুনরায় বলিয়া দিল—"সপ্তাহে সপ্তাহে টাকাকড়ির সব হিসেব এই বাবুর কাছে দেবে; বুঝলে?" নিরঞ্জনবাবুর দিকে মুখ ফিরাইয়া অনি জিজ্ঞাসা করিল—"দাদা, আপনি এখন কিছুদিন আজম্‌গড়েই র'য়েছেন বোধ হয়?"

"হাঁ, অন্ততঃ এখানকার কাজ-কর্ম্ম যতদিন শেষ না হচ্ছে। য়ুনিভার্সিটিও এখন বন্ধ।"

* * *

নিরঞ্জন-দা'কে সঙ্গে লইয়া অনি বাগানের মধ্যে গিয়া বসিল। জীবনের অনেক স্মৃতি ও অনেক কথা তাহার বুকের তলায় জমা হইয়া উঠিয়াছিল। নিরঞ্জন-দা তাহাদিগকে কাশীতে রাখিয়া যাইবার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, অনি সংক্ষেপে সমস্তই বলিয়া চলিল। মায়ের মৃত্যু, দাদুর শেষ, মেজরের সাহায্য ও সহানুভূতি—কোনো কথাই অনি তাঁহাকে জানাইতে বাকী রাখিল না। কেবল মাত্র মেজরের সেই দুর্ব্বলতার কথা অনি প্রকাশ করিতে পারিল না; সে নারী, নিজের উপর দিয়াই যে বিপ্লব অত হীনভাবে ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিতে তাহার অন্তর লজ্জা ও ভয়ে শিহরিয়া উঠিতেছিল। নিজেকে সে অত ছোট করিয়া নিরঞ্জন-দার সম্মুখেও ধরিতে পারে না, পৃথিবীর কাহারো সম্মুখেই পারে না।

মেজরের বিষয়ে সকল কথা শুনিয়া নিরঞ্জনের হৃদয় তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিতেছিল। এত মহৎ, এত সহৃদয় ডাক্তার সাহেব! অথচ তিনি পুরা মাতাল! গত সন্ধ্যায় তাহাদের সহিত যে ব্যবহার তিনি করিয়াছেন, তাহাতে মনুষ্যত্বের গন্ধও পাওয়া যায় না। শেষের কথাগুলি ভাবিতে গিয়া যেন নিরঞ্জনের মনে কেমন একটা ধাঁধা লাগিতেছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তিনি কি আগেও মদ খেতেন অনু?"

"না; অন্ততঃ আমি যতদিন বেনারসে ছিলুম, ততদিন তাঁকে ও-রকম কোনো নেশাই ক'রতে দেখিনি। এক চুরুট-সিগারেট ছাড়া তিনি কোনো নেশারই বশীভূত ছিলেন না। আচ্ছা দাদা, অভাগীর বেটারা সন্দেশের বা কাপড়ের দোকান না ক'রে ম'রতে মদের দোকান করে কেন?"

"তুমি কি এখন বেনারস ছেড়ে চলে গেছ? সেই জন্যেই বোধ হয় তোমাদের সেই পুরোনো পল্লীর কেও তোমার খবর দিতে পার্‌লো না। কিন্তু বেনারস্ ছেড়ে গিয়ে তুমি আছ কোথায়? তোমাদের আর কোনো আত্মীয়স্বজন ছিলেন ব'লে তো আমার মনে হয় না। তোমার এক পিসিমা ছিলেন বটে শুনেছিলুম, কোল্‌কাতায়।"

"পিসিমা এখনো কো'লকাতাতেই আছেন; কিন্তু তাঁর ওখানে উঠিনি, যদিও গোড়ায় সে ইচ্ছা ছিল মানুষ যখন নিতান্ত বিপন্ন হ'য়ে পড়ে, তখন পিসিমা কেন কোনো সমৃদ্ধ আত্মীয়ই তাকে চিন্‌তে পারে না। জীবনের উপর দিয়ে যে ঝড়গুলো একে একে ব'য়ে গেছে, তাতে আত্মীয়স্বজন কারোই সাড়া পাই নি। একমাত্র বন্ধু বান্ধবেরাই সব করে'ছেন। দাদুও যে দিন আমায় একা ফেলে চলে গেলেন, সেদিন অত্যন্ত অসহায় হ'য়ে পড়েছিলুম। দাদু মেজরকে অনুরোধ ক'রেছিলেন, যতদিন আমি নিজেকে চালিয়ে নেবার মত কোনো একটা ব্যবস্থা ক'র্‌তে না পারি, ততদিন যেন তিনি দয়া ক'রে একটু আশ্রয় দেন্। দাদুর সে অনুরোধ তিনি যথাসাধ্য রক্ষা ক'রেছিলেন। তারপর এই বনবিহারী-দা আর মঞ্জিষ্ঠাদি, এঁরা যথেষ্ট ক'রেছেন। জীবনের সেই ভীষণ ঘূর্ণিতে পড়ে' যদি এঁদের মত উদার ও মহৎ বন্ধুর আশ্রয় না পেতুম্, তা'হলে অবস্থার শেষ পরিণতি যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াতো তা ভাব্‌তেও পারিনে। মঞ্জিষ্ঠা-দি আমার জন্যে যথেষ্ট ক'রেছেন; তাঁর সহানুভূতি পেয়েছিলুম ব'লেই আজ কোনো রকমে দাঁড়াতে পেরেছি। তিনিই শ্যামবাজারে তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়ীতে আমায় গৃহ-শিক্ষয়িত্রী ক'রে দিয়েছেন। ছোট্ট একটী মেয়েকে পড়াতে হয়। সুরথবাবু ও তাঁর স্ত্রী নীলিমাও লোক খুব ভালো—"

বলিতে বলিতেই হঠাৎ নিরঞ্জনের পানে চাহিয়া অনি দেখিল তিনি সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছেন; তাহার কথা একটীও তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে কি না সন্দেহ।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে দেখিয়া তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া উঠিয়া অনি বলিল—"চলুন দাদা, সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে; আট্‌টা দশ মিনিটে ট্রেন,—আজ রাত্রের ট্রেনেই ফির্‌তে হবে; বনবিহারী-দা'রও ছুটি নেই, আমারও থাক্‌বার উপায় নেই—কেন না—"

অনির কথা শেষ না হইতেই নিরঞ্জন পূর্ব্ববৎ অন্যমনস্ক ভাবে বলিয়া উঠিলেন—"তোমার মঞ্জিষ্ঠা দি কি করেন অনি?"

"দেশের কাজ"। অনি বুঝিল—নিরঞ্জন-দা তখনো কি যেন ভাবিতেছিলেন। সে তাঁহার গায়ে হাত দিয়া ঈষৎ নাড়া দিয়া ডাকিল "দাদা!—"

"হাঁ, চলো যাই" বলিয়াই নিরঞ্জন উঠিয়া পড়িলেন। অনি তাঁহার এই আকস্মিক অন্যমনস্কতার কোনো কারণই খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে নিরঞ্জন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি নীলিমার মেয়েকে পড়াও, না উর্ম্মিলার মেয়ে কণাকে—? নীলিমার তো কোনো—"

"আপনি কি তাঁদের চেনেন?" অনি একটু আশ্চর্য্য হইয়াই নিরঞ্জনের মুখপানে চাহিল। অন্ধকারে চোখ মুখের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে লক্ষ্য করিতে না পারিলেও, তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, নিরঞ্জন-দা তাঁহাদের কথাই ভাবিতেছিলেন।

* * * *

সেইদিন ৮—১০ মিঃ ট্রেনেই অনি ও বনবিহারী আজমগড় ছাড়িয়া চলিয়া গেল। আজমগড়ে আসিয়া অনি যে চব্বিশ ঘণ্টা ছিল, তাহার মধ্যে মেজরের সহিত কোনো সময়ের জন্যই তাহার কথাবার্ত্তা হইল না। মেজর ও অনি উভয়েই যেন ইচ্ছা করিয়া পরস্পরকে এড়াইয়া চলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল। বিদায়-বেলায় অনি একবার মেজরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল; তাহার মনটা হয়তো তখন অনেক কথা বলিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু অনি কোনো দিকে না চাহিয়া মেজরের পায়ে মাথা রাখিয়া একটী প্রণাম করিয়া কেবলমাত্র বলিল —"চল্‌লুম। চোরের ওপর রাগ ক'রে ভূঁয়ে ভাত খাবেন না!"

মেজরের মুখে সহসা কোনো উত্তর যোগাইল না। অনির পানে মুখ তুলিয়া চাহিতেও যেন তাঁহার মাথা লজ্জায় নোয়াইয়া পড়িতেছিল। অনিও কোনো উত্তরের আশা না করিয়াই তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

উদ্গত অশ্রুকে দমন করিবার জন্য মেজর ওষ্ঠ দংশন করিয়া মাটির পানে চাহিয়া রহিলেন।

* * * *

নিরঞ্জনবাবু অনি ও বনবিহারীর সঙ্গে ষ্টেশন্ পর্য্যন্ত আসিলেন। অনি অনেকবার লক্ষ্য করিল যে নিরঞ্জন-দা অনেকক্ষণ হইতে যেন কি একটা বলি'-বলি' করিয়াও বলিতে পারিতেছেন না। অনি গাড়ীতে উঠিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"দাদা, আপনি কি কিছু ব'ল্‌বেন?"

নিরঞ্জন একটু বিস্ময়ের সহিত অনির মুখপানে চাহিলেন। তাহার পর কি ভাবিয়া লইয়াই বলিলেন—"তুমি যে এতো শীগ্‌গির ফির্‌চো অনি? বেনারসে নেমে যাবে না?"

"না দাদা; সুরথবাবুরা কিছুদিনের জন্য বাইরে যাবার ঠিক্ ক'রেছেন, আমাকেও তাঁদের সঙ্গে যেতে হবে। বোধ হয় দুএক দিনের মধ্যেই আমরা পুরী যাবো।"

"তোমরা সকলেই যাবে?" এই "সকলেই" কথাটার উপর এমন একটা অস্বাভাবিক রকমের জোর পড়িল যে নিরঞ্জন-দা নিজেই তাহা লক্ষ্য করিয়া লজ্জিত হইয়া পড়িলেন; অথচ অনি ও বনবিহারীর তাহাতে মনে করিবার কিছুই ছিল না।

গাড়ী ছাড়িয়া দিতেই নিরঞ্জন অনি ও বনবিহারীর নিকট বিদায় লইয়া প্ল্যাটফর্‌মের উপর নামিয়া দাঁড়াইল। অনি, মেজরের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য তাঁহাকে বার বার বিশেষভাবে অনুরোধ করিল। তাহার অনুরোধের ভিতর দিয়া যেন আজ সমস্ত আন্তরিকতা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল; আজ আর তাহার বিন্দুমাত্র দ্বিধা ও সঙ্কোচ ছিল না।

(২৪)

অনির সেই নীরব শাসনকে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া মদ্যপান ত্যাগ করিলেও, পূর্ব্বের সেই অতিরিক্ত সুরাপানের ফলে কয়েক মাসের মধ্যেই মেজরের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে ভাঙিয়া পড়িল। কঠিন যকৃৎ-রোগাক্রান্ত হইয়া তিনি শয্যা গ্রহণ করিলেন।

অনির অনুরোধ রক্ষা ও নিজের কর্ত্তব্য-পরায়ণতা—উভয় দিক্ দিয়াই নিরঞ্জন যথাসাধ্য মেজরের তত্ত্বাবধান করিতে ত্রুটি করেন নাই। বিপন্নের সাহায্য ও রোগীর সেবায় তিনি চিরদিন মুক্তহস্ত ও দৃঢ় হইলেও, মেজরের অবস্থা যখন ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল, তখন যেন নিরঞ্জন-বাবু মনে মনে একটু দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। জীবনে রোগীর সেবা দ্বারা সাধারণ রোগ সম্বন্ধে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেও, এতাদৃশ ব্যাধি সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ কোনো ধারণা ছিল না। অনি ও বনবিহারীর পূর্ব্ব পরামর্শ মত, নিরঞ্জন সকল কথা বিস্তৃতভাবে জানাইয়া বনবিহারীকে আসিবার জন্য পত্র লিখিয়া দিলেন।

* * * * *

বনবিহারী আসিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহারো দুশ্চিন্তা বিশেষ কম হইল না। অতিরিক্ত সুরাপানের সাধারণ পরিণাম যাহা হইয়া থাকে, মেজরের অবস্থাও ঠিক্ তদ্রূপ দাঁড়াইয়াছে। বনবিহারী তাঁহার অবস্থাদি বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিলেন—মেজরের লিভার ও অন্ত্রের মধ্যে ক্ষত হইয়াছে। লিভার অ্যাব্‌সেসের দুরারোগ্যতা সম্বন্ধে তাঁহার কিছুই অবিদিত ছিল না।

সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া বনবিহারী নিরঞ্জনবাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন—চিকিৎসার জন্য মেজরকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়াই বিধেয়। যদি লিভারের উপর অস্ত্রোপচার করিতে হয়, তাহা হইলে কলিকাতা ভিন্ন অন্য কোথাও তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা বিশেষ নিরাপদ নহে। তবে সে বিষয়ে মেজরের অভিমত লওয়াও প্রয়োজন।

পরদিন সকালে বনবিহারী প্রকারান্তরে মেজরকে তাঁহার রোগের কথা জানাইয়া, চিকিৎসা বিষয়ে মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন; এবং এ অবস্থায় কলিকাতায় যাওয়াই যে প্রশস্ত সে কথা তিনি মেজরের নিকট প্রস্তাব করিলেন।

বনবিহারী না বলিলেও, মেজর তাঁহার রোগের বিষয় সম্পূর্ণই বুঝিয়াছিলেন। রোগ ও চিকিৎসাদি সম্বন্ধে তাঁহারও কিছু অবিদিত ছিল না। তথাপি, কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া মেজর বলিলেন—"এখন আর তা হয় না ক্যাপ্টেন্, তাতে টাকা-কড়ির দরকার; তার উপর পাওনাদার বহু টাকার দাবী দিয়ে নালিশ করে'ছে। ঐ দেখুন, টেবিলের উপর তার সমন পড়ে' আছে।"

টেবিলের উপর হইতে সমনখানি তুলিয়া লইয়া বনবিহারী দেখিলেন—এটর্ণি ননীলাল মল্লিক প্রায় বিশ হাজার টাকার দাবী দিয়া মেজরের নামে নালিশ করিয়াছেন। এই অল্পদিনের মধ্যেই এত টাকা ঋণ হইয়াছে দেখিয়া তিনি অবাক্ হইয়া গেলেন।

মেজরের কথার উত্তরে বনবিহারী বলিলেন—"তা হোক্। তাই বলে জীবনকে অবহেলা করা চলে কি? আর কেসের জন্যেও তো কোল্‌কাতায় যাওয়া দরকার। সম্প্রতি যেমন ক'রে হয় চল্‌বেই। টাকার সমস্যা নিয়ে ভাব্‌বার সময় এখন নয়; সে পরে দেখা যাবে। নিরঞ্জনবাবু আর আমি যা হোক্ ক'রে চালিয়ে নেব'খন।"

বনবিহারী ও নিরঞ্জন প্রায় জোর করিয়াই মেজরকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

* * * *

মেডিক্যাল কলেজের একটা কেবিন ভাড়া করিয়া নিরঞ্জন ও বনবিহারী মেজরের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইয়া চলিয়াছে দেখিয়া ডাক্তারেরা সকলেই বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অথচ মেজর নিজের রোগ সম্বন্ধে এতো উদাসীন হইয়া গিয়াছিলেন যে, নিজের যন্ত্রণা ও কষ্টভোগ বিষয়েও তাঁহার কোনো অনুভূতি ছিল বলিয়া মনে হইতেছিল না। নিরঞ্জন ও বনবিহারী অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁহার সেবা যত্ন করিতেছিলেন। কিন্তু মেজরকে দেখিয়া মনে হইতেছিল—যেন তিনি জানিয়া-শুনিয়াই মৃত্যুকে অত ধীর ও অচঞ্চলভাবে বরণ করিয়া লইতেছিলেন।

মেজরের অসুস্থতার কথা অনিকে জানাইবার জন্য সেদিন বনবিহারী তাহার সন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু অনি তখনো কলিকাতায় ফিরিয়া আসে নাই। মেজরের এত বড় অসুখের কথা অনিকে না জানাইয়া বনবিহারী কোনরূপেই সোয়াস্তি পাইতেছিলেন না। তিনি অনিদের পুরীর ঠিকানা সংগ্রহ করিবার জন্যও চেষ্টা করিলেন। কিন্তু দারোয়ান কোনো খবরই দিতে পারিল না; উপরন্তু তাঁহারা পুরীতেই আছেন, না সেখান হইতে অন্য কোথাও গিয়াছেন, দারোয়ান সে সংবাদটুকু পর্য্যন্ত রাখে না।

উকিল নিযুক্ত করিয়া বনবিহারী মেজরের কেসের তদন্তও করিতেছিলেন; কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হইল না। এটর্ণি ননীলাল মেজরের উপর ডিক্রির পরোয়ানা জারি করিলেন। ননীলাল মেজরের পিতার আমলের এটর্ণি ছিলেন। তাঁহাদের পৈতৃক সম্পত্তির অনেক কাগজপত্রই তাঁহার নিকট ছিল। এটর্ণি সেই সকল সম্পত্তিও অ্যাটাচ্ করিয়া নোটিশ জারি করিলেন। মেজর পরোয়ানাগুলি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিলেন মাত্র, ভাল-মন্দ কিছুই বলিলেন না। তিনি পূর্ব্ব হইতে

জানিতেন যে, এটর্ণির বরাবরই লোভ ছিল ঐ সকল সম্পত্তির উপর।

মোকদ্দমার রায় বাহির হইবার কয়েকদিন পরেই সংবাদপত্রে বাহির হইল যে '৬৯৪৭ নং কেসের ডিক্রি সম্প্রতি মুল্‌তবী রাখা হইল' এই মর্ম্মে জজসাহেব এক আদেশ জারি করিয়াছেন। তৃতীয় পক্ষ উক্ত আবদ্ধ-সম্পত্তির এক্সিকিউটাররূপে আপত্তি পেষ করিয়াছে। 'স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র রায় চৌধুরীর সম্পত্তি তাঁহার পুত্রের ঋণের জন্য আবদ্ধ করা যাইতে পারে না। স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র দান-পত্র দ্বারা তাঁহার যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি পুত্রবধূর নামে লিখিয়া দিয়াছেন।'

মেজরের কর্ণে এ সংবাদও পৌঁছিল; কিন্তু মেজর কোনো কথাই বলিলেন না। উকিলের পরামর্শ মত কিস্তিবন্দির জন্য দরখাস্ত দিবার বিষয়ে বনবিহারী মেজরের মত জিজ্ঞাসা করিলেন; তিনি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া পূর্ব্ববৎ নির্ব্বিকার ভাবেই উত্তর করিলেন—"যেখানে শেষের ওয়ারেণ্টই জারি হ'য়ে গেছে, ক্যাপ্টেন্, সেখানে আর ও-সব ছোটখাটো ওয়ারেণ্ট নিয়ে মাথা না ঘামানোই ভাল।"

মেজরের কথায় বনবিহারীর মনটা যেন বারেকের জন্য দুলিয়া উঠিল।

কয়েকদিন পরে চিকিৎসকগণ এক্স-রে ফটো লইয়া স্থির করিলেন—অস্ত্রোপচার করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। নিরঞ্জন ও বনবিহারী উভয়েরই বুকের ভিতরটা যেন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল।

সম্পত্তি আবদ্ধ করিয়া লইবার চেষ্টা বিফল হওয়ায় এটর্ণি ননীলাল মল্লিক বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ধারণা হইল,—ডাক্তার বোধ হয় জানিয়া শুনিয়াই তাঁহাকে ফাঁকি দিবার উদ্দেশ্যে এরূপ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ছাড়িবার পাত্র নহেন।

এটর্ণি আইনের সাহায্যে মেজরের উপর ডিষ্ট্রেস্ ওয়ারেণ্ট (Distress Warrant) বাহির করিয়া সেই দিনই তাহা জারি করিলেন! ওয়ারেণ্ট দেখিয়া মেজর একবার একটু ক্ষীণ হাসিলেন মাত্র। কিন্তু তাহা এত দিকে ও নিষ্প্রভ যে দেখিলে ভয় হয়।

বনবিহারী কয়েকদিন হইতে লক্ষ্য করিতেছিলেন যে মেজর যেন কি একটা কথা বলি বলি করিয়াও বলিতে পারিতেছেন না। মেজরের সঙ্কোচটুকু লক্ষ্য করিয়াই বনবিহারী নিজে হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মেজর, আপনি কি কিছু ব'ল্‌তে চান্? বন্ধুর কাছে সঙ্কোচ ক'র্‌বার—"

বনবিহারীর কথা শেষ না হইতেই মেজর বলিলেন—"জানি, বন্ধু, তোমায় জানি। এই বিপন্ন অবস্থার বন্ধু তুমি; তোমার কাছে আজ আর আমার কোনো সঙ্কোচই নেই—এই জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে।" বনবিহারীর প্রতি তাঁহার সমস্ত হৃদয় যেন শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। মেজর প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

বনবিহারী বাধা দিয়া বলিলেন—"ও কথা বল্‌বেন না মেজর! আপনি নিশ্চয়ই সেরে উঠ্‌বেন। অনিকে একবার সংবাদ দিতে পার্‌লে ভাল হো'ত।"

"আমিও ঐ কথাটাই ব'লতে চাচ্ছিলুম ক্যাপ্টেন! জীবনটার আগাগোড়াই ভুলের বোঝায় ভারি হ'য়ে গেছে। এখনো যদি কিছু কমাতে পারি। সারবার আশা আর নেই; সে ইচ্ছেও নেই।" মেজর আবার একটু হাসিয়া বনবিহারীর মুখপানে চাহিলেন।

মেজরের কথাবার্ত্তা ও ভাব লক্ষ্য করিয়া বনবিহারীর মনটা যেন আরো দমিয়া গেল। রোগী যদি স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইতে চাহে, তাহা হইলে চিকিৎসকের সাধ্য কি, সে তাহাকে ফিরাইতে পারে! মেজর যেন মৃত্যুর জন্যই প্রস্তুত হইয়া আছেন। জীবনের প্রতি তাঁহার সমস্ত আকর্ষণই শিথিল হইয়া গিয়াছে।

বনবিহারীর হাতখানিকে চাপিয়া ধরিয়া মেজর পুনরায় ব্যথিত স্বরে বলিলেন—"বন্ধু, হতাশ হ'চ্ছ? কিন্তু উপায় নেই। তোমার আর নিরঞ্জন বাবুর ঋণ কখনই শোধ ক'র্‌তে পার্‌বো না।——অনির সঙ্গে একবার দেখা হ'লে কতকটা হাল্‌কা হ'তে পার্‌তুম্। তার কাছে……"

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাসে মেজরের রোগশীর্ণ বুকখানা কাঁপিয়া উঠিল।

(২৫)

কণাকে বুকে করিয়া অনির দিনগুলি বেশ আনন্দেই কাটিয়া যাইতেছিল। নিরঞ্জনদা ও বনবিহারীদা'র হাতে

মেজরের ভার দিয়া অনি যেন অনেকখানি নিশ্চিন্ত হইয়া পুরী আসিয়াছিল। দেব-দর্শন ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া অনি যেন আবার ক্রমে ক্রমে তাহার অন্তরের সেই সজীব প্রফুল্লতা ফিরিয়া পাইতেছিল। তাহার অন্তরের সমস্ত শূন্যতাকে আরো পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল সেই বিশাল সমুদ্র—চিন্তার মত উত্তাল, আশার মত স্নিগ্ধ ও সজীব, জীবনের মত রহস্যময়।

অনি অধিকাংশ সময়ই কণাকে লইয়া সমুদ্রের ধারে ধারে ঘুরিয়া বেড়াইত। সমুদ্র যেন তাহার অন্তরের এতকালের নিদ্রিত আনন্দকে মাতাল করিয়া তুলিয়াছিল। কখনো বালুবেলায় বসিয়া অনি আপন মনে সেই সীমাহীন নীলাম্বুর ভাববৈচিত্র্য দেখিয়া, তাহার সহিত নিজের জীবনকে মিলাইয়া লইত। সেই বিরাট অভিধানের পরতে পরতে জীবনের অর্থ খুঁজিয়া যেন অনি অনেকদিন পরে আপনার মধ্যে আপনাকে দেখিতে পাইয়াছিল। দূরে—বহুদূরে—যতদূর দৃষ্টি যায়, সব যেন মৌন ও গম্ভীর, নির্ব্বিকার ও অচঞ্চল। শুধু বেলাভূমির কূলে কূলে যে বিপর্য্যয়ের ঢেউগুলি উত্তাল হইয়া ছুটিয়া আসিতেছে, ঐ ধ্যানমগ্ন ঋষির সঙ্গে যেন তাহার কোনো যোগসূত্রই নাই। অথচ সেই ভীষণ বিপর্য্যয় যেন জগতের সব বিপর্য্যয়কেই তুচ্ছ করিয়া, ব্যঙ্গভরে শিশুর মত হাসিয়া লুটোপুটি খাইতেছে—ঠিক্ মানুষের হাতের কাছে।

এই কয়েক মাস পুরীতে থাকিয়া অল্পবিস্তর সকলেরই স্বাস্থ্যোন্নতি হইয়াছে দেখিয়া, সুরথবাবু এখনকার মত পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া যাওয়াই স্থির করিলেন। বিশেষতঃ লাইব্রেরীর বিরহ তাঁহাকে যেন আরও হাতছানি দিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার উপর কয়েকদিন পরেই কণার জন্মতিথি! মাঘের ছাব্বিশে, আর সাতটি দিন মাত্র বাকী।

* * * *

আজ তিন দিন হইল সুরথবাবুরা কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। পথে ভুবনেশ্বরে নামিয়া আসায় আরো দুইদিন দেরী হইয়া গিয়াছে। অনি ও নীলিমা কণার জন্মতিথির আয়োজন করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে; আজ কণার জন্মদিন।

অনির মনটা আজ থাকিয়া থাকিয়া ঊর্ম্মিলার জন্য কাঁদিয়া উঠিতেছিল। হায় অভাগি! আজ তোর কণার জন্মদিন। কিন্তু দুঃখের মধ্যেও অনি একটু শান্তি পাইতেছিল—শুধু এই কথা ভাবিয়া যে, সে কণার মায়ের আসনখানিতে নিজের বুভুক্ষু হৃদয়কে বসাইবার সৌভাগ্য পাইয়াছে।

আপনার হাতে কণাকে সাজাইয়া দিয়া, অনি ঠিক্ জন্মক্ষণটীতে তাহাকে পাঠাইল—মামাবাবুকে প্রণাম করিবার জন্য। কণাকে পাঠাইয়া অনি নিজেও জোড়হাতে ভগবানের চরণে প্রণাম করিয়া মনে মনে বলিল—"ঠাকুর! কণির জীবনকে সার্থক ক'রে তোল নারায়ণ!"

কণা নাচিতে নাচিতে লাইব্রেরী-ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—"মা-মণি, মামাবাবু কি দিয়েচেন, ছাখো।" সুরথবাবুর নিকট হইতে একখানি ছবির বই পাইয়া তাহার কচি বুকখানি আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছিল।

অনি চাহিয়া দেখিল—মরোক্কো চামড়ায় বাঁধানো একখানা সুন্দর ফটো এ্যালবাম্ সুরথবাবু আজ কণাকে উপহার দিয়াছেন। কণাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া অনি এ্যাল্‌বাম্‌খানি দেখিতে লাগিল। কণার আনন্দধ্বনি শুনিয়া নীলিমাও তখন তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

এ্যাল্‌বামের প্রথম পাতাটি উল্টাইতেই সহসা একটি দম্পতির ফটোগ্রাফ্ দেখিয়া অনি যেন চম্‌কিয়া উঠিল। "এ কি!"

নীলিমা ছবিখানির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল—"ঊর্ম্মিলা, আর কণার বাবা।"

কণার বাবা! এ যে মেজর! মেজর ঊর্ম্মিলার স্বামী! —অনির সর্ব্বাঙ্গ যেন থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল, তাহার মুখ দিয়া আর কোনো কথা বাহির হইল না। দুই হাত দিয়া অনি কণাকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিল—অতি নিবিড় ভাবে। তাহার চোখ হইতে বড় বড় জলের ফোঁটাগুলি গড়াইয়া পড়িতে লাগিল কণার মাথার উপর, উচ্ছ্বসিত স্নেহের মন্দাকিনীর মত।

মেজরের উপর অনির সব অভিমান ও সব অশ্রদ্ধা যেন সেই অশ্রুজলে ধৌত হইয়া গেল। অনি আজ আর মেজরকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা না করিয়া পারিল না। মেজর কণার পিতা। আর কণা! কণা অনির মরুজীবনের

ছায়াবীথি, শূন্য প্রাণের একমাত্র অবলম্বন—তাহারই বুকজোড়া স্নেহের পুতুলি।

ঝি আসিয়া সংবাদ দিল, যে, বাহিরে একজন ভদ্রলোক গুরু-মার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তাড়াতাড়ি নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া অনি কণাকে সঙ্গে করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

আজ হঠাৎ বনবিহারীদাকে দেখিয়া অনির মনটা আনন্দে ভরিয়া উঠিল; কণার জন্মদিনে বনবিহারীদাকে সে অতিথি রূপে পাইয়াছে।—তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া অনি হাসিয়া বলিল—"দাদা, আজ আমার খুব সৌভাগ্য যে আপনাকে বিনা-নেমন্তন্নেই পেয়েছি। আজ কণার জন্মদিন। এই দেখুন, কেমন কোল-ভরা ফুট্‌ফুটে মেয়ের মা হ'য়েছি।"

বনবিহারীর কাছে এ সংবাদ খুব আনন্দের হইলেও তাহা জ্ঞাপন করিবার মত মনের অবস্থা তখন তাঁহার ছিল না। তিনি নিতান্ত বিমর্ষ ভাবেই বলিলেন—"কিন্তু, আমার তো থাক্‌বার সময় নেই বোন্। মেজরের খুব অসুখ; তাই তোমাকে একবার সংবাদ দিতে এসেছি; তাঁরও খুব ইচ্ছা। এ যাত্রা বোধ হয় আর—" বনবিহারীর মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইতেছিল না।

নিমেষে অনির সমস্ত আনন্দকে ঢাকিয়া একটা বেদনা ও আতঙ্কের কালো মেঘ তাহার হৃদয়কে কাঁপাইয়া তুলিল। অনি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তিনি কোথায় আছেন, দাদা?"

"এইখানেই, মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতালে। তুমি একবার গেলে ভাল হ'ত।"

"একটু অপেক্ষা করুন, আমি নিশ্চয়ই যাবো দাদা, আপনার সঙ্গেই যাবো।" বলিয়াই অনি তাড়াতাড়ি উপরে চলিয়া গেল।

বনবিহারীদার অনুরোধ ও নিজের একান্ত ইচ্ছায়, অনি, তখনই নীলিমাকে জানাইয়া, কণাকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। মেজরকে দেখিবার জন্য তাহার প্রাণ তখন ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে।

কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে, মহিলা-নিবাসের সম্মুখে গাড়ী দাঁড় করাইয়া, অনি মঞ্জিষ্ঠার নিকট একখানি পত্র লিখিয়া, দারওয়ানের হাতে দিয়া, তাহাকে তখনি খাদি-প্রতিষ্ঠানে মঞ্জিষ্ঠার নিকট তাহা পৌঁছাইয়া দিবার জন্য বলিয়া দিল। মেজরের অসুস্থতার কথা লিখিয়া মঞ্জিষ্ঠাকে তখনি উল্লিখিত ঠিকানায় যাইবার জন্য অনি বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া লিখিল। কণাকে সঙ্গে করিয়া সেও যে কণার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিয়াছে, সে কথাও অনি মঞ্জিষ্ঠাকে জানাইতে ভুলিল না।

* * * *

কেবিনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, অনি যখন দেখিল—মেজর রোগশীর্ণ হইয়া প্রায় শয্যার সহিত বিলীন হইয়া পড়িয়া আছেন, এমন কি সজীব কি না তাহাও সহজে বুঝিয়া উঠা যায় না, তাহার ব্যথিত হৃদয় যেন হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সেই মেজর! তাহার সেই পরম হিতৈষী বন্ধু, যাঁহার জীবনে একদিন সমৃদ্ধি আপন গৌরবে বহিয়া চলিয়াছিল, আজ মৃত্যুশয্যায়, সরকারী চিকিৎসালয়ে আত্মীয়-স্বজনহীন পথিকের মত আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন।

অনিকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, মেজর একবার চোখ তুলিয়া অনির মুখপানে চাহিলেন। সে দৃষ্টি বড় করুণ। অনিকে বসিতে বলিয়া মেজর শীর্ণ হাত দুখানি তুলিয়া নমস্কার করিলেন।

অনি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল—"ও কি! আমার সঙ্গে আবার ফর্‌ম্যালিটি কেন মেজর?"

মেজর অনির মুখপানে আর একবার চাহিয়া লইয়া বলিলেন—"জীবনে অনেক ভুল ক'রেছি অনি; এতোদিন যা বুঝতে পারিনি, আজ তা' চোখের সাম্‌নে সব স্পষ্ট হ'য়েই ফুটে উঠেছে। সে সবের ভার আর সহ্য ক'র্‌তে পারছি না, তাই আজ জীবনের এই অস্তাচলে দাঁড়িয়ে তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি, শুধু ক্ষমা চেয়ে নিজেকে একটু হাল্‌কা ক'র্‌বো বলে। আমায় ক্ষমা কোরো—"

মেজরের কথা শেষ না হইতেই অনি তাড়াতাড়ি নমস্কার করিয়া বলিল—"ছিঃ, ও-কথা মনেও আন্‌বেন না। বহুদিন পূর্ব্বেই ভগবানের কাছে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করেছি—তিনি যেন আপনাকে ক্ষমা করেন। আপনি সেরে উঠুন্; জীবনে যে ভুল ক'রেছেন, না-ক'রেছেন তা শোধ্‌রাবার সময় অনেক আছে।"

"সেরে আর উঠ্‌বো না অনি! পাপের ভারে যে

জীবন ডুবে গেছে, তার আর উঠ্‌বার আশা কোনো কালেই নেই।” মেজরের কণ্ঠস্বর একটু কাঁপিয়া উঠিল।

অনি প্রসঙ্গটাকে চাপা দিবার জন্য কণাকে কোলের উপর উঠাইয়া লইয়া, মেজরের পানে চাহিয়া বলিল—“মেজর! একে চিন্‌তে পারেন? এই আধফোটা ছোট্ট গোলাপটিকে?”

মেজর যথাসাধ্য নিজের দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ করিয়া কণার মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিলেন। বেশ স্থিরভাবে কি একটু ভাবিয়া লইয়াই বলিলেন—“নাঃ, চিন্‌তে তো পার্‌লুম্ না অনি!”

কথাটা বলিবার ভঙ্গী ও উদাস ভাবটুকু লক্ষ্য করিয়া, অনি বুঝিল—তিনি যেন অন্যমনস্কভাবে তখনো স্মৃতির পাতা উল্টাইয়া উল্টাইয়া দেখিতেছিলেন।

অনিরও মনের মধ্যে একটু ইতস্ততঃ ভাব আসিয়া পড়িল; কিন্তু পরক্ষণে সেটুকু কাটাইয়া লইয়াই, অনি কণার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিল—“চিন্‌তে পার্‌লেন না মেজর? কণা, উর্ম্মিলার স্মৃতিচিহ্ন!”

মেজর যেন সহসা চম্‌কাইয়া উঠিলেন; উর্ম্মিলার স্মৃতিচিহ্ন! মেজরের অজ্ঞাতসারেই তাঁহার শীর্ণ বাহু দুইটি কণার দিকে প্রসারিত হইয়া আসিল। কিন্তু পরক্ষণেই তাহা শয্যার উপর এলাইয়া পড়িল। মেজর যেন ইচ্ছা করিয়াই সেই প্রসারিত বাহুকে গুটাইয়া লইলেন। তাঁহার চোখ দুইটি তখন জলে ছাপাইয়া উঠিতেছিল।

নিজেকে একটু সংযত করিয়া লইয়া মেজর অত্যন্ত উদাসভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—“কোন্ উর্ম্মিলা?”

“সুরথ বাবুর ভগিনী উর্ম্মিলা; আপনার—”

আবেগভরে মেজর বলিয়া উঠিলেন—“উঃ, উর্ম্মিলা! উর্ম্মিলার জন্যেই জীবনটা আজ কোথায় নেমে প’ড়েছে! ঐ উর্ম্মিলাকে ঘিরে একদিন বেঁচে থা’ক্‌তে চেয়েছিলুম্। উর্ম্মিলার জন্যে জীবনে কী না ক’রেছি! দস্যুর মত, একটা কচি ফুলকে আপনার হাতে ছিঁড়ে আগুনে পুড়িয়ে ছাই ক’রে দিয়েছি! বড় হ’য়ে, উর্ম্মিলাকে পাবার যোগ্য হ’য়ে ফির্‌বো বলে’ জীবনকে তুচ্ছ ক’রে মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। বাপ্‌ ঠাকুর্দ্দার কুলগৌরবকে পায়ে দ’লে, যুদ্ধে গিয়ে একটা ব্যভিচারী পশুর মত জীবন কাটিয়েছি। উঃ, অন্নপূর্ণা! পরলোকে গিয়েও তুমি হয়তো আমায় ক্ষমা ক’র্‌তে পার্‌বে না। আর উর্ম্মিলা! জীবনের সব কিছু নিয়েও, তোমার তৃপ্তি হো’ল না! বিশ্বাসের মূল যে অতো আলগা হ’য়ে পড়্‌বে তা স্বপ্নে ভাবি নি।” মেজরের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছিল।

মেজরের কথার সবটুকু উপলব্ধি করিতে না পারিলেও অনির বুকখানা যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

মেজরের কথা শেষ না হইতেই মঞ্জিষ্ঠা ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, মেজর ও অনি কেহই তাহা লক্ষ্য করে নাই। মেজরের শেষের কথাগুলি যেন মঞ্জিষ্ঠার প্রাণে গিয়া শেলের মত বিঁধিল। নিজেকে সংযত করিতে না পারিয়া সে উষ্ণস্বরে বলিয়া উঠিল—“দাদা, জীবনের খেয়া-ঘাটে দাঁড়িয়েও নিজের সেই সঙ্কীর্ণতাকে ভুল্‌তে পার নি। উর্ম্মিলার মত সাধ্বীর পবিত্র জীবনে ঐ ঘৃণিত কালি মাখিয়েছিলে বলে’ই বোধ হয় আজ এই পরিণামে এসে দাঁড়িয়েছো। উর্ম্মিলা সাধ্বী ছিল; সে সাধ্বীর মতই মৃত্যুকে আলিঙ্গন ক’রে বেঁচেছে। প্রোফেশর চৌধুরীর নাম শুনে যে হীন ধারণা বুকে পুষে রেখেছিলে, সেই নিরঞ্জন চৌধুরী যে কত বড় তা’ না দেখ্‌লে, কল্পনা ক’র্‌বার ক্ষমতাও তোমার নেই—।”

অনি অবাক্ হইয়া মঞ্জিষ্ঠার পানে চাহিয়া ছিল। মঞ্জিষ্ঠাকে এত উগ্র অবস্থায় সে কখনো দেখে নাই। আজকার সব কিছুই যেন অনির কাছে একটা হেঁয়ালির মত বোধ হইতেছিল।

মেজর মঞ্জিষ্ঠার মুখ পানে চাহিয়া আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন—“মঞ্জু, আজ আমার ঠিক্ এই তিরস্কারের দরকার ছিল মঞ্জু! নিজের ভুল অনেক সময় মনের কাছে ধরা দিয়েছে, কিন্তু ঠিক্ এমনি ক’রে মুখের উপর কেউ কোনোদিন বল্‌তে পারে নি ব’লেই, পথ খুঁজে পাই নি। আবার বল্ দিদি, যে, উর্ম্মিলা সাধ্বী ছিল। আমিও আজ সর্ব্বান্তঃকরণে বল্‌ছি, উর্ম্মিলা সতী। শু... নিজের ভুলেই জীবনে এ বিপ্লব ঘটিয়ে তুলেছি, তা... শাস্তিও আজ মর্ম্মে মর্ম্মে পাচ্ছি! নইলে, একদিকে ... তাঁর শেষ সমন জারি ক’রেছেন, আর একদিকে মা... বডি ওয়ারেণ্ট জারি ক’র্‌বে কেন? এই আমার উপর... শাস্তি। অস্তাচলের অবসান-প্রায় আলোক-রেখাটুকুতে আজ প্রায়শ্চিত্ত হোম জ্বলে’ উঠেছে। এই দ্যাখ্—”

বলিয়াই মেজর বালিশের নীচে হইতে ওয়ারেণ্টখানি বাহির করিয়া দিলেন।

পরোয়ানার লেখা কয়টির উপর নজর পড়িতেই অনির পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল সে যেন ভুল দেখিতেছে। নিজের জাগ্রত বাস্তব অস্তিত্বের উপর অনির সন্দেহ হইল। সে যেন কোনমতেই নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। সজোরে চক্ষু দুইটিকে মার্জ্জনা করিয়া অনি মঞ্জিষ্ঠার হাত হইতে ওয়ারেণ্টখানি লইয়া প্রত্যেকটি অক্ষর মিলাইয়া পড়িয়া দেখিল। একি! এ যে সত্যই লেখা রহিয়াছে—

শ্রীযুত অরুণময় রায় চৌধুরী
পিতা স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র রায় চৌধুরী
সাকিম—তোড়ণগ্রাম জেলা—বর্দ্ধমান

অনির সর্ব্বশরীর থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তাহার মনে হইতেছিল—সে বুঝি পড়িয়া যাইতেছে। পৃথিবীর সব কিছুই যেন একটা ভুমিকম্পের দোলায় উল্টাইয়া পড়িতেছে। দুই হাতে খাটের মেহেরাপিটাকে চাপিয়া ধরিয়া, নিজেকে সংযত করিয়া লইবার জন্য, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, অনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল।

মেজর ও মঞ্জিষ্ঠা—উভয়েই বিহ্বল হইয়া অনির এই আকস্মিক অবস্থান্তরের পানে চাহিয়া রহিলেন। কেহই কিছু ভাবিয়া উঠিতে পারিলেন না।

মঞ্জিষ্ঠা তাড়াতাড়ি অনিকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—“অনি, কি হো’ল তোর?”

অশ্রুজড়িত কণ্ঠে অনি আর্ত্তের মত বলিয়া উঠিল—“ওগো দিদি, মিছে আর এ ওয়ারেণ্ট কেন? তিনি যে বহুদিন আগেই সকল ওয়ারেণ্টের বাইরে চলে’ গেছেন।”

“বালাই, ও কথা বল্‌ছিস্ কেন অনি? এ ওয়ারেণ্ট যে দাদার।”

মঞ্জিষ্ঠার কোলের মধ্যে মুখ লুকাইয়া, অনি পাগলের মত আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—“ওগো না—না; এ যে আমার স্বামীর নামের পরোয়ানা। ঐ যে শ্বশুরের নাম লেখা রয়েছে,—সেই তোড়ণগাঁ—” অনির মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। তাহার ভিতরটা যেন অচেতন হইয়া আসিতেছিল।

মেজর এতক্ষণ সংজ্ঞাশূন্যের মত অনির পানে চাহিয়া ছিলেন; সহসা আবেগভরে উঠিয়া বসিয়া তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন—“অনি, অনি, তুমিই অন্নপূর্ণা?” বনবিহারী তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া মেজরকে ধরিয়া ফেলিলেন।

অনি জোরে মঞ্জিষ্ঠাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—“অ্যাঁ! তবে ব্রাউন সাহেব বাবার কাছে যে তার ক’রেছিলেন যে ‘এ-এম্ রায় চৌধুরী’ যুদ্ধে মারা গেছেন’; সে কি মিথ্যে?” বুকজোড়া কান্নায় অনি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল।

বনবিহারী ও মঞ্জিষ্ঠা অবাক্ হইয়া শুনিতেছিল। সবই যেন একটা তন্দ্রা-বিজড়িত স্বপ্নের মত মনে হইতেছিল, কেহই কিছু উপলব্ধি করিতে পারিল না।

মেজর হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন—“ব্রাউন! ৫৯নং রেজিমেণ্টে আমাদেরই ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন ছিল। যে মারা গেছ্‌লো সে—আনন্দ মোহন—সিলেটের। অনি—অনি, আগে বলনি কেন যে তুমিই অন্নপূর্ণা?”

“দেবতা, সে কথা তো কখনো জিজ্ঞাসা করো নি।”

“একদিন অনুতপ্ত বুক নিয়ে অনেক খুঁজেছিলুম অনু, কোথাও সন্ধান পাইনি, শেষে তোমার পিসিমার কাছে খবর পেয়েছিলুম—তোমরা কেও বেঁচে নেই। অনু—অনু—বড় দেরীতে এসেছ। জীবনের অস্তাচলে—।” মেজর উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া বনবিহারী আবার ধরিয়া ফেলিলেন। অত্যন্ত উত্তেজনায় মেজরের উর্দ্ধশ্বাস হইতে লাগিল।

—“এ অভাগীর জীবনটা যে আগাগোড়াই অস্তাচল প্রভু!...” অনির মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না।

মঞ্জিষ্ঠা চাহিয়া দেখিল অনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছে। তাড়াতাড়ি নার্সকে ডাকিয়া সে তাহাকে ধরিয়া নামাইল।

অনেকক্ষণ পর অনির যখন চেতনা সঞ্চার হইল, তখন ভীতি-বিহ্বলা কণা তাহার বুকের উপর পড়িয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকিতেছিল—“মা, মা-মণি—”

অনি কণাকে নিবিড়ভাবে বুকে চাপিয়া ধরিয়া, বলিল—“মা—মা—মা-মণি আমার!”

অনিকে সুস্থ করিয়া মঞ্জিষ্ঠা যখন উঠিয়া দাঁড়াইল, নিরঞ্জন তখন ফল ও ঔষধের শিশি হাতে করিয়া দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। একটা গিরিবক্ষে বহুদিনের পথ হারানো দুখানি ক্লিষ্ট মেঘের মত দুজনের দেখা হইল, বিস্ময় ও নিবেদনের চকিত দৃষ্টি বিদ্যুতের ভিতর দিয়া।

(শেষ)

রুস্তমজী কাওয়াসজী

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

(২)

আশ্রিত-বৎসল রুস্তমজী কাওয়াসজী

রুস্তমজী কাওয়াসজীর আশ্রিত-বাৎসল্য এবং কর্ম্মচারীদের প্রতি সদয় ব্যবহারের কথা সমকালিক সংবাদপত্রে পাওয়া যাইতেছে। ১৮৩৯ সনের ৭ই সেপ্টেম্বরের সমাচার দর্পণ লেখেন,—

"লটারি। গত শুক্রবার লটারি খেলার শেষ দিবস যে লক্ষ টাকার প্রায়িজ ছিল তাহা যে টিকিটে উঠিল তাহা শ্রীযুক্ত রুস্তমজী কওয়াসজী কোম্পানী আপনারদের বোম্বাইস্থ একজন মওয়াকেকলের নামে খরিদ করিয়াছিলেন। আরো শুনা গেল যে দশ হাজার টাকার প্রায়িজ শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের কপালে উঠিল।"

'ফ্রেমজী কাওয়াসজী' জাহাজে করিয়া মরিসস দ্বীপে যে ভারতীয় শ্রমিক প্রেরণ করা হইত তাহার বিষয় ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। জাহাজে স্থানের অনুপাতে শ্রমিক সংখ্যা অত্যধিক হওয়ায় সরকারের এমিগ্রেশন এজেণ্ট ১৮৪৩ সনের গোড়ার দিকে জাহাজ ছাড়িতে অনুমতি দেন নাই। উপরন্তু, তিনি, শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অবহিত হইবেন না এই আশঙ্কায় জাহাজের প্রধান কর্ম্মচারী মিঃ জন মিলারকে কার্য্য হইতে ছাড়াইয়া লইতে আদেশ দেন। বলা বাহুল্য, রুস্তমজী কোম্পানী এমিগ্রেশন এজেণ্টের আদেশের প্রতিবাদ করিয়া তাঁহাকে এক কড়া চিঠি লেখেন, সরকারের হুজুরেও এক নিবেদন পেশ করেন। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া (৯ই মার্চ্চ, ১৮৪৩) বলেন, এমিগ্রেশন এজেণ্টের নিকট তাঁহার আদেশের প্রতিবাদ করিয়া এবং সরকারের নিকট প্রধান কর্ম্মচারীকে প্রয়োজন হইলে কর্ম্মচ্যুত করিতে সম্মতি জানাইয়া রুস্তমজী কাওয়াসজী বিশেষ সততার পরিচয় দেন নাই। এই পত্র দু'খানি আমাদের হস্তগত হয় নাই। তবে ইংলিশম্যানে প্রকাশিত রুস্তমজী কাওয়াসজী কোম্পানীর প্রশংসা ১৮৪৩ সনের ১৬ই মার্চ্চের ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া কাগজে মন্তব্য সহ উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার মর্ম্ম এই,—

বেন ব্যাকৃষ্টে নামক সংবাদদাতা 'কাওয়াসজী ফেমিলি'র (?) কর্ম্মচারীকে কর্ম্মচ্যুত করিতে অস্বীকার করিয়া, এবং তাঁহাকে রক্ষা করিতে মনস্থ করিয়া রুস্তমজী কাওয়াসজী কোম্পানী যে সাহসের পরিচয় দিয়াছেন তাহার প্রশংসা করিয়া ইংলিশম্যান কাগজে এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। তবে এই কোম্পানী কেন স্বেচ্ছায় উক্ত কর্ম্মচারীকে কার্য্য হইতে ছাড়াইয়া লইতে সরকারের নিকট রাজি হইয়াছিলেন সে সম্বন্ধে ব্যাকৃষ্টে কিছুই বলেন নাই।

সমাজ সংস্কারে রুস্তমজী কাওয়াসজী

সমুদ্র যাত্রায় বরাবর অভ্যস্ত থাকিলেও পার্শীগণ পূর্ব্বে পুরস্ত্রীগণের জাহাজারোহণে আদৌ পক্ষপাতী ছিল না। রুস্তমজী কাওয়াসজীই সর্ব্বপ্রথম পার্শী তথা ভারতবাসীদের এই অন্ধ সংস্কারের মূলে আঘাত করেন। তিনি ১৮৩৮ সনের আগষ্ট মাসে সহধর্ম্মিণী, পুত্রবধূ ও পরিজনবর্গকে জলপথে কলিকাতায় লইয়া আসেন। পরিবারের স্ত্রীগণের জাহাজযোগে কলিকাতা যাত্রার প্রস্তাবে বোম্বাই গেজেট (১৮৩৮, ১৬ই জুলাই) রুস্তমজীর সাহস ও উদারচিত্ততার প্রশংসা করিয়া এই মর্ম্মে লিখিয়াছিলেন,—

পারসিকগণ এযাবৎ ভারতীয়দের মধ্যে ব্যবসা ক্ষেত্রেই অগ্রসর বলিয়া পরিচিত ছিলেন, এখন তাঁহারা স্ত্রীগণকে সমুদ্র যাত্রা করাইয়া সমাজ সংস্কারেও অগ্রণী হইয়াছেন। ১

কাওয়াসজী-পরিবার কলিকাতায় পৌঁছিলে সমাচার দর্পণ (১৮৩৮, ১৮ই আগষ্ট) লেখেন,—

১ *The National Magazine* for May, 1908. রুস্তমজী কাওয়াসজী প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

"আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে আমারদের সহরবাসী শ্রীযুত রষ্টমজী কাওয়াসজীর শ্রীমতী সহধর্ম্মিণী বোম্বাই হইতে সমুদ্রপথে সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছেন যেরূপ হিন্দু ও মোসলমানের স্ত্রীলোকেরা সমুদ্রপথে জাহাজে গমনার্থ অনিচ্ছু তদ্রূপ পারসীয় স্ত্রীলোকেরাও বটেন অতএব দেশীয় রীতির বিরুদ্ধে এই প্রথম একজন স্ত্রী তদ্রূপ জাহাজারোহণে আগমন করিয়াছেন। ফলতঃ এমত সাহসী হইয়া দেশীয় কুব্যবহার যে পরিত্যাগ করিয়াছেন ইহাতে রষ্টমজী মহাশয়ের অত্যন্ত প্রশংসা হইয়াছে।"

রুস্তমজী স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন এবং স্ত্রী-পুরুষে মেলামেশার সমর্থন করিতেন। তাঁহার গৃহে যে-সব গণ্যমান্য অতিথি পদার্পণ করিতেন, তিনি তাঁহাদের সঙ্গে পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদের পরিচয় করাইয়া দিতেন এবং আলাপাদি করিতেও উৎসাহ দিতেন।

পার্শী অগ্নি-মন্দির

রুস্তমজী কাওয়াসজী লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২ কলিকাতা ২৬নং ডুমতলায় (বর্ত্তমান এজরা ষ্ট্রীট) পার্শীদের জন্য অগ্নি-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ১৮৩৯, ২৩এ মার্চ্চের সমাচার দর্পণে ইহার এইরূপ সংবাদ বাহির হয়,—

"নূতন মন্দির। সংবাদপত্র দ্বারা অগম হইল যে শ্রীযুত রষ্টমজী কাওয়াসজী ডুমতলায় অতি বৃহৎ একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়াছেন এবং তদুপরি বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া স্বজাতীয় কতিপয় পারসিয়েরদিগকে স্থাপন করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন তাঁহারা অগ্নির উপাসক।" ৩

ঐ সনের জুন মাসের মধ্যেই যে মন্দির নির্ম্মাণ শেষ হইয়াছিল তাহা নিম্নোদ্ধৃত সংবাদ হইতে জানা যাইবে,—

কলিকাতার পার্শীদের নূতন মন্দিরে এক ভীষণ ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। গতকল্য প্রাতে (১৯এ জুন) মন্দিরের পোর্টিকো ভাঙিয়া পড়ায় একজন মারা গিয়াছে, দুইজনের চোট লাগিয়াছে এবং তিনজন গুরুতরভাবে আহত হইয়াছে। ৪

মন্দিরটি ১৮৩৯ সনের ১৬ই সেপ্টেম্বর উৎসর্গ করা হয়। মন্দির-গাত্রে এই উৎসর্গ-পত্র উৎকীর্ণ আছে,—

In the name of Holy Hormuzd
This Fire Temple was built at Calcutta by
Rustomjee Cawasjee Banajee Esqre-
And Consecrated according to the rites of the
Masdiasna Religion

রুস্তমজী কাওয়াসজী

For the Service of God and the observance of
Sacred Rites of Zoroastrian Religion
In the 3rd year of the Reign of
Her Majesty Queen Victoria
On the 17th day of Shurosh of the
1st Month Furrurdeen Kudmee
In the year of yezdzerd 1209 and of
Zoroaster 2229

২ *The Indian Review* for December, 1839: Rustomjee Cowasjee, Esq.

৩ ভারতবর্ষ—আশ্বিন, ১৩৩৮। পৃঃ ৬০৯। শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত সমাচার দর্পণে সেকালের কথা (৭) শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৪ *The Friend of India*, June 27, 1839: The weekly Epitome of News, June 20.

Corresponding with Monday the 16th September of the Christian year 1839.

রুস্তমজী কাওয়াসজীর চিত্র

১৮৩৯ সনের পূর্ব্বেই রুস্তমজী কাওয়াসজী বদান্যতা ও দেশহিতৈষিতা গুণে যশস্বী হইয়াছিলেন। ঐ বৎসর সে-যুগের বিখ্যাত শিল্পী কোল্‌স্‌ওয়ার্দি গ্রাণ্ট তাঁহার একখানি চিত্র-পুস্তকে রুস্তমজীর চিত্র সন্নিবেশিত করেন। সমাচার দর্পণ (১৮৩৯, ৩০এ মার্চ্চ) ইহার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন,—

"পূর্ব্ব দেশীয় লোকের মুখচ্ছবি। পূর্ব্ব দেশীয় লোকের মুখচ্ছবি লিখিত চতুর্থ সংখ্যক গ্রন্থ শ্রীযুত গ্রাণ্ট সাহেব কর্ত্তৃক সম্প্রতি প্রকাশ হইয়াছে ঐ গ্রন্থের মধ্যে অতি বদান্য পরহিতৈষী পারসীয় মহাজন শ্রীযুত রষ্টমজী কাওয়াসজী এবং বঙ্গভাষায় গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীযুত তাঁরাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও কলিকাতাস্থ টাকশালের জমাদার শ্রীযুত রামপ্রসাদ দোবে ও শ্রীমহেশচন্দ্র তর্কপঞ্চানন এই সকল মহাশয়ের ছবি অবিকল মুদ্রিত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা শ্রীযুত গ্রাণ্ট সাহেব অতি প্রশংস্য হইয়াছেন।"

ইণ্ডিয়ান রিভিউ মাসিকে (ডিসেম্বর, ১৮৩৯) 'রুস্তমজী কাওয়াসজী' শীর্ষক প্রবন্ধের সঙ্গে রুস্তমজীর একখানি রেখা-চিত্রও বাহির হয়। কলিকাতার কাগজ-গুলিতে ইহার প্রশংসাসূচক আলোচনা হইয়াছিল।

শিখযুদ্ধে জয়লাভের পর শিখ-কামান কলিকাতায় পৌঁছিলে ১৮৪৭ সনের ৩রা মার্চ্চ বিজয়ব্যঞ্জক শোভাযাত্রা করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। কলিকাতার গণ্যমান্য লোকেরা ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। এই শোভাযাত্রার একখানি চিত্র (নং ১৬৫৪) কলিকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে টাঙান রহিয়াছে। চিত্রে অন্যান্য ব্যক্তিগণের মধ্যে রুস্তমজী কাওয়াসজী (২৬), পৌত্রী (২৭) ও পুত্র মানকজী রুস্তমজী (৩০) দাঁড়াইয়া আছেন। নিম্নের উক্তি হইতে এই চিত্রের কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে।

We hear that a drawing has gone home of the magnificent structure which later adorned the Midan, and under which the Sikh guns passed before anybody was up, and the fore-ground is a group of distinguished public characters....৫

জন-সেবায় রুস্তমজী কাওয়াসজী

ডিষ্ট্রীক্‌ট চেরিটেব্‌ল্ সোসাইটি

১৮০০ সনে কলিকাতার পাদ্রীরা মিলিত হইয়া দুঃস্থ নিঃসহায় ইংরেজ ও অন্যান্য বিদেশীয় খৃষ্টানগণকে আর্থিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা করেন। তাঁহাদের এই সাধু প্রচেষ্টা ১৮৩০ সনে পাদ্রী টার্ণারের পরিচালনায় ডিষ্ট্রীক্‌ট চেরিটেব্‌ল সোসাইটিতে পরিণত হইয়া রেজিষ্ট্রীকৃত হয়। ডিষ্ট্রীক্‌ট চেরিটেব্‌ল্ সোসাইটির ইতিবৃত্ত ও কর্ম্মধারার সঙ্গে সম্যক পরিচিত হইতে হইলে বার্ষিক রিপোর্টগুলির আশ্রয় লইতে হয়। আমরা সোসাইটি সম্পর্কে রুস্তমজী কাওয়াসজীর কার্য্যকলাপও এই সকল রিপোর্ট হইতে সংগ্রহ করিতে পারি। দুঃখের বিষয়, এই সকল রিপোর্টের পূর্ব্বাপর আমাদের হস্তগত হয় নাই। তথাপি, যেগুলি পাইয়াছি তাহা হইতেই রুস্তমজীর কৃতিত্ব সংকলন করিতে চেষ্টা করিলাম।

১৯২১ সনে প্রকাশিত নবতিতম রিপোর্টে সোসাইটির ইতিবৃত্ত প্রদান কালে এই মর্ম্মে বলা হইয়াছে,—

দুই বৎসর পরে, ১৮৩২ সনে অখৃষ্টীয় দরিদ্র জনে[র] সাহায্যের ব্যবস্থা করিবার জন্য ৩২ জন হিন্দু, ১ জন পার্শী ও পাঁচ জন ইউরোপীয় লইয়া কমিটি গঠিত হয় এ[বং] লেফ্‌টনেণ্ট বার্ট ইহার সেক্রেটারি নিযুক্ত হন।

১৮৩৩ সনে প্রকাশিত সোসাইটির দ্বিতীয় রিপো[র্টে] (১৮৩২) এই মর্ম্মে লেখা আছে,—এতদ্দেশীয় দরিদ্র জনে[র] সাহায্যের ব্যবস্থা সম্প্রতি করা হইয়াছে, দেশীয় প্রতিনি[ধি] লইয়া সোসাইটির অন্তঃকমিটি নিয়োগের প্রস্তাব স্থগি[ত] রাখা হইল এবং পরবর্ত্তী রিপোর্টে (৩য়) কমিটির বি[বরণ] প্রকাশ করা হইবে। নবতিতম রিপোর্টে লিখিত ১৮[৩২] সনের স্থানে ১৮৩৩ সন হইবে। ৺প্যারীচাঁদ মিত্র বলেন, ১৮৩৩ সনের ২২এ এপ্রিল সোসাইটির সভ[ায়] দেশীয়গণকে সাহায্য দানের নিমিত্ত "Commitee of t[he] Relief of the Native Poor নামে একটি অন্তঃক[মিটি]

৫ *The Eastern Star*, March 27, 1847.

গঠিত হয়।৬ এই অন্তঃকমিটির তৃতীয় অধিবেশনে (১৮৩৩, ৩০এ এপ্রিল) রুস্তমজী কাওয়াসজী ইহার অন্যতম সভ্য নিযুক্ত হন।৭

সোসাইটির চতুর্থ রিপোর্টে (১৮৩৪) প্রকাশ, এই নেটিভ কমিটি ৭ জন ইংরেজ, ৩২ জন হিন্দু ও ১ জন পার্শী লইয়া গঠিত। কমিটি কার্য্য সুপরিচালনার জন্য কলিকাতাকে বস্তুতঃ দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটি বিভাগের সীমা নির্দ্দেশ করেন এবং প্রত্যেক বিভাগের সভ্যদের মধ্য হইতে দুই কি তিন জন করিয়া দর্শক (Visitor) নিযুক্ত হন। রুস্তমজী কাওয়াসজী দ্বিতীয় বিভাগে অন্যতর দর্শক নিযুক্ত হইলেন। এই বিভাগের সীমানা—দক্ষিণে জানবাজার ষ্ট্রীট, উত্তরে বৌবাজার ও বৈঠকখানা ষ্ট্রীট, পূর্ব্বে সার্কুলার রোড ও পশ্চিমে ষ্ট্রাণ্ড রোড।

১৮৩৭ সনে কলিকাতার উত্তর-পূর্ব্বাংশের গৃহাদি অগ্নিতে ভস্মসাৎ হইলে নেটিভ কমিটি গৃহহীনদের গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য চাঁদা তুলিয়াছিলেন। অর্থ গৃহহীনদের মধ্যে যথারীতি বিতরণ করিয়াও ঐ সনে কমিটির ১৪,০০০ টাকা অবশিষ্ট ছিল।৮

সোসাইটির দশম রিপোর্ট (১৮৪০) পাঠে জানা যায়, কলিকাতা তখন দ্বাদশ ভাগের বদলে দুই ভাগে বিভক্ত, উত্তর বিভাগ ও দক্ষিণ বিভাগ, এবং রুস্তমজী কাওয়াসজী দক্ষিণ বিভাগের দর্শক।

দুঃস্থ ও নিঃসম্বল ব্যক্তিদিগকে কর্ম্মের বিনিময়ে যাহাতে অর্থ-দান করা হয়, এই উদ্দেশ্যে সোসাইটির সভ্যগণের, বিশেষতঃ ভারতীয় সভ্যগণের মধ্যে বহুদিন যাবৎ আন্দোলন চলিয়াছিল। অতঃপর ১৮৪০ সনের ৩০এ এপ্রিল টাউনহলের সভায় স্থির হয় যে, নগদ অর্থ না দিয়া দুঃস্থগণকে ভিক্ষা-গৃহে (Alms House) আশ্রয় দিয়া তাহাদের জন্য একটি কর্ম্মশালা (Work House) নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হইবে। আর এক প্রস্তাবে প্রকাশ্য স্থানে ভিক্ষা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে 'ভ্যাগ্র্যাণ্ট এ্যাক্ট' পাশ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জানান হয়। এই সাধু প্রস্তাবগুলি সমর্থন করিতে গিয়া দ্বারকানাথ ঠাকুর সভায় এই মর্ম্মে বলেন,—

দরিদ্রজনের সাহায্যার্থ প্রস্তাবিত উপায় অবলম্বনের কথা ইতিপূর্ব্বে সোসাইটির ভারতীয় সভ্যগণের মনেও উদিত হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত দেশীয়গণের এক জনসভায় ভিক্ষা-গৃহ স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়, এবং ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য মতিলাল শীল ভূমি দান করিতে ও রুস্তমজী কাওয়াসজী টালির ঘর নির্ম্মাণের ব্যয়ভার বহন করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। আইন করিয়া প্রকাশ্য স্থানে ভিক্ষা বন্ধ করিবার প্রস্তাবও সভায় বিবেচিত হইয়াছিল। যখন নেটিভ কমিটি এই বিষয় বিবেচনা করিতেছিলেন তখন মূল সোসাইটি এই ব্যয়-ভার স্বহস্তে লওয়ায় কমিটি আর অধিক দূর অগ্রসর হওয়া সমীচীন বিবেচনা করেন নাই।৯

উপরের উক্তি হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, বহুদিন যাবৎ আন্দোলন চলিলেও ভিক্ষা-গৃহ স্থাপনে সোসাইটির ভারতীয় সদস্যগণই অগ্রণী হইয়াছিলেন।

টাউনহলের সভায় নির্দ্দিষ্ট বিষয়গুলি সম্বন্ধে সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালাইবার জন্য সোসাইটির এগার জন সভ্য লইয়া তখন এক বিশেষ কমিটি স্থাপিত হয়। বিশেষ কমিটির সভ্যদের মধ্যে ভারতীয় ছিলেন ৩ জন,—প্রসন্ন-কুমার ঠাকুর, মতিলাল শীল ও রুস্তমজী কাওয়াসজী। বিশেষ কমিটি টাউনহলের সভায় নির্দ্দিষ্ট বিষয়গুলির উপর নির্ভর করিয়া ভিক্ষুকের উপদ্রব দূরীকরণার্থ এক আইন পাশ করিতে ৩০এ মে পত্র দ্বারা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন। ভিক্ষা-গৃহ স্থাপনেও যে সোসাইটি মানস করিয়াছেন তাহাও এই পত্র দ্বারা সরকারের গোচর করান হয়।১০ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎপীড়ক ভিক্ষুকদের শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করা হইবে সরকার এই মর্ম্মে এক আইনের খসড়া

৬ The *National Magazine* for March, 1908. P. 89.

৭ *The India Gazette May* 6, 1833

৮ Seventh Report (1837), District Charitable Society.

৯ Tenth Report (1840). Also *The Friend of India*, May 7, 1840.

১০ *The Friend of India*, Oct. 8, 1840 : District Charitable Society.

প্রকাশ করেন। কমিটি পুনরায় ৩০এ সেপ্টেম্বর ইহার প্রতিবাদ করিয়া সরকারের হুজুরে এক পত্র প্রেরণ করেন। পত্রের অংশ-বিশেষের মর্ম্ম এই,—

সোসাইটি যে-আইন পাশ করিতে সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন, সরকার তাহা সংশোধিত আকারে ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিতে কেন উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন তাহা তাঁহাদের জানা নাই। তাঁহারা সবিনয়ে জানাইতেছেন যে, সোসাইটি যে-উদ্দেশ্যে আইন করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, আইনের মুদ্রিত বর্ত্তমান খসড়ার ধারাগুলি তাহার পক্ষে মোটেই পর্য্যাপ্ত নহে। ভিক্ষা-গৃহ নির্ম্মিত হইলে লোকেরা যাহাতে সকল শ্রেণীর ভিক্ষুকের উপদ্রব হইতে রক্ষা পায় এই উদ্দেশ্য লইয়াই গবর্ণমেণ্টকে আইন করিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল। ১১

বিশেষ কমিটির পত্রে কাজ হইয়াছিল। ১৮৪০ সনের ২০এ নবেম্বর 'ভ্যাগ্রাণ্ট এ্যাক্ট' পাশ হয়। সরকার ভিক্ষা-গৃহ নির্ম্মাণার্থ ১৮৪০ সনের ১৪ই অক্টোবর সোসাইটিকে ৩৪ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের ভূমি, এবং সোসাইটির কুষ্ঠাশ্রমের জন্য ঐ ভূমি সংলগ্ন ২৬ নং দাগের জমি (৪ বিঘা ৬ ছটাক) দান করেন। ভিক্ষা-গৃহ নির্ম্মাণের জন্য রুস্তমজী এককালীন দু'হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। ১২

সোসাইটির ঊনবিংশতিতম রিপোর্টে (১৮৪৯) প্রকাশ, ঐ বৎসর সোসাইটির আইন-কানুন কতকটা অদল-বদল হয়। নেটিভ কমিটিও তখন আমূল পরিবর্ত্তিত হয়। সম্ভবতঃ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতনের সঙ্গে সঙ্গে রুস্তমজী ইহার সভ্যপদ ত্যাগ করেন।

রুস্তমজী যতদিন সোসাইটির সভ্য ছিলেন, এককালীন দান বাদে, বার্ষিক দুই শত টাকা করিয়া চাঁদা দিতেন। ১৩

১৮৩৯ সালে ভারতীয়গণের পক্ষ হইতে কলিকাতায় একটি কুষ্ঠাশ্রম স্থাপনেরও চেষ্টা হইয়াছিল। সমাচার দর্পণ (১৬ই মার্চ্চ, ১৮৩৯) বলেন,—

শুনিলাম যে শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল শীল কুষ্ঠী ব্যক্তিদিগের বাস নিমিত্ত মৃজাপুরে একটা স্থান করিয়াছেন এবং রোস্তমজী কওয়াসজী ঐ নিমিত্ত খোলা ঘর নির্ম্মাণে উদ্যুক্ত হইয়াছেন। —জ্ঞানান্বেষণ

কলিকাতার উন্নতি-বিধানে রুস্তমজী কাওয়াসজী

আজিকার এবং এক শত বৎসর পূর্ব্বেকার কলিকাতায় আকাশ-পাতাল প্রভেদ। তখন কলিকাতা সর্ব্বরোগের আকর ছিল। সেখানকার রাস্তাঘাট, পয়ঃপ্রণালী, পানীয় জল ও গৃহাদির মোটেই সুবন্দোবস্ত ছিল না। বর্ষা-শেষ হইতে শীতের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত এক জ্বরোগেই হাজার হাজার লোকের দেহান্ত ঘটিত। কলিকাতার ধর্ম্মতলাস্থ নেটিভ হাঁসপাতালের পরিচালকগণ ইহার প্রতীকারের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য ১৮৩৫ সনের ২০এ মে কমিটির এক বিশেষ সভা আহ্বান করেন। এই সভায় পরিচালকগণের কয়েক জনকে লইয়া এক অন্তঃকমিটি গঠিত হয়, উদ্দেশ্য—(১) শহরের মধ্যভাগে সর্ব্বপ্রকার, বিশেষতঃ জ্বরাক্রান্ত দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসার জন্য একটি ফিভার হাঁসপাতাল স্থাপন, এবং (২) শহরের ও শহরতলীর স্বাস্থ্যের উন্নতির উপায়াদি নির্দ্ধারণ করিয়া গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট পেশ করা। তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত সাধারণের গোচর করিবার জন্য কমিটির পক্ষ হইতে ইহার অন্যতম সভ্য মিঃ ডব্‌লিউ স্মিথের সভাপতিত্বে ১৮ই জুন কলিকাতা টাউনহলে এক জনসভার অধিবেশন হয়। রুস্তমজী কাওয়াসজী সভায় যোগদান করিয়া ফিভার হাঁসপাতাল স্থাপনের নিমিত্ত যে অর্থ দান করিয়াছিলেন এবং চাঁদা আদায়ের জন্য ভারতীয় কমিটিতে যে অন্যতম সভ্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। নেটিভ হাঁস-পাতালের অন্তঃকমিটিতে জনগণের প্রতিনিধিস্বরূপ কয়েক জন সভ্য লইবার প্রস্তাবও এই সভায় গৃহীত হয়, এবং পরে দশ জন সভ্য কমিটিতে যুক্ত হন। বলা বাহুল্য, রুস্তমজী কাওয়াসজী এই দশজনের মধ্যে একজন ছিলেন। প্রথমতঃ, কমিটির উদ্দেশ্য লইয়া সরকারের সঙ্গে কিছুকাল পত্র-ব্যবহার চলে। পরে, ১৮৩৬ সনের ৩রা জুন বাংলার লাট

১১ *Ibid.*

১২ The Eleventh Report, (1841.) and *The National Magazine* for March 1908. P. 74.

১৩ সোসাইটির ৪র্থ, ৫ম, ৭ম, ১০ম ও ১১শ রিপোর্টের বার্ষিক চাঁদা-দাতৃগণের তালিকায় ইহার উল্লেখ আছে। অন্য রিপোর্টগুলি পাই নাই। তবে যেগুলি পাইয়াছি তাহা হইতে উপরের সিদ্ধান্ত করা বোধ হয় অমূলক নহে।

অকল্যাণ কমিটির উদ্দেশ্য অনুমোদন করিয়া ইহার সঙ্গে কলিকাতার কর-নির্দ্ধারণ ও কর-আদায়ের ব্যবস্থার অনুসন্ধানের ক্ষমতাও কমিটিকে দেন এবং তাঁহার মনোনীত দুইজন বিশেষজ্ঞকে ইহার সভ্য নিয়োগ করেন। ভারতীয় দশজন সভ্যের মধ্যে মাত্র তিনজন (রুস্তমজী কাওয়াসজী, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রসময় দত্ত) কমিটির কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। অতঃপর এই কমিটি ১৪ গবর্ণমেণ্ট মনোনীত বলিয়াই গণ্য হইল। ১৪

উদ্দেশ্য ব্যাপক হইয়া পড়ায় কমিটি তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। কর নিরূপণ, আদায় এবং ব্যয়ের ব্যবস্থা অনুসন্ধান প্রথম কমিটির কার্য্য হইল। দ্বিতীয় কমিটি শহর সংরক্ষণ (Conservancy) বিভাগের ব্যবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার ভার লইলেন। ১৫ ফিভার হাঁসপাতালের জন্য চাঁদা সংগ্রহ ও স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত নানা ব্যাপারের বিবেচনার ভার পড়িল তৃতীয় কমিটির উপর। রুস্তমজী কাওয়াসজী দ্বিতীয় কমিটির সভ্য নিযুক্ত হন। ১৬

দ্বিতীয় কমিটির সভ্য হইলেও মূল কমিটির সভ্য ও কলিকাতার অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হিসাবে রুস্তমজী কাওয়াসজী প্রত্যেক কমিটিকেই নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দ্বারা সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রত্যেক কমিটির সম্মুখে তিনি যে সাক্ষ্য দেন ও মতামত প্রকাশ করেন তাহা হইতে সেকালের কলিকাতার, বিশেষতঃ বাঙালী অধ্যুষিত উত্তরাঞ্চলের বাসস্থান, গৃহ-নির্ম্মাণ-রীতি, রাস্তা ঘাট, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, জলাভাব, বাঙালীদের অভ্যাস ও আচরণ প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁহার গভীর জ্ঞান প্রকটিত হইয়াছে। তিনি শহরের দুর্দ্দশার প্রতীকার-কল্পে যে-যে উপায় অবলম্বন করিবার জন্য মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, প্রত্যেক কমিটি তাহা সাদরে গ্রহণ করেন, এবং সাধারণ কমিটির রিপোর্টে তাহা সন্নিবেশিত হয়।

সেকালের কলিকাতায় চালাঘরের সংখ্যাধিক্য থাকায় চৈত্র-বৈশাখ মাসে আগুন লাগিয়া পাড়াকে-পাড়া পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইত। ১৮৩৭ সনের ১লা জানুয়ারি হইতে ১লা মে পর্য্যন্ত কলিকাতার চালাঘরের শতকরা ১৫খানা, এবং শুধু এপ্রিল মাসেই মোট চালাঘরের অষ্টমাংশ আগুনে পুড়িয়া যায়। ইহার প্রতীকার-পন্থা নির্ণয়ের ভার প্রথম কমিটির উপর পড়িলে কমিটি বিশেষজ্ঞদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। ১৭ রুস্তমজী কাওয়াসজী মে মাসে দুই তারিখে ইহার নিকট সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন। প্রথমবারের সাক্ষ্যে তিনি বলেন যে, শহরের উত্তরাংশে অগ্নির প্রকোপ তিনি সম্প্রতি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। আগুন নিভাইবার জন্য দমকল আসিয়াছিল, কিন্তু জলাভাবে ইহা কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই। ১৮ রুস্তমজী অগ্নির প্রকোপ নিবারণের জন্য দুইটি উপায় নির্দ্ধারণ করেন,—(১) বহুসংখ্যক সুগভীর পুষ্করিণী খনন, এবং (২) জনগণকে চালাঘরের বদলে খোলার ঘর নির্ম্মাণে বাধ্য করানো। পুষ্করিণী খনন সম্পর্কে তিনি বলেন,—

"আপার সার্কুলার রোড দিয়া বরাবর কিছু ব্যবধানে কতকগুলি গভীর বড় পুষ্করিণী অবিলম্বে খনন করা আবশ্যক। শহরের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে এখানেই জলের একান্ত অভাব। অগ্নিদগ্ধ ঘরবাড়ীর স্থানে জমিদারগণ পুনরায় গৃহ নির্ম্মাণ করার পূর্ব্বে অল্প মূল্যেই ভূমি ক্রয় করা যাইতে পারে। ইহার ব্যয়ভার সরকারের বহন করা উচিত। তবে এ কার্য্যে সরকারকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য, সরকার যদি ভূমি ক্রয় করেন, আমিই বৈঠকখানা, মির্জ্জাপুর, এবং মাণিকতলায় নিজ ব্যয়ে চারিটা পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিব। আমি নিশ্চিত

১৪ স্যর ই. রায়ান, স্যর জে. পি. গ্রাণ্ট, সি. ভব্‌লিউ স্মিথ, রামকমল সেন, এস্. নিকলসন, জে. আর. মার্টিন, এ. আর. জ্যাকসন, রুস্তমজী কাওয়াজী, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রসময় দত্ত, আর. ককেরেল, ও রজার্স, ইঁহারা ছিলেন কমিটির সভ্য।

১৫ *The Fever Hospital and Municipal Enquiry Commitee* (1st Report, Jany. 7 1840) & *The Calcutta Courier*. June 19, 1835 হইতে তথ্য গৃহীত।

১৬ *The Fever Hospital & Municipal Enquiry Commitee*, (1st report. January 7, 1840.)

১৭ *Ibid.* Appendix A-C.

১৮ *Ibid.* Appendix C. Minutes on the Late Fires. CxxxIx.

জানি, অনেক ধনী জমিদার শহরের অন্যান্য অংশেও এইরূপ পুষ্করিণী খনন করাইবেন।" ১৯

রুস্তমজী ১৮৩৮ সনের ১০ই জানুয়ারি দ্বিতীয় কমিটির অধিবেশনে পুষ্করিণীর গভীরতা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন,—

"কলিকাতায় আমার অধীনস্থ বিভিন্ন জায়গায় অনেকটি পুষ্করিণী কাটাইয়াছি; কাজেই এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে।" ২০

রুস্তমজী উপরোক্ত প্রস্তাব অনুসারে যে নিজ ব্যয়ে পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন এই উক্তিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সরকার যে তখন তাঁহার প্রস্তাবে রাজি হইয়া পুষ্করিণীর জন্য ভূমি ক্রয় করেন নাই তাহাও স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

রুস্তমজী কাওয়াজী চালা ঘরের বদলে খোলার ঘর নির্ম্মাণের আবশ্যকতা কমিটিকে বুঝাইয়া দেন, এবং ইহার বিরুদ্ধ মত অকাট্য যুক্তি তর্ক দ্বারা খণ্ডন করেন। তিনি বলেন যে, প্রত্যেক খোলার ঘর নির্ম্মাণে চালা ঘরের চেয়ে দেড় টাকা আন্দাজ বেশি লাগিবে বটে, কিন্তু অন্যান্য সুবিধার কথা ধরিতে গেলে এ ব্যয় কিছুই নহে। খোলার ঘর একক্রমে ছয়, আট, এমন কি দশ বৎসরও টিকিয়া যায়, কিন্তু চালা ঘর দু'তিন বৎসরের অধিক কোন মতেই টিকে না। চালা ঘর প্রতি বৎসর মেরামত করা দরকার, খোলার ঘর মেরামতের হাঙ্গামা নাই। খোলার ঘরে স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কাও অমূলক; কারণ বোম্বাই ও মাদ্রাজ খোলারঘর-বহুল হইলেও এই কারণে তথায় অসুখ বিসুখ হওয়ার কথা শুনা যায় না। উপরন্তু, প্রত্যেকবার চালা-ঘর আগুনে পুড়িয়া যায় বলিয়া দরিদ্র জনেরা একেবারে সর্ব্বহারা হইয়া যায় এবং তখন তাহাদের দুর্দ্দশার অন্ত অবধি থাকে না। ইহার একমাত্র প্রতীকার আইন করিয়া জমিদারদের ও লোকেদের চালা ঘরের পরিবর্ত্তে খোলার ঘর নির্ম্মাণে বাধ্য করানো। ২১ দরিদ্রজনের এই দুঃসময়ে এরূপ আইন পাশ হইলে তাহাদের যে ভীষণ বিপদে পড়িতে হইবে তাহা রুস্তমজী বিলক্ষণ জানিতেন, এবং জানিতেন বলিয়াই কমিটির সমক্ষে সাধারণের সাহায্যের জন্য একটি সমিতি স্থাপনের প্রস্তাব করেন। তাঁহার প্রস্তাব যে একদা পুরাপুরি কার্য্যকরী হইয়াছিল, নিম্নের উক্তি হইতে তাহা বুঝা যাইবে;—

"ইতিপূর্ব্বে পুলিস হইতে এমত ঘোষণাপত্র প্রকাশ হইয়াছিল, নগর মধ্যে কেহ তৃণাচ্ছাদিত গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন না এবং নগরবাসি সম্ভ্রান্ত ইংরাজ, বাঙ্গালি, পার্সি প্রভৃতি সাধারণে এক প্রকাশ্য সভা করিয়া চাঁদা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ আরম্ভ করিয়াছিল, অর্থাৎ খোলার ঘর করিতে যাহারদিগের নিতান্ত সঙ্গতি না হইবেক তাহার-দিগের সেই টাকা হইতে সাহায্য করিবেন, একারণ ঐ সভা হইতে "ফায়ার কমিটি" নামে এক কমিটিও হইয়াছিল, বিখ্যাত পার্সিবণিক রুস্তমজী কোয়াসজী তাহাতে বিস্তর টাকা দিয়াছিলেন, এইক্ষণে সেই কমিটিই বা কোথায় এবং পুলিসের সেই অনুমতিই বা কোথায় প্রতিপালিত হইতেছে তাহা আমরা বলিতে পারি না।" ২২

শহর স্বাস্থ্যময় ও সৌষ্ঠবপূর্ণ করিতে হইলে কতকগুলি কার্য্য ব্যাপকভাবে করা আবশ্যক। গৃহাদির অবস্থান ও নির্ম্মাণের সুব্যবস্থা, অবাধে বায়ু চলাচলের জন্য ও যাতায়াতের জন্য প্রশস্ত রাস্তা নির্ম্মাণ, পানীয় জলের অভাব

১৯ I would recommend that a line of deep, large tanks should be immediately dug, at convenient distances, all along the Upper Circular Road. Where water is more scarce, than any other part of the ground might now be perchased at moderate prices before the proprietors have time to erect new huts on the site of those burnt down. I think the Government ought to bear the expense, but as an inducement for them to come forward *I will undertake, if Government will buy the ground, to excavate at my own expense four large tanks between the Boitaconnah, Mirzapore and Manicktollah* and I am sure many rich land-holders will do as much or more in other parts of the town. (*Italics ours.*)

Report of the Fever Hospital and Municipal Enquiry Committee-Appendix C. Minutes on the Late Fires. C x x x i x, May, 1837.

২০ "I have made a good many tank in different places in my own ground in Calcutta, and consequently have considerable experience in this matter."

২১ *Report of the Fever etc.* Appendix C. Minutes C xxxix & C xvi.

২২ সংবাদ প্রভাকর, ৪ মার্চ্চ ১৮৫৩

দূরীকরনার্থ সুগভীর পুষ্করিণী খনন এবং পয়ঃপ্রণালীর প্রতিষ্ঠা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। দ্বিতীয় কমিটির পক্ষ হইতে ইহার সভাপতি স্যর জন পিটর গ্রাণ্ট ও সভ্য রুস্তমজী কাওয়াসজী কখনও একযোগে, এবং কখনও-বা রুস্তমজী কাওয়াসজী একাকী শহরের দেশীয় অঞ্চল বিশেষের ২৩ অলি-গলিতে পর্য্যন্ত গমন করিয়া তথ্য নিরূপণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহারা ঐ স্থান সম্বন্ধে যে রিপোর্ট করেন তাহার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এই,—

কলেজ ষ্ট্রীটের কাছাকাছি কতকটা জায়গা ছাড়া এই অঞ্চলের সর্ব্বত্রই ঘন বসতি। এ অঞ্চলের বাড়ি ও দোকান-ঘরগুলি পাশাপাশি অবস্থিত। বাড়িগুলি ততটা উঁচু না হইলেও আলো-বাতাস চলাচলের ব্যাঘাত ঘটাইবার পক্ষে যথেষ্ট। রাস্তাগুলি সরু, আঁকাবাঁকা ও ঘোরালো হওয়ায় এখানে বায়ুর স্বতঃ চলাচল প্রায় বন্ধ। রাস্তাগুলি দৈর্ঘ্যে পোয়া মাইলেরও কম এবং কদাচিৎ বার ফুটের অধিক প্রশস্ত। এই বার ফুটের আবার প্রায় তিন ফুট জুড়িয়া পচা জল ও আবর্জ্জনাপূর্ণ দু'তিন ফুট গভীর নর্দ্দমা। এই নর্দ্দমার উপরিভাগ সেতু দ্বারা একেবারে ঢাকা—অবশ্য মধ্যে মাঝে দু'এক ফুট ফাঁক আছে। সেতুর উপর দিয়া গৃহে প্রবেশের পথ, আবার অনেক স্থলে সেতুর অব্যবহিত গায়েই এক হইতে তিন ফুট উঁচুতে দোকান-ঘর তৈরি হইয়াছে। নর্দ্দমার উপরিস্থ সেতুই প্রকৃত প্রস্তাবে দোকান-ঘরের নির্ভর হওয়ায় ইহা কখনও পরিষ্কার করা সম্ভবপর হয় না। মাঝে মাঝে যে ফাঁক আছে তাহা হইতে অনবরত দুর্গন্ধ বাহির হয়। ইহাতে কি রাস্তায় কি বাড়িতে কোথাও তিষ্ঠিতে পারা যায় না। ২৪

রিপোর্টের শেষে রুস্তমজী কাওয়াসজী বৎসরের অন্যান্য সময়ে, বিশেষতঃ বর্ষাকালে, এই অঞ্চলের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলেন,—

তিনি [রুস্তমজী] বর্ষাকালে বহুবার এই অঞ্চলে গমন করিয়াছেন। অল্প বারিপাতেই এই অঞ্চলের নর্দ্দমাগুলি পূর্ণ হইয়া যায়, এবং জল নিষ্কাশনের পথ একরূপ না থাকায় রাস্তায় দু'এক ফুট জল জমিয়া যায়। জল নিঃসরণ হইতে প্রায়ই আট ঘণ্টা সময় লাগে। এই সময়ে জলের ভিতর দিয়াই যাতায়াত করিতে হয়। এ অঞ্চলের বাড়িগুলি রাস্তার ইঞ্চিকয়েক নীচুতে অবস্থিত। কাজেই জলে বাড়ির নিম্নভাগ অনেকক্ষণ ডুবিয়া থাকে এবং ইহা অস্বাস্থ্যকর হয়। ২৫

২৩ লালবাজার, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, মেছুয়াবাজার এবং কলেজষ্ট্রীটের মধ্যবর্ত্তী স্থান। *The fever Hospital and Municipal Enquiry Gommittee Report.* Appendix D. P. 74.

২৪ The whole of this place, with the exception of some places near College Street, is most thickly inhabited; the houses and shops adjoin; and though not lofty, are sufficiently high to exclude sun and air; the free circulation of the latter of which is effectualy prevented, by the extreme narrowness sharp angles and perpetual tortuosities of the streets; few streets being more than a quarter of a mile in length in the same direction, and may not so much; none of the streets except those to be presently mentioned much exceeding twelve feet between the front walls of the opposite houses, many being much narrower; and often space from one foot, to one and a half foot in width, being occupied by a kennel on each side. These kennels are apparently two or two and a half feet deep with brick sides, the bottoms filled with perfectly stagnant water and filth; and tops covered, at distances of from one foot to two feet and two and a half feet apart with buildings from six to ten feet in length, which in a few places are the entrances to houses; but which in all other instances are the supports of the platform used as shops; which platforms are erected immediately over the Kennel, from one foot to three feet above it, the space between the bridge and the platform being closed to the front, so that no part of the kennel is accessible for the purpose of cleansing it but the above mentioned intervals of one, two, or two and a half feet in length at various instances of not less than six or more than ten feet from each other; while the whole stench freely escapes into the streets and houses.

The Fever Hospital & Municipal Enquiry Committee Report. Appendix D. P. 74.

২৫ He [Rustomjee] has frequently seen the part of the town above described during the rains, and that after an ordinary fall of rain, the Kennels having no outlet, overflow and cause the water to cover the streets to the depth of one foot or more—and that it sometimes takes a whole day to run off seldom less than eight hours during which there is no passage but through this water; and the houses (of

রুস্তমজী ও গ্রাণ্ট সাহেব দ্বিতীয় বার একযোগে ঐ অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া এই রিপোর্ট দেন,—

আমরা পুনরায় শহরের দেশীয় অঞ্চল পরিদর্শন করিলাম। পূর্ব্ব বারের চেয়ে এবার এইমাত্র প্রভেদ যে, এবার আবর্জ্জনা-জঞ্জাল অত্যধিক দেখিলাম। নানা বাধার সৃষ্টি করিয়া রাজপথ আগলানো হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেটগণের এদিকে আদৌ দৃষ্টি আছে বলিয়া মনে হয় না। ২৬

এই রিপোর্ট পেশ করিবার পর কমিটিতে সুপ্রশস্ত রাস্তা নির্ম্মাণের প্রশ্ন উঠে। রাস্তা নির্ম্মাণ করিতে হইলে সরকারকে সাধারণের নিকট হইতে জায়গা ক্রয় করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে লাভালাভের কথা উঠিলে রুস্তমজী বলেন যে, রাস্তা নির্ম্মাণার্থ জায়গা ক্রয় করিতে সরকারের যে ব্যয় পড়িবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহার দেড় গুণ লাভ হইবে। কারণ, প্রশস্ত রাস্তার দুই পাশের জমির চাহিদা বেশী হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কাজেই জায়গার দাম ঢের বাড়িয়া যাইবে। ২৭

অগ্নির প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্তই যে পুষ্করিণী আবশ্যক তাহা নহে, সুপেয় জলের অভাব নিরাকরণের জন্যও ইহার একান্ত প্রয়োজন। সেকালের কলিকাতায় ব্যাধির প্রাদুর্ভাবের অন্যতম কারণ সুপেয় জলের অভাব। বৈঠকখানা অঞ্চলের অধিবাসীদের মুখপাত্র এ, ডিসুজা সাহেব সাধারণ ও শহর সংরক্ষণ কমিটির সভ্য হিসাবে রুস্তমজীকে এক পত্রে তাঁহাদের জলের অভাবের কথা জ্ঞাপন করেন। রুস্তমজী এই পত্রের উল্লেখ করিয়া প্রথম কমিটির সমক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, আগুন লাগিলেই যে জলের অভাব অনুভূত হয় তাহা নয়, রন্ধনের ও পানের জন্যও লোকেদের অশেষ কষ্ট হইয়া থাকে। ইহার পর দ্বিতীয় কমিটিতে পুষ্করিণী খননের কথা উঠিলে রুস্তমজী নিজের অভিজ্ঞতা হইতে ইহার ব্যয় প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পুষ্করিণীর গভীরতা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, বিশ ফুটের পরিবর্ত্তে পুষ্করিণী ত্রিশ ফুট গভীর করিতে হইবে। ইহার কম হইলে সুপেয় জলের সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটিবে। ২৮

দ্বিতীয় কমিটিতে রুস্তমজীর যুক্তিপূর্ণ সারগর্ভ আলোচনা (রাস্তা নির্ম্মাণ ও পুষ্করিণী খনন সম্পর্কে) পাঠ করিয়া দ্বারকানাথ ঠাকুর কমিটির সভাপতি মহাশয়কে এই মর্ম্মে লেখেন,—

আমি রুস্তমজীর আলোচনা সযত্নে পাঠ করিয়াছি, এবং ইহা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিতে পারিয়া সুখ অনুভব করিতেছি। পৃথক উত্তর দেওয়ার কোনই প্রয়োজন নাই।.....২৯

ফিভার হাসপাতাল স্থাপনার্থ তৃতীয় কমিটি আশানুরূপ টাকা তুলিতে না পারায় সাধারণ কমিটির মত অনুযায়ী আদায়ী টাকা ৬৭,৯২৩৸৵৭ পাই (কাহারও মতে, ৫৫,৪৬২৲ ৩০) দুইটি সর্ত্তে ১৮৪৭ সনের ২৩এ এপ্রিল কলিকাতার শিক্ষা পরিষদে (Council of Education) দান করেন,—(১) টাকা দ্বারা কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিতে হইবে, এবং (২) যত শীঘ্র সম্ভব একটি ফিভার হাসপাতাল স্থাপন করিতে হইবে। ৩১

১৮৪৮ সনের ৩০এ সেপ্টেম্বর তৎকালীন বড়লাট লর্ড ডালহৌসি কর্ত্তৃক মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন বার হাজার টাকা মূল্যের মতিলাল শীল কর্ত্তৃক প্রদত্ত একখণ্ড জমির উপরে হাসপাতালের ভিত্তি স্থাপিত হয়। হাঁসপাতালের নাম হইল মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতাল। ৩২

প্রথম কমিটির উপর যেমন আগুনের প্রকোপ এড়াইবার

which there are many) which are a few inches lower than the road, or street, have the lower part overflowed, and rendered uninhabitable. *Ibid.*

২৬ *The Fever Hospital and Municipal Enquiry Committee Report.* Appendix D. P. 75.

২৭ *Ibid.* P-p. 193—195. Rustomjee Cowasjee before Municipal Enquiry 2nd Sub-Committee.

২৮ *Ibid.*

২৯ *The Fever Hospiial and Municipal Enquiry Committee Report.* Appendix D. P. 195.

৩০ *The Friend of India*, October 5, 18 48.

৩১ *The Fever Hospital and Municipal Enquiry Committee* (3rd Report) P. 8.

৩২ *The Friend of India* October 5, 1848.

উপায় নিরূপণের ভার পড়িয়াছিল তৃতী কমিটির উপর-ও তেমনই খেয়াঘাট ব্যবস্থার আলোচনার ভার পড়ে। তখন হাজার হাজার লোক গঙ্গা পারাপার হইত। খেয়ার নৌকাই ছিল গঙ্গা পার হইবার একমাত্র সহায়। গঙ্গাতীরে নির্দ্দিষ্ট খেয়াঘাট না থাকায় লোকেরা যেখান-সেখান হইতে নৌকায় উঠিত এবং এ-কারণে তাহাদের জিনিষপত্রও চুরি-ডাকাতি হইত। গঙ্গাবক্ষে নৌকাডুবি হইয়া লোকে প্রায়ই ধনে-প্রাণে নাশ পাইত। রুস্তমজী তৃতীয় কমিটির সমক্ষে তৎকালীন খেয়াঘাট ও নৌকার দুরবস্থা ও দুর্ব্যবস্থা বর্ণনা করিয়া যে প্রতীকারোপায় নির্দ্ধারণ করেন তাহা প্রণিধানযোগ্য,—

খেয়া নৌকায় নম্বর থাকিবে এবং ইহা রেজিষ্ট্রী করিতে হইবে। নৌকার প্রকাশ্য স্থানে মালিক ও যাত্রীসংখ্যা স্পষ্টাক্ষরে লেখা থাকিবে। যাহারা ইহার অন্যথা করিবে তাহাদের নিকট হইতে মোটা জরিমানা আদায় করিতে হইবে। নৌকার শ্রেণীবিভাগ করিয়া ভাড়া ঠিক করিয়া দেওয়া দরকার। প্রতি মাসে নৌকা ও নৌকা-মাঝির যোগ্যতা পরীক্ষা করিতে হইবে। ৩৩

রুস্তমজী কাওয়াসজী কলিকাতার উন্নতিকল্পে ফিভার হাসপাতাল ও মিউনিসিপ্যাল এন্‌কোয়ারি কমিটির সভ্য হিসাবে যে কার্য্য করিয়াছিলেন তাহার সামান্য মাত্র আভাস দিতে এখানে প্রয়াস পাইলাম। কমিটির রিপোর্ট তিন বার প্রকাশিত হয়। ৩৪ কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী অবিলম্বে কার্য্য না হইলেও এই সময় হইতেই বর্ত্তমান কলিকাতার উন্নতির পত্তন হয়। স্যর হেনরি ইভান এ, কটন বলেন,—"It marks the beginning of the modern Municipal Government." ৩৫

কমিটির সভাপতি সুপ্রিমকোর্টের অন্যতম বিচারপতি স্যর জন পিটর গ্রাণ্ট চাকরি ছাড়িয়া বিলাত যাইবার প্রাক্কালে কলিকাতাবাসীরা তাঁহাকে যে অভিনন্দন দিয়াছিলেন তাহার এই অংশ রুস্তমজী কাওয়াসজীর সম্বন্ধেও হুবহু প্রযোজ্য।

We hope to realize permanent results in a sensible improvement of the health and comfort of the inhabitants of Calcutta from the establishment of sanitary regulations and of a Fever Hospital, in the accomplishment of which important objects of the city will ever associate your name, with a grateful recollection of the lively interest evinced by you, and the valuable aid afforded in devising a comprehensive scheme of Municipal Administration of our Metropolis. ৩৬

সংবাদ-পত্রে রুস্তমজী কাওয়াসজীর পরলোকগমনের কথা

১৮৪৮ সনে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ফেল পড়ায় রুস্তমজী কাওয়াসজীর দেহ-মন একেবারে ভাঙিয়া পড়ে। ১৮৫২ সনের ১৬ই এপ্রিল শুক্রবার রজনীতে তিনি ইহলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার দেহত্যাগ হইলে কলিকাতার ইংরেজী বাংলা সংবাদ পত্র তাঁহার নানা কীর্ত্তি-কলাপের উল্লেখ করিয়া শোকপ্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ ইংরেজী দৈনিক ইংলিশম্যান (১৯এ এপ্রিল) লেখেন,—

Rustomjee has resided about years in Calcutta and for a great art of that time carried on a very extensive business as a merchant and a ship-owner, and for his activity and enterprize was well-known to men of business all over the East. During his prosperity he sought the European society and breaking through the restraints usual among his countrymen, did not hesitate to introduce the ladies of his family to his guests, among whom the Governor General has more than once been present. When what is called a commercial crisis visited Calcutta, Rustomjee shared in the misfortune of his neighbours, and lost nearly all that he had been working for during a long and laborious life. He has

৩৩ *The Fever Hospital & Municipal Enquiry Committee Report*, Appendix K. Pp. 77-78.

৩৪ *Ibid.* 1st Report 7th January 1840; 2nd Report, 7th August, 1846; 3rd Report, 30th October 1847.

৩৫ *Calcutta Old and New.* 1907 P. 171.

৩৬ *The Friend of India*, March 16, 1848.

since that time lived in a very retired manner, and as his health also declined, he utterly withdrew in a great measure from business. The cause of his death is stated to have been disease of heart, which at his advanced age could not be expected to have other than a fatal termination. Rustomjee was extremely liberal while he had the means, and there must be many yet living who have felt his kindness when it was of the utmost value to them. ৩৭

সে-সময়ের আর একখানা দৈনিক 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় (১১ই বৈশাখ, ১২৫৯) রুস্তমজীর মৃত্যুসংবাদে ব্যথিত হইয়া লিখিয়াছেন,—

আমরা দুঃখিতান্তঃকরণে প্রকাশ করিতেছি এতন্নগরীর বিখ্যাত ধনি বণিক্‌বাবু রোস্তমজী কৌয়াসজী গত শুক্রবার রজনীতে লোকান্তর গমন করিয়াছেন; রোস্তমজীবাবু ৩০ বৎসরকাল পর্য্যন্ত এতন্নগরে বর্ত্তমান থাকিয়া বাণিজ্য কার্য্য দ্বারা বিপুল বিত্ত সঞ্চয় করিয়া উদারস্বভাবে দান ও পুণ্যভাজন কর্ম্মে ব্যয় করিয়া সুখ্যাত হইয়াছেন। কলিকাতার বাণিজ্য-বাজারে অগ্নি লাগাতে রোস্তমজী কৌয়াসজী অন্যান্য বণিক্‌দিগের ন্যায় মন্দাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মনঃপীড়া প্রাপ্ত হয়েন, তদবধি বিবেকীর ন্যায় শান্তভাবে কালক্ষেপণ করিতেছিলেন, ফলে মনঃপীড়োপলক্ষেই তাঁহাকে ইহলোক ত্যাগ করিতে হইল।

পরিশিষ্ট

"রুস্তমজী কাওয়াসজী" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রথমাংশ ছাপা হইবার পর রুস্তমজী কাওয়াসজীর সম্বন্ধে অন্য কতকগুলি নূতন তথ্য আমার হস্তগত হইয়াছে। এখানে তাহা সন্নিবিষ্ট করিলাম।

১। ১৮২৮ সনের ৩রা এপ্রিল তারিখের 'গবর্ণমেণ্ট গেজেটে' কলিকাতাস্থ সুপ্রিমকোর্টে দেশী-বিদেশী যে-সকল ব্যক্তি জুরি হইবার যোগ্য তাঁহাদের তালিকা বাহির হয়। এই তালিকায় রুস্তমজী কাওয়াসজীর উল্লেখ আছে। ইহা হইতে রুস্তমজীর এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়,—

জুররের নাম	রুস্তমজী কাওয়াসজী
পেশা	ব্যবসায়ী
বাসস্থান	পোলক ষ্ট্রীট
জন্মভূমি	ইষ্ট ইণ্ডিস্ (ভারতবর্ষ)
ধর্ম্ম	পার্শী

রুস্তমজী কাওয়াসজী দুই লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তির মালিক। যাঁহারা পঞ্চাশ টাকা বাড়ি-ভাড়া দিয়া সাধারণ জুরের শ্রেণীভুক্ত, রুস্তমজী সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

২। কটকে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে দুঃস্থদের সাহায্যার্থ কলিকাতায় চাঁদা তোলা হয়। 'গবর্ণমেণ্ট গেজেটে' (২৪এ নবেম্বর, ১৮৩১) প্রকাশ,—কলিকাতায় তখন বেশ চাঁদা আদায় হইতেছিল। রুস্তমজী কাওয়াসজী দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারে একশত টাকা দান করেন।

৩। ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মত বিদেশীয়েরাও যাহাতে এদেশে স্থাবর সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারে সেই জন্য বিলাতের মহাসভায় আবেদন করিবার জন্য ১৮৩২ সনের ২৪এ মার্চ্চ কলিকাতা টাউনহলে এক সভা হয়। সভার উদ্যোক্তাদের মধ্যে রুস্তমজী কাওয়াসজীও ছিলেন। ৩৮

৪। দেওয়ানী মোকদ্দমায় বাদী-প্রতিবাদীর প্রার্থনানুসারে জুরি দ্বারা বিচারের জন্য পার্লামেণ্টে আবেদন করিবার যুক্তিযুক্ততা বিবেচনা করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতার দেশী-বিদেশী বিশিষ্ট লোকেরা সেরিফ মহোদয়কে অনুরোধ জানান যে, তিনি যেন অবিলম্বে এক সভা আহ্বান করেন। ৩৯ সেরিফ মহোদয়ের আহ্বানে ১৮৩২ সনের ১৪ই এপ্রিল বেলা ১১টার সময় কলিকাতার টাউনহলে সভার অধিবেশন হয়। রুস্তমজী কাওয়াসজী সভা আহ্বানকারীদের মধ্যে একজন এবং এ-বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন।

৫। ১৮৩৫ সনের ৩০এ জানুয়ারি বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ককে অভিনন্দন দিবার উদ্দেশ্যে ককরেল সাহেবের সভাপতিত্বে 'এক্‌স্‌চেঞ্জ' গৃহে অনুষ্ঠিত এক সভার অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়,—

৩৭ *The National Magazine* for May, 1908. Pp. 174-175. রুস্তমজী কাওয়াসজী' প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

৩৮ *The India Gazette*, March... 1832.

৩৯ *The Bengal Hurkaru* April 9, 1832

বড়লাট উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ককে অভিনন্দন প্রদান করিতে এই ভদ্রমহোদয়গণকে অনুরোধ করা যাইতেছে—মেসার্স ককরেল, হার্ডিং, কোকেন, রুস্তমজী কাওয়াসজী, যাস্‌হিল্‌স, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও ভিণ্ট। ৪০

উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ককে টাকার তোড়া প্রদানেরও ব্যবস্থা হইয়াছিল। ঐ সনের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তারিখের এক সভায় ইহাতে চাঁদা-দাতৃগণের প্রতিনিধি লইয়া এক কমিটি গঠিত হয়। ভারতীয়দের পক্ষ হইতে রামকমল সেন ও রুস্তমজী কাওয়াসজী এই কমিটিতে ছিলেন। ৪১

৬। ১৮৩৪ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতায় একটি বাণিজ্য-সংসদ (Chamber of Commrce) স্থাপনার্থ ব্যবসায়িগণের এক সভার অধিবেশন হয়। ৪২ ১৬ই এপ্রিল এই উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত আর এক সভায় নিয়মাবলী গঠিত হয়। বাণিজ্য-সংসদের পরিচালক-সমিতি প্রধানতঃ যে তিনটি কমিটিতে বিভক্ত হইয়াছিল তাহার দুইটির নাম পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। "General Committee of Twenty one" নামক কমিটিতে দেশী ব্যবসায়ীদের পক্ষ হইতে দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রুস্তমজী কাওয়াসজী প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। ৪৩

৭। ১৮৩৪ সনের ১৪ই জুলাই অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের স্বত্বাধিকারীদের সভায় রুস্তমজী কাওয়াসজী ইহার ডিরেক্টর নির্ব্বাচিত হন। ৪৪

৮। বাষ্পীয় পোত গমনাগমনে ভাগীরথীর অবস্থা অনুকূল করিবার জন্য ১৮৩৪ সনের ২১এ আগষ্ট ককরেল সাহেবের নেতৃত্বে 'এক্‌স্‌চেঞ্জ' গৃহে অনুষ্ঠিত কলিকাতার জাহাজের মালিকদের এক সভায় স্থিরীকৃত হয় যে, এই ব্যাপার সম্পর্কে সরকারের হুজুরে এক স্মারক-লিপি পেশ করা হইবে। স্মারক-লিপি প্রস্তুতের ভার যে কমিটির উপর অর্পিত হয় তাহাতে দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রুস্তমজী কাওয়াসজী প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। ৪৫

৯। 'সেরবোর্ন' নামক একখানা জাহাজ সমুদ্র-গমনের অযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় যে-সব কোম্পানীতে বীমা করা হইয়াছিল তাঁহাদের ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিবার জন্য রুস্তমজী কাওয়াসজীর আহ্বানে তাঁহারই আপিসে বীমা কোম্পানীগুলির এক সভা হয়। সভায় এই মর্ম্মে প্রস্তাব ধার্য্য হয়,—

"সেরবোর্ন ১৮৩৫ সনের জুলাই মাসে রওনা হইবার সময় সমুদ্র-যাত্রার অযোগ্য ছিল। এই হেতু কলিকাতাস্থ বীমা-কোম্পানীরা জাহাজের বীমার দাবি গ্রাহ্য করিবেন না; তবে আবশ্যক হইলে বীমাকারীদের টাকা ফিরাইয়া দেওয়া হইবে।" ৪৬

১০। বীমা আপিসগুলির কমিটি উইলিয়ম কার এবং রুস্তমজী কাওয়াসজীকে টাকা গ্রহণ করিয়া বণ্টন করিতে আহ্বান করেন। কিন্তু তাঁহারা বিল অফ লেডিং পৌছিবার পূর্ব্বেই ২৫এ সেপ্টেম্বর তারিখে জলগর্ভ হইতে উত্তোলিত জিনিষপত্রের টাকা (salvage) বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন।...৪৭

১১। রুস্তমজী কাওয়াসজী ১৮৩৬ সনে বাণিজ্য-সংসদের (Chamber of Commerce) নিয়মানুসারে কমিটি হইতে অপসৃত হন। ৪৮

১২। ১৮৩৭ সনের ১৬ই জানুয়ারি এক সভায় ডকিং কোম্পানী স্থাপন স্থির হয়। ৪৯ ডকিং কোম্পানীর প্রথম অর্দ্ধবার্ষিক সভা সম্বন্ধে এইরূপ সংবাদ বাহির হইয়াছিল,—

"ডকিং কোম্পানী—২৫এ তারিখ [এপ্রিল] ডকিং কোম্পানীর প্রথম অর্দ্ধবার্ষিক সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কোম্পানীর কার্য্য খুবই সন্তোষজনক। ৫০

৪০ *The Calcutta Monthly Journal*, 1835. Asiatic News.

৪১ *Ibid*. P. 80.

৪২ *The Calcutta Monthly Iournal*, 1834 (January—April). P. 563.

৪৩ *The Calcutta Courier*, April 16, 1834.

৪৪ *The Calcutta Monthly Journal*, 1834 (September—December). P. 788.

৪৫ *Ibid*.

৪৬ *The Calcutta Monthly Journal*, 1835. Asiatic News. P. 327.

৪৭ *Ibid*. P. 193.

৪৮ *The Calcutta Monthly Journal*, 1836. Asiatic News. P. 199: "Rustomjee Cowasjee went out by rotation."

৪৯ *Ibid*, 1837.

৫০ *Ibid*. 1837. P. 529.

১৩। ভারতবর্ষের পশ্চিম খণ্ডে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে লর্ড বিশপের সভাপতিত্বে কলিকাতা টাউনহলে ১৮৩৮ সনের ২৮এ ফেব্রুয়ারি এক জনসভার অধিবেশন হয়। সভায় চাঁদা সংগ্রহ ও বণ্টনের জন্য কমিটি গঠিত হয়। সভাক্ষেত্রেই পনর হাজার টাকা আদায় হইয়াছিল। রুস্তমজী কাওয়াসজী চাঁদা সংগ্রহ ব্যাপারে বিশেষ তৎপর ছিলেন। তিনি স্বয়ং যে-সকল চাঁদা আদায় করিয়াছিলেন তাহার তালিকা স্যার এড্‌ওয়ার্ড রায়ানের (সুপ্রিম কোর্টের বিচাপতি) মারফত সভায় পেশ করেন। ঐ তালিকায় গাইকোয়াড়ের বেন্থুরামের নামে দু'হাজার, রুস্তমজীর এবং তাঁহার পুত্রের নামে যথাক্রমে এক হাজার ও পাঁচ শত টাকা চাঁদা-দানের উল্লেখ আছে। ৫১

১৪। ১৮৪০ সনে 'নিউ লডেব্‌ল্ সোসাইটির' সাত জন ডিরেক্টরের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রুস্তমজী কাওয়াসজীর উল্লেখ আছে। ৫২

১৮৪১ সনে ভারতীয় লডেব্‌ল্ ও মিউচুয়াল বীমা কোম্পানীরও একজন ডিরেক্টররূপে রুস্তমজীকে দেখিতে পাই। ৫৩

১৫। রুস্তমজী কাওয়াসজী কলিকাতাবাসীর জলকষ্ট নিবারণের জন্য পুষ্করিণী খনন ছাড়া অন্য উপায়ও যে অবলম্বন করিয়াছিলেন, সমকালিক সংবাদপত্রে তাহার উল্লেখ আছে। সম্বাদ ভাস্কর (২রা জ্যৈষ্ঠ, ১২৫১) অন্য এক ব্যাপারের আলোচনা-প্রসঙ্গে ইহার এই স্পষ্ট উল্লেখ করেন,—

"...বাহির রাস্তার পূর্ব্ব পার্শ্ব দিয়া রোস্তমজী বাবু যাহা করিতেছেন কলিকাতা রাজধানী বর্ত্তমান থাকিতে তাহা নির্ব্বাণ হইবেক না, এই কর্ম্মের জন্য...ব্যয় ভয়ে কেহ অগ্রসর হয়েন নাই কিন্তু রোস্তমজী বাবু উপরুদ্ধ না হইয়াও সাধারণের উপকারের জন্য এই বৃহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন, বাবু রোস্তমজী বহুকাল পর্য্যন্ত দেখিতেছেন বাহির রাস্তার নিকটস্থ লোকেরা জলাভাবে দুঃখ পায় অতএব তিনি বৈঠকখানা হইতে ঐ রাস্তার পূর্ব্ব পার্শ্ব দিয়া জল প্রণালী আনিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এই প্রণালীর জলে কত লোকের উপকার হইবে তাহার সংখ্যা নাই অতএব রোস্তমজী বাবু তাঁহার স্মরণীয় এক এক মহৎ চিহ্ন রাখিলেন ইহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরা উপকৃত হইয়া পুরুষানুক্রমে এঁ বাবুর ধন্য ধন্য কহিবেন,..."

৫১ *The Friend of India*, March 8, 1838. Weekly Epetome of News. Thursday, March 1.

৫২ *The Bengal Directory and Annual Register* 1840.

৫৩ *Ibid*, 1841.

দামোদরের বিপত্তি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চারুবাবুর অভ্যর্থনা

শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে মির্জাপুর ষ্ট্রীটের মেসে যাইতে দামোদরের মিনিট ৮।১০ লাগিল। মেসের বাড়িখানি বড়; প্রায় ১৫ খানা বড় বড় ঘর আছে। বেশীর ভাগই কলেজের ছেলেরা থাকে। বঙ্গবাসী, রিপণ, বিদ্যাসাগর, সিটি সব কলেজেরই ছেলে থাকে। চারুবাবুই ইহার পত্তন করেন। চারুবাবু আগে কোন কলেজের কেরাণী ছিলেন; এখন অন্য কলেজে আছেন। কাজেই ছেলেদের সঙ্গে তাঁহার বেশ বনিবনা আছে। লোকও তিনি খুব আমুদে। একটা না একটা স্ফূর্ত্তির কাণ্ড লইয়াই থাকেন। তাঁহাকে না হইলে মেসের ছেলেদের চলে না।

দামোদর মেস্-বাড়ির সাম্‌নে দাঁড়াইয়া একবার দেখিয়া লইল, হাঁ, ঠিকই সেই বাড়ি। তার পর ভিতরে প্রবেশ করিয়া সিঁড়িতে উঠিল। নীচের তলায় চাকরবাকর থাকিত; রন্ধন হইত। উপরে দ্বিতলে ও ত্রিতলেই সমস্ত শয়ন-ঘর। দামোদর সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছে, এমন সময় দু'তিনটি ছেলে দুপ্ দুপ্ করিয়া নামিল। তাহাকে দেখিয়া একটু থামিল। তার' পর তাহাদের একজন জিজ্ঞাসা করিল, "কা'কে চান?"

দামোদর দেখিল ছেলে তিনটির বয়স ১৭ হইতে ২০এর কোটাতেই। একটির বেশ কায়দা-দুরস্ত ১৭।২০ করিয়া চুলছাঁটা; টেরিও খুব কায়দা-দুরস্ত; যে রকম ধরণের টেরি দামোদর নিজেদের সময় দেখিয়াছে ও জানিত, সে রকম নয়। তাহার উপর অতি ছোট গোঁফের দুইটা দিক্ ছাঁটিয়া মাঝখানে একটুখানি চিহ্ন স্বরূপ যেন রাখিয়াছে। একজনের—সেই সবচেয়ে ছোট—খানিকটা ঝুল্‌পি! দামোদর তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দিল, "চারুবাবু,—তিনি আছেন কি?"

ঝুল্‌পিওয়ালা ছেলেটি দামোদরকে আপদমস্তক দেখিয়া উত্তর দিল, "না। চারুবাবু সন্ধ্যার সময় আসেন। এখন তিনি কলেজে। আপনার কি দরকার জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারি কি?"

দামোদর বলিল, "দরকার একটু ছিল। আমি—" সে চুপ করিল।

গোঁফ-ছাঁটা ছেলেটি বলিল, "আপনি কি, বলে ফেলুন। মাঝপথে ব্রেক কস্‌লেন কেন? ওতে lungs খারাপ হয়। জখম হয়ে যায়।"

দামোদর বলিল, "আমি আগে এখানেই থাক্‌তুম। আজ কল্‌কাতা এসেছি। যদি এখানে থাকার আপত্তি না থাকে, তবে থাক্‌বো দু' এক দিন। চারুবাবু আমাকে চেনেন।"

ঝুল্‌পি-ওয়ালা ছেলেটি কহিল, "এই কথা! স্বচ্ছন্দে থাক্‌তে পারেন। আপনার বাড়ি কোথায়? বর্দ্ধমান, হুগ্‌লী, বাঁকুড়া? না নদে, শান্তিপুর? না, পদ্মাপার?"

গোঁফ-ছাঁটা ছেলেটি বলিল, "আপনি আমাদের roomএ যান্ এখন। বসুন গে। সেখানে ৪টা seat আছে, আমরা তিনজনে থাকি। চাকরকে জিজ্ঞাসা করে নিবেন তেতলায় নগেনবাবুদের ঘর। সেইখানেই বসুন। স্নানাদি কর্ত্তে চান করে নিন্। জল্‌টল্ খেয়ে কিছু নিতে চান, নেবেন। সন্ধ্যের আগেই চারুবাবু ফির্‌বেন। তখন যা' হয় বন্দোবস্ত হবে। কিন্তু, সাবধান, মশায় কিছু নিয়ে যেন সরে পড়বেন না। আমি দরওয়ান্‌কে বলে যাচ্ছি। আমরা না আসা পর্য্যন্ত আপনাকে যেতে না দেয়।"

দামোদর অত্যন্ত ব্যথিতের ন্যায় বলিয়া উঠিল, "সে

কি কথা ? আমি বাইরেই অপেক্ষা কোর্‌বো। ঘরে বস্‌বার দরকার নেই।"

যাহার ঝুল্‌পি ছাঁটা, গোঁফ কিছুই ছিল না, সে বয়সে সব চেয়ে বড়, সে বলিল, "নগেন, তুই বড় অভদ্র।" তার পর দামোদরের দিকে চাহিয়া বলিল, "কিছু মনে কর্বেন না। ও বড় কট্‌কটে। লোক ভাল; তবে সোজা ও কট্‌কটে কথা বলে ও ভাবে ও ভারী একটা কিছু কর্‌ছে। দু' দিন থাক্‌লেই বুঝ্‌তে পার্বেন। আপনি যান্‌। ঘরেই বসুন বা শুয়েও থাক্‌তে পারেন। যেমন ইচ্ছা হবে আপনি সেই রকম কর্বেন।"

দামোদর বলিল, "আপনাদের ধন্যবাদ। কিন্তু সত্যিই ত আপনারা আমাকে চেনেন না। কিছু মনে করা অন্যায় নহে। আমি বাইরে বারান্দায় বসে থাক্‌বো। কোন কষ্ট হবে না।" সে উপরে উঠিতে সুরু করিল। ছেলে তিনটি তাহার দিকে একবার পিছন ফিরিয়া তাকাইল; তা'রপর আবার দুপ্‌ দুপ্‌ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

উপরে দ্বিতলে উঠিয়া দামোদর ভিতরের বারান্দায় পড়িল। চারিদিকে বারান্দা, তাহার কোলে সব ঘর। কতকগুলি ঘর খোলা, কতক বন্ধ। খোলা ঘরগুলি হইতে হাসির কথার আওয়াজ তাহার কাণে আসিল। সেও এই দ্বিতলে থাকিত, তাহার ঘরে এখন অন্য ছেলে আছে। সে সেই ঘরের পাশ দিয়া একবার গেল, ভিতরে উঁকি মারিয়া দেখিল, তিন-চার জন ছেলে বসিয়া কি লইয়া মহাতর্ক জুড়িয়া দিয়াছে। সে পার হইয়া গিয়া চারুবাবুর ঘরের সাম্‌নে দাঁড়াইল। পুরাতন, তাহার আমলের, নিধি-উড়িয়া ভৃত্য আসিয়া তাহাকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "বাবু, আপনি ?"

দামোদর এত অপরিচিতের মধ্যে একটি চেনা মুখ দেখিয়া আশ্বস্ত হইল। উত্তর দিল, 'হাঁ, নিধি। ভাল ত ? চারুবাবু কোথায় ?"

নিধি এক গাল হাসিয়া বলিল, "আপনাদের কৃপায় ভাল আছি, বাবু। চারুবাবু সন্ধ্যেবেলায় আস্‌বেন। আপনি বস্‌বেন ?"

দামোদর এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল, "হাঁ, নিধি। আমি দু'চার দিন এখানে থাক্‌তে চাই। তাই চারুবাবুকে খুঁজ্‌ছিলুম।"

নিধি বলিল, "তা'র আর কি ? আপনি বসুন এই খানে, আমি চেয়ার এনে দিই।"

দামোদর সম্মত হইল। নিধি চেয়ার আনিয়া দিলে সে বারান্দায় বসিল, বলিল, "নিধি, একটু জল খাওয়াতে পার ?"

নিধি জল আনিয়া দিল। দামোদর এক গ্লাস পুরা জল পান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, নিধি, এখন সব বাবুরা কেমন ?"

নিধি গ্লাস গ্রহণ করিয়া জবাব দিল, "বাবুরা এখন বেশ ভালই। খুব খর্চে। দু' হাতে সব খরচ করেন। ঘটা লেগেই আছে।"

"খুব খরচ ক'রে ? লোক কেমন ?"

নিধি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "খুব উঁচু মেজাজের লোক, বাবুরা। আপনপর জ্ঞান নেই। খুব আমুদে।"

দামোদরের মনে নগেনবাবুদের কথা জাগিল। জিজ্ঞাসা করিল "নগেনবাবুরা কেমন লোক ?"

নিধি উত্তর দিল, "খুব খর্চে হাত। বেশ লোক, বাবু, সবাই। দু'দিন থাক্‌লেই বুঝ্‌তে পারবেন। সবাই বড় লোকের ছেলেই ত মনে হয়। তা' না হলে খরচ ক'র্ত্তে অত টাকা কোথায় পান। এক এক জনের মাসে অন্ততঃ ১০০৲ টাকা খরচ।"

দামোদর চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "১০০৲ টাকা! একজনের ? বল কি নিধি ?"

নিধি জবাব দিল, "তা' হয় বৈকি, বাবু। এখন মেস্ খরচই প্রায় ৩০৲ টাকা। কলেজের মাহিনা আছে। তা' ছাড়া থিয়েটার, বায়স্কোপ, ফুটবল, ক্রিকেট্‌, হকি; সোডা লিমনেড বরফ; রোজই প্রায় ফিস্‌টি। খরচ কি কম, বাবু ? বড় লোকের ছেলে না হলে কি এত পারে ? আপনারা কি পার্ত্তেন ?"

দামোদর বিষণ্ণ বদনে বলিল, "না, নিধি। আমাদের ৩০।৪০ টাকার ভিতরই সব সাম্‌তে হোত। ৩০৲ টাকাই পেতুম; অনেক বলে কহে হাঙ্গামা আব্দার করে ৪০৲ কখনো কখনো পেয়েছি। তাই থেকে কলেজের মাহিনাও দিতে হোত, খাতাপত্র সব যা' দরকার হো'ত তাই থেকেই কিনতুম।"

নিধি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল তাহার অবিদিত কিছু

নাই। তা'র পর বলিল, বাবু আপনি বসুন। আমি নীচে যাই; ঠাকুরকে তুলে দিই গে। চা, খাবার সব তৈরি করার সময় হো'ল। ৪টা বেজে গেছে।"

দামোদর বলিল, "হাঁ, নিধি, তুমি যাও। আমি অপেক্ষা কোর্‌ছি।"

"চা-টা খাবেন ত ?"

দামোদর জানাইল সে খাইবে। নিধি চলিয়া গেল। এই মোটে ৪টা: ৫।০টার এদিকে ত' চারুবাবু আসিবেন না। ততক্ষণ সে কি করিবে? বসিয়া থাকা ছাড়া উপায় কি ? সারাদিনে পরিশ্রম হইয়াছে, তাহা না হইলে বেড়াইয়া আসিত। বসিয়া বসিয়া তাহার মন নিজের দেশের দিকে ছুটিল। এতক্ষণ নানা লোকের সঙ্গে, নানা কথাবার্ত্তায় তাহার নিজের কথা মনেই হয় নাই। এখন তাহার সব কথা একে একে মনে উঠিতে লাগিল। রাধারাণী এতক্ষণ কি করিতেছে ? কি ভাবিতেছে ? নিতাই ঘোষ নিশ্চয়ই তাহাকে চারি দিকে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে। নিতাই ঘোষ ছাড়িবার পাত্র নহে। ভয়ানক লোক। কে জানে ডাকাতি করে কি না। ডাকাতের মত ত' চেহারা! পয়সা আছে; চাষ করিয়া কি অত পয়সা হয় ? নিশ্চয়ই ডাকাতি করে। রাধারাণী ডাকাতের মেয়ে। তাই উহার এত সাহস। কিন্তু রাধারাণী তাহার কাছে সুন্দর হইলেও, রাধারাণীর হৃদয়ে প্রেম নাই। ডাকাতের মেয়ে, তা'র আবার প্রেম কি ? ওঃ! কি বাঁচিয়াই গিয়াছে সে। বাঁচিয়া থাকিতে আর কখনোও ঐ মুখো হইবে না। কখনো না।

বসিয়া বসিয়া সে বিরক্ত হইয়া গেল। উঠিয়া পদচারণা করিতে লাগিল। দলে দলে, দু'চার জন করিয়া নানা রকমের ছেলে আসে, যায়, গান করে, তাহার দিকে প্রশ্নপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া দেখে; কিন্তু কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করে না। সে দ্বিতল বেড়াইয়া ত্রিতলে উঠিল। সেখানেও বারান্দায় একখানি বড় টেবল্‌ রাখা। তাহার চারিপাশে চেয়ার লইয়া প্রায় ১৫।১৬ জন ছেলে বসিয়াছে। চা-এর জন্য অপেক্ষা করিতেছে। দামোদরের মনে পড়িল, তাদের সময়ে চা'-এর বন্দোবস্ত এমন সমারোহ ও অসাধারণ ব্যাপার ছিল না। নিজে নিজে ঘরে চা' করিত, ষ্টোভ আনিয়া। নিজেরাই খাইত। এ যেন যজ্ঞের ব্যাপার; ভোজ। সে উপরে উঠিয়াই আবার নীচে নামিতে যাইতেছে, টেব্‌লের পাশ হইতে একজন জিজ্ঞাসা করিল, "পালান কেন, মশা'র ? কাকে চান ?"

দামোদর অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "চারুবাবুর সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এসেছি। তিনি নেই। তাই উপরে একবার বেড়িয়ে যাচ্ছি। আমিও এই মেসে তিন-চার বছর ছিলুম কি না।"

সে ছেলেটি উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "বটে ? তবে আসুন, সোজা হেঁটে পায়ে পায়ে চলে আসুন, বসুন এইখানে। বসে পড়ুন। এটা হচ্ছে চারুবাবুর চা-এর মজ্‌লিস্‌। চারুবাবু সোজা এইখানেই আস্‌বেন।"

দামোদর বলিল, "না, না; আপনারা চা' খান। আমি নীচেই গিয়ে বস্‌ছি। নীচেই দেখা কোর্‌ব।"

আর একটি ছেলে বলিয়া উঠিল, "সে কি একটা কথা ? কি যে বলেন ? এসে সোজা বসে পড়ুন। আপনি ত' আর জেনানা ন'ন, লজ্জা কি ? আর এখন জেনানাও নেই। সব স্বাধীন। বুঝেছেন ? লজ্জা আর দেশে নেই, আপনার লজ্জা অসভ্যতা।"

দামোদর হাসিয়া বসিল। বলিল, "আপনাদের অনুগ্রহ।"

আর একজন বলিল, "অনুগ্রহ কি মশাই ? আপনি এসেছেন, এখানকার এই মেসেরই ex-member,—আপনার ত right (অধিকার) আছে। আমাদের চেয়ে বেশী অধিকার। আমাদের তুলনায় আপনি প্রাচীন।"

দামোদর ইহার আর কি উত্তর দিবে ? সে চুপ করিয়া বসিল। ছেলেগুলির কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিল।

একজন বলিল, "যাই বল, শরৎবাবুর কাছে আর কেউ নয়। ও বঙ্কিমবাবু বল, আর যেই বল, সব ডুবেছে। কি লেখা, উঃ! পড়ে আর শেষ কর্ত্তে ইচ্ছে হয় না। কি সব character (চরিত্র)! ভাব দেখি! শ্রীকান্ত'র সঙ্গে, কি চরিত্রহীনের সঙ্গে তুলনা হয় এমন একখানা বই বা'র কর দেখি!"

আর একজন উত্তর দিল, "তুই থাম, নলিন। ও সব ঢের শুনেছি; কাণ পচে গেল। কি গল্প! আর কি বা গল্পের technique! পড়্‌তে পড়্‌তে মাথা ধরে যায়!

একই কথা—আর একই ভাব ফেনিয়ে তোলা। রবিবাবু ত গল্প লিখিয়ে ন'ন। কিন্তু দেখ্‌দেখি এক-একটা গল্প—ছোটই বল, বড়ই বল,—যা' লিখেছেন, একেবারে নূতন ও আলাদা। কোন দুটা গল্পের ভাব বা চরিত্র একরকম নয়। এঁকেই বলে genius প্রতিভা।"

তৃতীয় একটি ছেলে বলিল, "ঠিক কথাই মোহিনী বলেছে। বঙ্কিমবাবুরও কোন গল্প অন্য গল্পের সঙ্গে মিলে না। প্রত্যেকখানি বিশিষ্ট ও বিভিন্ন, অথচ সবগুলিই সমান ভাবে interesting, কিন্তু শরৎবাবুর কথা যদি বল, তবে দেখ্‌বে সব বই'তে একই কথা, একই ঘটনা, একই ভাব।"

চতুর্থ একটি ছেলে বলিল, "তো'রা চুপ কর, বাবু। তো'দের সাহিত্য-চর্চ্চার ঠেলায় দেশান্তরী করবি না কি? ভারি তোদের বাঙ্‌লা সাহিত্য! নাম কর্ত্তে রবিবাবু আর বঙ্কিমবাবু আর শরৎবাবু শিখেছিস্—তা' নিয়ে কাণ ঝালপালা করে দিলি!"

নলিন নামক ছেলেটি বলিয়া উঠিল, "তোমার আর এ সাহিত্য পছন্দ হয় না, নরেন-দা! তুমি ত পড় না। কাজেই এসব তোমার কাছে নিরর্থক ঠেকে। পড়্‌তে যদি একবার শরৎবাবুর নভেল, শ্রীকান্তখানা, তবে বুঝ্‌তে যে বাঙ্‌লা ভাষাতেও এমন নভেল আছে যা' পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যের নভেলের সঙ্গে চেষ্টা দিতে পারে। এই ধর না ইন্দ্রনাথের চরিত্র—"

নরেনদা' বলিল, "তুই বাবু, মাথা খরালি, নলিন। তো'র শরৎবাবু নিয়ে আমাদের পাগলা কোর্‌বি দেখ্‌ছি! এইজন্যে শরৎবাবুও গেল।"

আর একটি ছেলে ডাকিল, "নিধি, ওরে নিধি, তোকে গড়েছিল কোন বিধি; চা' দিবি না?"

নলিন ছেলেটি হঠিবার পাত্র নহে। সে বলিল, "নরেনদা, তুমি গণিত পড়ে মাথা নষ্ট করেছ। নভেলের স্বাদ কি বুঝ্‌বে?"

মোহিনী উত্তর দিল, "তুই-ই বুঝেছিস্, নলিন। আর কেউ বুঝ্‌তে পারে না। তুই আছিস্ জান্‌লে শরৎবাবু নিশ্চয়ই বই লিখ্‌তো না।"

নলিন বলিল, "শরৎবাবুর সম্বন্ধে কত appreciation বেরিয়েছে খোঁজ রাখ! এই ত সেদিন রাধাকমল মুখুয্যে কি রকম লিখেছিল।"

মোহিনী বলিল, "রাখ্ তো'র রাধাকমল মুখুয্যে, ওসব দেখা আছে। যে যেমন পণ্ডিত তা' বুঝ্‌তে আর বাকী নেই। সাহিত্য আর পলিটিকস্ এতে সবাই পেট থেকে পড়েই মাতব্বর। পড়্‌তে শিখ্‌তে হয় না।"

একটি ছেলে চুপ করিয়া দামোদরের মত শুনিতেছিল; সে গান ধরিল, "বুল্‌বুল্ তুই ফুলপাখাতে দিস্‌নে—দোল্—"

নরেন ধমক দিল; "খবর্দ্দার, যতীন; ঐ গান গাইবি ত' তোকে মেস থেকে তাড়িয়ে দেব।"

যতীন গান থামাইল, কিন্তু হাতের আঙ্গুল দিয়া টেব্‌লের উপর অগীত গানের তাল বাজাইতে বাজাইতে বলিল, "নরেনদা, তোমার এই centuryতে জন্মান উচিত হয় নি। তুমি অক্ষয় দত্তের চারুপাঠ তৃতীয় ভাগের ছদ্মবেশী সংস্করণ। তা' না হ'লে যে কবির গান বাঙ্‌লার তরুণদের এমন কি শিশুদের মুখে মুখে ফিরে, সেই গানের তুমি অপমান কর। কবি ত' নজ্‌রুল্ ইস্‌লাম! এক একটা কবিতা যেন বুলেট্।"

যে ছেলেটি নিধিরামকে ডাকিয়াছিল, সে ডাকিল, "নিধি, দয়ানিধি, তুই বসিয়ে রাখ্‌বি নিরবধি? শুকিয়ে উঠ্‌লো গলা অবধি!"

নিধি আসিয়া দেখা দিল। তাহার হাতে চা'এর সরঞ্জাম, বহুল ও লোভনীয়। টেব্‌লের উপর নিধি চা-এর পেয়ালা সসার প্রায় দু' ডজন, একটা বড় চা-এর চা-দান, ও নানাবিধ খাদ্য, কেক্, সন্দেশ, নিম্‌কি প্রভৃতি—স্তূপাকারে রাখিল। দেখিয়া শুনিয়া দামোদর বিস্মিত হইল। সত্যই ত'! ইহাদের সকলেই নিশ্চয়ই ধনীপুত্র। এরূপ সমারোহ সে দেখে নাই, কখনো। ইহাদের জীবনে আনন্দ আছে।

নরেন নামক ছেলেটি—ছেলেটি দেখিতে শুনিতে বেশ দামোদরের তাহাকে বড় ভাল লাগিয়াছিল—তাহাকে বলিল, "আপনি চা খান ত'?"

নলিন উত্তর দিল, "বাঃ! এইবার তুমি ঠকেছ নরেনদা, এ কথা এই century'তে কেউ কাহাকে জিজ্ঞাসা করে?"

নরেন বলিল, "তুই থাম্; তোর মত সবাই এক

ষ্ঠাঠা নয়। আমিও ষোল সতের বৎসর চা' খাই নি, তা' জানিস্? তোদের বদ্-সঙ্গে পড়ে এই বদ্ অভ্যাস হ'য়েছে।"

দামোদর জানাইল সে চা' খায়। তবে না হইলেও চলে। চা' পান সুরু হইল। আবার নানা কথার আতস-বাজী হইল। একটি ছেলে বলিল, "চা খাওয়া, নরেনদা, এই শতাব্দীর সভ্যতার ও সামাজিকতার দ্বার। যে বাড়িতে যাও, চা দিয়েই আলাপ সুরু হয়; দু'জনে একসঙ্গে বসে চা' খেতে পার্লে, চির-মিত্রতা স্থাপিত হয়। আর এই চা-এর দৌলতে বাঙ্‌লায় নভেলের প্রেমের পর্ব্ব টিকে আছে। এটাকে তাচ্ছীল্য করো না।"

দামোদর হাসিল। সকলেই হাসিল। হাততালি দিল। একজন বলিল, "উমেশ, তুই ডাব্‌লিউ, সি, বাঁড়ুয্যেকে হা'র মানিয়েছিস্। তো'কে আমরা এবার এখানকার সহকারী ম্যানেজার কোর্‌বো।"

উমেশ চটিয়া উঠিল, "কোর্‌বে না? ক'রে দেখো না, কি হয়। এখন ১০০৲ টাকায় চল্‌ছে, তখন ১৫০৲তে খৈ পাবে না।"

মোহিনী কহিল, "কুছ্ পরোয়া নেই। লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন। নরেনদা, আনী পাভ্‌লোভার নাচ দেখ্‌তে যাবে? চল না আজ রাত্রে যাই। আশ্চর্য্য নাচ। সবাই দেখ্‌তে যাচ্ছে।"

নরেনদা' বলিল, "না। আনী পাভ্‌লোভার নাচ দেখ্‌বার ক্ষমতা আমার নেই। যা'রা যাচ্ছে তা'রা যাক্।"

নলিন বলিল, "তোমার সৌন্দর্য্যবোধ নেই, নরেনদা। তুমি একেবারে prose—গদ্য, অক্ষয় দত্তের গদ্য। নাচ তোমার ভাল লাগে না?"

এমন সময় সিঁড়িতে জুতার আওয়াজ হইল; একটু পরেই চারুবাবু ত্রিতলের সিঁড়ির দরজা দিয়া দেখা দিলেন। টেব্‌লের ছেলেরা একসঙ্গে সোৎসাহে চীৎকার করিল, "ঐ চারুবাবু!"

চারুবাবু একটু বেঁটে ধরণের দোহারা লোক—মাথার ঠিক মাঝখানে একটু টাক্—মুখে যেন কৌতুক ও রহস্য-প্রিয়তা উচ্ছলিত হইতেছে। তিনি ত্রিতলের বারান্দায় দাঁড়িয়াই বলিলেন, "কিরে বাবু, তো'রা একটু আঁর অপেক্ষা কর্ত্তে পার্‌লি না আমার জন্যে! নরেন, ও নরেন, শীঘ্র চা' দে। হাতের কলম চালিয়ে যে গলা কি রকম শুকায় তা' তো'রা কেরাণীগিরি না কর্লে বুঝ্‌বি না।"

বলিতে বলিতে চারুবাবু টেবলের নিকটবর্ত্তী হইয়া একখানি খালি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। কহিলেন, "চা' দেরে, ওরে নরেন। দেরী কর্‌ছিস্ কেন? কা'র নাচ দেখ্‌ছিস্?"

নরেন বলিল, "চারুবাবু, চা তৈরি। ভগবান্ কেরাণীদের জন্যে কি চা সৃষ্টি করেছিলেন? না, বেকারদের জন্যে?" সে চা-এর পেয়ালা আগাইয়া দিল।

চারুবাবু চা'-এর পেয়ালা তুলিয়া টেব্‌লে উপবিষ্ট সকলের মুখ একবার দেখিয়া লইতে লাগিলেন। একদিক হইতে অন্যদিক সমস্ত; তার পর দামোদরকে দেখিতে পাইলেন।

চারুবাবু চা-এর পেয়ালা রাখিয়া উঠিলেন; তা'র পর চেয়ার ঠেলিয়া ফেলিলেন; উচ্চস্বরে বলিলেন, "কে? দামোদর না কি? আরে, ওরে! দামোদর না কি?" তিনি দামোদরের কাছে গিয়া দামোদরের পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, "ওরে! ও নরেন, ও হরেন, ওরে নলিন, মোহিনী, যতীন, সতীশ, পাঁচু, ওরে এ যে দামোদর! দে—দে, ওকে চা' দে। দামোদরকে খাবার দে। ওরে দামোদর এসেছে আজ! আমাদের দামোদর!" চারুবাবু আবার দামোদরের পৃষ্ঠে এমন আদরে ও সরবে চাপড়াইয়া দিলেন, যে দামোদরের মনে হইল তাহার পৃষ্ঠের চর্ম্ম খানিকটা ফাটিয়া গেল। ছেলের দল দাঁড়াইয়া উঠিল। বলিল, "হিপ্ হিপ্ হুরে। দামোদর বাবু! হিপ্ হিপ্ হুরে!"

চারুবাবু, দামোদরের পার্শ্বে যে ছেলেটি বসিয়া ছিল, তাহাকে উঠাইয়া দিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িলেন ও হাঁফাইতে লাগিলেন। নরেন তাড়াতাড়ি তাঁহার মুখের কাছে তাঁহার চা-এর পেয়ালা ধরিল; চারুবাবু একনিঃশ্বাসে চা টুকু চুমুক দিয়া ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "আর একটু, নরেন।" নরেন ঘাড় নাড়িয়া, উপরিউপরি চারুবাবুর মুখে একখানা কেকের টুক্‌রা, দু'তিনটা সন্দেশ দিল। তা'র পর চা-দান হইতে আবার চা' ঢালিয়া প্রস্তুত হইল যে মুখ খালি হইলেই আবার ঐ পেয়ালাটিও চারুবাবুকে পান করাইবে। সে দামোদরকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,

"দামোদর বাবু, চারুবাবু বেশী উত্তেজিত হলেই, ওঁর এই সব দরকার হয়।"

দামোদর হাসিয়া কহিল, "তা' জানি। উনি শীঘ্রই উত্তেজিত হয়ে পড়েন।"

দ্বিতীয় কাপ্ চা খাইয়া চারুবাবু একটু সুস্থ হইলেন। তার' পর আবার দামোদরকে ভাল করিয়া আপাদমস্তক দেখিয়া বলিলেন, "দামোদর! দামোদর! ওরে নরেন, নলিন, যতীন, মোহিনী, সতীশ! ওরে তো'রা কি কর্‌ছিস্? দামোদর এসেছে, আর তোরা চুপ ক'রে আছিস্? দামোদর যে তো'দের বড়দাদা, পূর্ব্বপুরুষ; এ মেসের Founderদের একজন। তো'রা কি কোর্‌ছিস্ সব? নিধি, ও নিধে, ও নিধে উড়ে,—তুই কি কোরছিস্?" চারুবাবু আবার হাঁফাইয়া পড়িলেন; তাড়াতাড়ি মোহিনী এক কাপ্ চা পুনরায় আগাইয়া দিল। চারুবাবু তাহা নিঃশেষ করিলেন। ছেলেরা উঠিয়া হাততালি দিল, "three cheers! চারুবাবু and দামোদরবাবু; three cheers! না, না, two cheers! দু'জনের জন্যে two cheers."

চারুবাবু চা শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "নরেন, আজ feast চাই। দামোদরের honor-এ feast চাই। মোহিনী, নলিন, সতীশ, যতীন, সবাই শোন; আজ ফিষ্ট্ চাই। যাও, শীঘ্র নিউ মার্কেটে যাও। না হয় কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে যাও; কাছে হবে। নিয়ে এসো মাংস। বহুবাজার যাও, নিয়ে এসো সন্দেশ; সিমলা যাও, নিয়ে এসো দই; যা' যেখানে পাও নিয়ে এসো, আজ Founder's day! আজ মেসের anniversary! আজ আর চুপ ক'রে থাকা নয়। নরেন, ব্যবস্থা করে ফেল্!"

চারুবাবু আবার দামোদরের পিঠ চাপড়াইয়া দিলেন। দামোদর আঘাতে মুখবিকৃত করিয়া হাসিল। বলিল, "চারুবাবু, এত ব্যস্ত কিসের? করেন কি? মিছে এঁদের কেন সব কষ্ট দিবেন?"

চারুবাবু বলিলেন, "কষ্ট! আজ কষ্ট বলে কিছু স্বীকার করা হবে? কিছুতেই না। আগে জান্‌লে ব্যাণ্ড বসাতুম্; নহবৎ বাজাতুম; কাগজের ফুল দিয়ে gate সাজাতুম; তোমার জন্যে address ছাপাতুম; এ কি কম কথা! founder's day! এ কি সোজা ব্যাপার! দামোদর! তুমি এ মেসের পক্ষে কি জান? গ্যারিবল্ডি; বিস্‌মার্ক: রাজা রামমোহন রায়! যা' কোর্‌ছি এ 'ত কিছুই নয়। নরেন, এটা কি কিছু?"

নরেন জবাব দিল, "কিছুই না, চারুবাবু! আমাদের কাছে এ রকম feast 'ত নিত্যকার ব্যাপার; অন্তত সাপ্তাহিক 'ত বটেই। এতে দামোদর বাবুর কিন্তু হ'বার উপায় নেই।"

চারুবাবু বলিলেন, "শোন, দামোদর, শোন। বল্‌ছি 'ত আগে জান্‌লে দেখ্‌তুম। কি বল, নরেন, দেখ্‌তুম কি না? ওরে সেই নগেনটা কোথায় গেল? সে না হ'লে যে আমি একা পেরে উঠ্‌ছি না দামোদরকে সম্বর্দ্ধনা কোর্‌তে। তো'রা কোন কাজের নয়। সম্বর্দ্ধনা কোরতে পারিস্ না। শীগ্‌গীর কর; আমি আর একটু চা' ততক্ষণ খেয়ে নি। আমার বড্ড গলা শুকিয়ে উঠ্‌ছে।"

ছেলেরা সবাই উঠিয়া চীৎকার করিল, "হিপ্ হুপ্! two cheers। দামোদর ও চারুবাবুর— two cheers."

চারুবাবু চা' পান করিয়া বসিয়া হাঁফাইতে লাগিলেন।

নরেন জিজ্ঞাসা করিল, "আরও cheers চাই, চারুবাবু?" চারুবাবু ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দিলেন। ছেলেরা পাঁচ-সাত মিনিট ধরিয়া খুব সাগ্রহে দামোদরের সম্বর্দ্ধনা করিল। দামোদর সহাস্যে নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া ইহা দেখিতে ও শুনিতে লাগিল। তাহার মনের সমস্ত অশান্তি এই আনন্দের আবর্ত্তে যেন কোথায় তলাইয়া গেল। সে ভাবিল, জীবনে ইহাদের আনন্দই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। সে আবার এইরূপ জীবনযাত্রা করিবে। ইহাতে কোনও অশান্তি নাই। সে চারুবাবুর মত থাকিবে। চারুবাবুও সংসারী; অথচ কেমন আনন্দে আছেন। সে কেন থাকিতে পারিবে না?

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ভালবাসা প্রতারণা

সম্বর্দ্ধনার উত্তেজনার প্রথম ধাক্কা কমিলে, চারুবাবু সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "ফর্দ্দ কর। ফর্দ্দ কর। নরেন, কাগজ পেন্সিল নাও।"

একটী ছেলে উঠিয়া গিয়া কাগজ ও একটী ফাউণ্টেন

পেন লইয়া আসিল। নরেন কাগজ পাতিয়া বলিল, "বলুন, চারুবাবু!"

চারুবাবু বলিলেন, "লেখ, ফার্ষ্ট কেলাস মটন—আধ মণ; আধমণ হ'লেই ত হবে? কি বল, নরেন? গেল সপ্তাহে আধমণই ত' লেগেছিল। কেবল দামোদরই ত' বেশী; তেমনি অতীন নেই—আধমণই ধর।"

নরেন লিখিল। চারুবাবু বলিতে লাগিলেন, "একটা একটা item নাও। আধমণ মটনে কত দৈ চাই? ⁄২॥০ সের লেখ; টক্ দৈ। লিখেছ? আচ্ছা, প্যাঁজ লেখ। কত লিখবে? ⁄৭॥০ সের লেখ। কিছু থাকে থাকবে। চিনি লেখ ⁄১॥০; আচ্ছা, হলুদ প্রভৃতি মস্‌লা লেখ—⁄॥০, না হয় ৸০ আনাই লেখ। ঘী সেরেকে পোয়া হিসাবে কত চাই? ⁄৫ সের লেখ। আর কি বাকী রইল, মোহিনী? আদা? আচ্ছা, আদা লেখ—কত? আধপো' হলেই হবে; না হয় একপো'ই লেখ। কিস্‌মিস্ কিছু চাই বৈ কি; কিস্‌মিস্ না হলে মটন্ জমে না। এ কোর্ম্মা হবে। বুঝেছ নরেন? কিস্‌মিস্—তিনপো'ই লেখ। হোল ত'? আর কিছু চাই রে, যতীন? আচ্ছা, এইবার এসো। লেখ, পোলাও-এর চাল—কত চাই ⁄৮॥০ সের লেখ। গেল সপ্তাহে তাই লেগেছিল। ও লুচি চলবে না। লুচির বড় মেহনত্; অত ময়দা মাখ্‌বে কে? বেলবে কে? ভাজবে কে? ও-সব হয় না। সারা রাত তা'হলে ঐতেই কেটে যাবে; তৈরি হো'তে সব আবার কলেজের টাইম হ'য়ে যাবে। খেতে আর হ'বে না। পোলাওই ভাল; কি বল, দামোদর? আচ্ছা, পোলাও-এর চাল লিখেছ? বেশ—তা'র মশলা লেখ, কত চাই? যা' হয় লেখ, বাবু। যা'তে হয় সেই রকমই চাই। সব কি ছাই আমার মনে থাকে? নলিন, গেল সপ্তাহের সে ফর্দ্দটা কোথায়? হারিয়ে ফেলেছিস্? নাঃ! তো'দের বুদ্ধিশুদ্ধি আর হবে না। শরৎবাবু শরৎবাবু ক'রে তো'র মাথা খারাপ হয়েছে, তো'র আর মাথায় বুদ্ধি থাক্‌বার জায়গাই নেই। শরৎবাবু কি পোলাও-এর চেয়ে ভাল কিছু লিখতে পারে। পোলাও মাংস দই সন্দেশ-এর চেয়ে ভাল কোন্ নভেলের স্বাদ শুনি! তবে? যাক্। ও মস্‌লা যা' হয় লেখ, নরেন, দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করে নিলেই হবে। নিধিটা জানে। ওকেও জিজ্ঞাসা করে নিয়ো। আচ্ছা, আর কি চাই? কতকগুলো হজ্‌বজ্ খেয়ে লাভ নেই। কোনটাই খেয়ে তৃপ্তি হবে না। একটা চাট্‌নী চাই, বুঝেছ? আলুবোখ্‌রাই নিয়ো। সের ⁄২॥০ হ'লেই হবে। তা'র জন্যে চিনিও নিয়ো, সের ⁄৪, ⁄৫ বুঝেছ? লিখলে? ভাল কথা, বেশ তাজা ও বড় দেখে কাগজে কি প্যাতিলেবু নেবে দু'তিন ডজন, যা' পাও। আর কলাপাতা ভুলো না। এই গেল, বাজার! এইবার দৈ—চিনিপাতা দৈ নেবে, যেখান থেকে আমাদের আসে। কত নেবে,—ও ।০ দশ সেরই নিয়ো। আর সন্দেশ—ভাল দেখে নিয়ো, খুব দামী নয়—তবে এই ২॥০ টাকা ৩্ টাকা সের এই রকম—নিয়ো; কত? ধর জোর ⁄৭॥০ সাড়ে সাত সের। সন্দেশটা দৈ-এর সঙ্গে উঠবে। বস্! আর কিছু নয়। বেশী হাঙ্গামা কর্লে রাত কাবার হ'য়ে যাবে। খাবার সময় পাবো না। আমিই যাচ্ছি দৈ, সন্দেশের ব্যবস্থা কর্ত্তে। তোমরা দেখে আন্‌তে পার্ব্বে না। তোমরা তিন-চার জন যাও বাজারে। কলেজ ষ্ট্রীটেই যাও। শীঘ্র শীঘ্র কর। যেন রাত্রেই খাওয়া হয়, বুঝেছ? দামোদর! তুমি বোস; না হয় কোথায়ও শুয়ে পড়। যদি বেড়াতে যেতে চাও, চল। যাবে? না হয় থাক্। বড় ক্লান্ত আছ? আচ্ছা, স্নানটান করে নাও, সুস্থির হও তুমি। তুমি আজ guest অতিথি; তুমি স্রেফ্ বসে থাক্‌বে!"

দামোদর বলিল, "সেই ভাল, চারুবাবু। আমি যেতুম, আপনার সঙ্গে; কিন্তু স্নান কর্ত্তে হবে।"

চারুবাবু বলিলেন, "না, না, দরকার নেই, দামোদর। আমি আস্‌ছি বলে। ঘণ্টাখানেকের ভিতরই আস্‌বো। এই ত' সাড়ে সাতটা বেজেছে; আমি সাড়ে আটটা, ন'টার মধ্যে ফির্‌বো। তুমি ততক্ষণ জিরিয়ে নাও।"

এমন সময় নগেনের দল ফিরিয়া আসিল। নগেন, ও সেই ঝুল্‌পিওয়ালা ছেলেটি, তা'র নাম শচীন, আর তৃতীয়টী—তা'র নাম রমেশ। তিনজনে আসিয়া উপস্থিত হইতেই, চারুবাবু বলিলেন, "নগেন? রমেশ? নগেন তুই কোথায় থাকিস্? দামোদর এসেছে জানিস্ না।" বলিয়া দামোদরকে দেখাইয়া দিলেন।

নগেন বলিল, "জানি না, কি রকম? খুব জানি? আপনার আগে জানি।"

চারুবাবু কহিলেন, "ছাই জানিস্! তো'র কেবল

বচন আছে! জানিস্ দামোদর এ মেসের একজন ex; একজন Founder? তা' জানিস্? আজ feast হবে। কেমন নরেন, হবে না? আজ দামোদরের honor-এ feast হবে। বুঝেছিস্! আমরা সব বাজার যাবো। তো'রা ওকে সম্বর্দ্ধনা কর। তোঁদের ঘরে নিয়ে যা'। আদর অভ্যর্থনা কর। খুব করে অভ্যর্থনা। ও আমাদের দামোদর!" চারুবাবু দামোদরের পিঠ চাপড়াইলেন।

শচীন উত্তর দিল, "বটে! আমাদের দামোদরবাবু? আমাদেরই? চারুবাবু, আজ নিশ্চয়ই feast চাই। শীগ্‌গীর বাজার যান্। আমরা ওঁকে ততক্ষণ engage ক'রে রাখবো। আসুন, আসুন, দামোদরবাবু আসুন, আমাদের ঘরে।" বলিয়া দামোদরকে টানিয়া তাহাদের ঘরে লইয়া গেল।

দামোদর সে ঘরে প্রবেশ করিয়া একখানি তক্তপোষে বসিল। নগেন ও শচীন আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। রমেশ বলিল, "দামোদরবাবু, আগে বল্‌তে হয়। আমরা কি জানি আপনার কথা? ভাগ্যে চারুবাবু ছিলেন; না হলে ত' আপনাকে কেউ চিন্‌তো না; হয় ত' তাড়িয়েই দিত। মেসের কি দুর্নামই হোত।"

দামোদর বলিল, "আপনারা আর কি ক'রে জান্‌বেন?"

শচীন কহিল, "বাঃ! আপনি কোন বলেছিলেন ভাল ক'রে? যাক্, এখন কি কর্ব্বেন? বস্‌বেন, না, শোবেন? বলেন ত' একটা গান গেয়েই আপনাকে শুনিয়ে দিই। নগেন, গাইব রে?"

দামোদর হাসিয়া বলিল, "তাড়া কি? উপস্থিত আমার স্নান কর্ত্ত ইচ্ছা হচ্ছে বটে; কিন্তু আমার দ্বিতীয় বস্ত্রও নেই, জামাও নেই। আমি এক বস্ত্রেই এসেছি। তাই ভাবছি।"

নগেন জবাব দিল, "বটে? তা'র জন্য আট্‌কাবে না; কিছু আট্‌কাবে না। আমাদের জামাকাপড় দিচ্ছি। দে'ত শচীন আমার ট্রাঙ্ক থেকে একখানা দেশী কাপড়, একটা পাঞ্জাবী বা'র করে। গামছা নিন্; তোয়ালে চাই? আচ্ছা, দে, তোয়ালে দে। আর সাবান দে। তেল চাই? দে' ঐ ক্যাষ্টর ওয়েলের শিশিটা এগিয়ে দে। যান্; চট্ ক'রে নেয়ে আসুন। তা'র পর বসে গল্প করা যাবে। আপনার romantic ব্যাপার। এক কাপড়ে বাড়ি ছেড়েছেন, এর চেয়ে আর romance কি আছে? কি হয়েছে? কি আপনার দরকার? প্রাণে আপনার কিসের ব্যথার দাগ? নিশ্চয়ই ভয়ানক রোমান্স!"

দামোদর বলিল, "না। তেমন কিছু নয়।"

শচীন বলিল, "তা' হবে না। বল্‌তে হবে। তবে আর আলাপ কি? বন্ধুতা কিসের? নিশ্চয়ই রোমান্স। এক কাপড়ে আসা? ভয়ানক!"

দামোদর একটু হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, স্নান ক'রে এসে সব বল্‌বো। আপনাদের দেখে আমারও মন খুব আনন্দিত হয়েছে। আমি আপনাদের মত বন্ধুই চাই।"

দামোদর স্নান করিতে গেল। শচীন আয়নাতে একবার চুলটা দেখিয়া লইল। নগেন একটা সিগারেট্ ধরাইয়া ফেলিল। শচীন্ শুইয়া পড়িয়া গান ধরিল,

"কবে তুমি আস্‌বে বোলে,
আমি থাক্‌বো না বো-সে-এ-এ—"

দামোদর মিনিট ১৫ বাদে স্নান করিয়া নগেনের ধুতি পাঞ্জাবী পরিয়া ফিরিল। নগেন বলিল, "এইবার ঠিক হয়েছে। একটু আরাম পাচ্ছেন? আপনার বাড়ি কোথায়, দামোদরবাবু? বর্দ্ধমান নয়? বর্দ্ধমানের লোকের বুদ্ধির পাক বেশী? বাঁকুড়া। বাঁকুড়াতে দুর্ভিক্ষ লেগে আছে, কেন জানেন? তা'দের আহারের প্রকোপে। সেখানে যা'র পেটে যত বড় পিলে, তা'র তত আহার। পেট ও বুকের গড়নে বাঁকুড়ার লোক বুঝা যায়। হুগ্‌লী না; হুগ্‌লী জেলার লোক পিলের ভারে বেঁকে পড়ে; দাঁত কাল হয়ে যায়; মুখে মেচেতা পড়ে। গঙ্গার এ-পারে মুর্শিদাবাদ? না, তাও নয়। নদীয়া? হাঁ; নদীয়ার লোক আপনার মত বেশ গোলগাল হয়। প্রেমের দেশ গৌরাঙ্গের দেশ; সেখানে মাল্‌পো ও মাল্‌সার প্রাদুর্ভাব চেহারায় বুঝা যায়। আপনি নদীয়া, না?"

দামোদর জানাইল যে তাহার অনুমান সত্য। নগেন বলিল, "আমি নগেন। আমার বাড়ি শান্তিপুর। বাবা না বাড়িতে। বাবা, কিছু জমিয়ে গিছ্‌লেন। কি ক'রে জানেন? কে একজন পয়সা-ওয়ালা বিধবা ছিল, তা'

টাকা মেরে। Glorious ancestor! মহাজন! আমি এইখানে থাকি। টাকাটার ব্যবহার করি। প্রায় শেষ ক'রে এনেছি। ফোর্থ ইয়ার চল্‌ছে; চার-পাঁচ বছর ধরে চল্‌ছে; এটা শেষ হ'তে আরও না কোন বছর চার-পাঁচ লাগ্‌বে। ততদিনে পিতৃধনের সুব্যবস্থা ক'রে ফেল্‌বো। আর এই শচীন; ও'র বাড়ি রাজসাহীতে কোথায়। ওর বাপ উকীল। বেশ বাপ্। হাত পাত্‌লেই কিছু হাতে পড়ে। ওর সেকেণ্ড ইয়ারে দু' বছর হোল। তবে ও বড় সাহিত্যিক; একটু বেশী রকমের প্রেমিক; সেইজন্যে মাঝে মাঝে ও'র উপর বিরক্তি ধরে। বড় বকে। আর এই যে এটিকে দেখ্‌ছেন, ইনি রমেশ। দুনিয়ায় ইনি moving encyclopaedia, চলন্ত অভিধান। জানেন না—হেন পদার্থ নেই। অতিবিদ্যায় কাবু হয়েছেন। এঁরও তিন বছর সিক্‌স্থ (Sixth) ইয়ার হো'ল। ও'র চলে কিসে জানি না। কোথায় পয়সা পায় বলে না। তবে যেখানেই পা'ক্, ওর উৎস অফুরন্ত। সুতরাং আপনার লজ্জা সঙ্কোচের কিছু নেই। আমরা সবাই veteran. দেখ্‌তে ছোট হ'লে কি হয়, জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, অভিজ্ঞতায় সব বৃদ্ধ, প্রাচীন। বুদ্ধদেব!"

দামোদর বলিল, "তা' ভাল। আপনাদের সঙ্গে আলাপ হয়ে আমি বড় আনন্দিত হলুম। সত্যি এ আমার সৌভাগ্য!"

শচীন বলিল, "সেটা উভয়তঃ দামোদরবাবু। এখন আপনার কথা বলুন। আমাদের ত সব হালচাল শুন্‌লেন। আপনারটা শোনান।"

দামোদর কহিল, "না শোনালে অবশ্য অন্যায় হবে। একান্তই শুন্‌বেন?"

রমেশ বলিল "যদি আপনার আপত্তি না থাকে।"

দামোদর উত্তর দিল, "আমার আপত্তি নাই।" তা'রপর সে নিজের জীবনের সমস্ত বৃত্তান্ত তাহার নূতন বন্ধুদের শুনাইল। শচীন, নগেন ও রমেশ উৎসুক হইয়া সমনোযোগে শুনিল। দামোদর সব শেষ করিয়া বলিল, "এই রকমে এসেছি! ভালবাসা প্রতারণা! সংসার বিষময়; জীবনে সুখ নাই। আমি সন্ন্যাসীই হবো। এখানে এসেছি, পথে পড়ে বলেও; আরও দু'এক জন পরিচিত আছে—দেখা করে যাবো বলে। না হলে, সন্ন্যাসী হওয়াই শান্তির পথ।"

নগেন বলিয়া উঠিল, "My god! দামোদরবাবু! উঃ! ভালবাসা প্রতারণা! ভালবাসা ব'লে দুনিয়াতে কিছু নেই? ওটা নেহাত্ কল্পনা! My God! খাঁটি কথা। বেদের কথা!"

শচীন জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু নিতাই ঘোষ—আপনার শ্বশুর—খুব রোমান্টিক figure ত? আমার যে দেখ্‌তে ইচ্ছে কোর্‌ছে।"

নগেন্ বলিল, "দামোদর বাবু, ও প্রেম জিনিসটা theory, ওটার কার্য্যোপযোগিতা নেই। তাই আজকাল সায়েন্স বলে যা' আছে সেটা sex. বুঝেছেন? sex স্বীকার করুন, বস্; প্রেম টেম সেকালের কথা। সতীত্ব, ভালবাসা, সহমরণ সে সব গিয়েছে; কুসংস্কার মাত্র; সব গেছে, যাচ্ছে। এখন শুধু sex আছে; বুঝেছেন? সায়েন্স পড়ুন, সব বুঝ্‌তে পার্‌বেন।"

দামোদর ঠিক বুঝিতে পারিল না। বলিল, "আমি অবশ্য আপনাদের মত পড়াশুনা করি নি। কিন্তু যা' নিজের জীবনে বুঝেছি, তাই বল্‌ছি। ভালবাসা মায়া।" সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

শচীন বলিল, "আপনার স্ত্রী দেখ্‌তে কি রকম? কিছু মনে কর্ব্বেন না। আপনার কথায় আমার মনে যে রকম ছবি তাঁ'র হয়েছে, সেটা এই রকম; দেখুন 'ত মেলে কি না; সুন্দরী, রূপসী; রূপ কি রকম জানেন, খুব ফর্সাও নয়, খুব কালোও নয়। ধরুন মাঝামাঝি। লম্বাটে গড়ন, কিন্তু বেশ মজবুত; মুখখানা বেশ কমনীয়, সৌষ্ঠবপূর্ণ; কিন্তু দরকার হ'লে খুব কঠিন হতে পারে। চোখের চাহনি—প্রখর, হয় যখন খুব প্রখর; না হোলে কোমল। মাথায় ঘনকৃষ্ণ সুদীর্ঘ কেশদাম। এই না?"

রমেশ বলিল, "ও কবি, দামোদর বাবু। আপনি কি আমি কোন ঘটনার কথা ওকে শোনালেই ওর মনে অমনি ছবি ফুটে ওঠে। ওর nervous disorder আছে।"

দামোদর হাসিল। বলিল, 'না, শচীনবাবু, আপনার ছবি ঠিক আঁকা হয় নি। আসল বস্তুর ধার দিয়েও যায় নি। কাল, ছোট গড়ন, একটু দোহারা চেহারা, খুব

মজ্‌বুত বলেও মনে হয় না ; চাহনি প্রখর হয় না, তবে মুখ খুব ক্ষর হয় বটে।"

রমেশ কহিল, "শচীন নিজের জানা কা'রও ছবি দেখেছে ; ওর মনটা ঐ রকম নানা রঙ নিয়ে তাল পাকায়। কোনও মেয়ে দেখলেই ও অমনি তাই থেকে এক তিল রূপ খুঁটে নেয় মনে মনে। ওর অদৃষ্টে কি আছে জানি না। তিলোত্তম-বধ কাব্য না বানায়।"

দামোদর মন্তব্য দিল, "ও কিছু নয়। আমিও এক সময় ঐ রকম কত কবিতা করেছি। এখন সব ছুটে গেছে। রূপ থাকতে পারে, প্রাণ নেই।"

শচীন উৎসুক হইয়া বলিল, "কবিতা লিখতেন? শোনান্ না দু' একটা দামোদরবাবু! প্রেমের কবিতা ত? শোনান্ শীগ্‌গির।"

দামোদর সবিনয়ে বলিল, "আমার কি মনে আছে? আর সে শোনাবারও যোগ্য নয়। সে নিতান্তই মামুলি।"

শচীন বলিল, "আমাদের কাছে আর লজ্জা কি? শোনান্ একটা আধটা।"

নগেন ও রমেশও অনুরোধ করিল। দামোদর জিজ্ঞাসা করিল, "ইংরাজি না বাঙলা?"

রমেশ বলিল, "যা হয়। দুই-ই এক, এক-ই দুই। কবিতা জিনিসটার বেশ বদল কর্লেও চরিত্র বদ্‌লায় না নগেনের মতন।"

দামোদর হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, শুনুন। বড় কবিতা মনে নেই ; ছোট দু' একটা মনে আছে। আগে ইংরেজিতেই বলি।

(1) My Love is dark, (আমার প্রিয়া কালোবরণ
She is Dark ; কালোবরণ তার!
But does not light আঁধার ঘরেই আলো জ্বলে,
Burn in night আলো যায় আঁধার!
Love in closet অন্ধকারে প্রেমের আলো
Glow'd the best ; জ্বলে উঠেছিল!
It was a flame অন্ধকারে প্রেমের দীপ্
When it came. বাড়িয়ে দিয়েছিল!)

সকলে বিস্মিত প্রশংসায় দামোদরকে বলিল, "wonderful! আর একটা! দামোদরবাবু, আপনি wonderful!"

দামোদর আর একটি কবিতার আবৃত্তি করিল,

Love is an omnipotent God,
In all men or women ;
He is not a myth nor a fraud,
That science shall question,
Love has a quiver and a bow
Just a curious trifle ;
But when' he shoots an arrow,
It's cartridge from a rifle.
Love is dexterous and wily,
He wounds and he cares not ;
It is the heart. the heart surely,
That will bleed from his shot.

শচীন বলিয়া উঠিল, "দামোদরবাবু, আপনি genius আপনি Shelly। Wonderful! বিলাত হো'লে আপনার আদর হো'ত!"

রমেশ বলিল, "একটা বাঙলা কবিতা শোনান্ আপনার ইংরেজি কবিতা এত উঁচুদরের, বাঙলা না জানি কি রকম হবে। শোনান্!"

দামোদর বলিল, "বাঙলায় আমার দখল কম আচ্ছা, শোনাচ্ছি ; এইটা আমার স্ত্রী প্রথম বাপের বাড়ি যাবার পর একদিন লিখেছিলুম।

"মনে পড়ে, সখি, আজ সে গোপন কথা,
সে বাহু বেষ্টন, সেই বুকে রাখা মাথা ;
মৃদু ভাষ,—যেন কোন ঝর্ণার ধারা,
আপন উচ্ছ্বাসে বহে যায় আত্মহারা।
স্মৃতির দংশন এত কে জানিত আগে?
কেন বা আকুল মনে সে কথাই জাগে?
কত দিন দেখি নাই পড়ে যায় মনে,
ধরে না, ধরে না অশ্রু এ দুটি নয়নে।"

দামোদর আরও স্মরণ করিতে চেষ্টা করিল, পারিল না বলিল, "এটা সনেট—Shakespearean সনেটের ধরণে লিখেছিলুম। শেষের অংশটা মনে নেই।" দামোদর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

নগেন জিজ্ঞাসা করিল, "দামোদরবাবু, আপনি এখন Loveএ বিশ্বাস করেন?"

দামোদর বিরসভাবে উত্তর দিল, "না, আর বিশ্বাস নেই। আমার সংসারের কিছুতেই আর বিশ্বাস নেই। বিশেষতঃ স্ত্রীলোক ঘটিত ব্যাপার। Frailty! Thy name is woman!" এ কথা খুব সত্যি।"

শচীন বলিল, "কিন্তু Love যদি না থাক্‌বে, ত' এত কবি, এত লেখক, সব Love-এর এত ব্যাখ্যান করে কেন?"

নগেন বলিল, "ওটা স্নায়বিক ব্যারাম। মানুষ মাত্রেরই ঐ রকম অবস্থা একটা সময়ে হয়। বিশুদ্ধ স্নায়বিক ব্যাপার। সেই সময় উত্তেজনা হয়। Sex-উত্তেজনা। তাই তো লোকে নানারকম কল্পিত জিনিসের ঘটনার ছবির কথা লেখে ও ভাবে। সাইকলজি পড়্‌লে বুঝ্‌তে পার্‌বি, ওটা একটা অসুস্থ অবস্থা ; ব্লড প্রেসার বাড়ে ; pulseএ irregularity হয় ; hypochondria হয় ; আবল্ তাবল্ বকে। সমস্ত দেহ বিকল হয়। কি বলেন দামোদরবাবু? হয় না? এমন কি ক্ষুধা, নিদ্রা প্রভৃতি স্বাভাবিক শরীর-ধর্মও সব গোলমাল হ'য়ে যায়।"

দামোদর বলিল, "কতকটা তাই দাঁড়ায় বটে। ব্যারামও হো'তে পারে।"

নগেন বলিল, "কতকটা কি বল্‌ছেন? পুরা দস্তুর তাই। একজন lover-এর Mood test করে দেখলে দেখবেন যে তাপ কত বেড়ে গেছে। ওটা organic ব্যারাম। Sexual ব্যাপার ; প্রথম sex-consciousness হওয়াতে সমস্ত দেহ system ঐ রকম বিশৃঙ্খল হয়ে যায়। যে কোন organism বাড়তে পেলেই ঐ রকম হয়। যেমন দাঁত ওঠা, মেয়েদের যেমন puberty, সেই রকম। এর মধ্যে আর সন্দেহের কিছু নেই। এ পুরা science। ও প্রেমট্রেম্ কুসংস্কার ; অজ্ঞানের সময় মানুষ ঐ নাম এই রোগের দিয়েছিল। সায়েন্স এসে সব বদ্‌লে দিয়েছে। এখন প্রেমের কবিতা Whitmann পড়্—দেখ্‌বি কি রকম scientific."

রমেশ বলিল, "তুই সায়েন্স হিসাবেই প্রেমের চর্চা করিস্?"

নগেন উত্তর দিল, "না। সায়েন্স জানি বলে ঐ ব্যারামের প্রতিষেধক আমি রেখেছি নিজের কাছে। Prevention is better than cure."

শচীন কহিল, "আমি বিশ্বাস কর্ত্তে পারি না যে প্রেম ভালবাসা সব প্রতারণা।"

নগেন বলিল, "Because you are a green lover. তো'র ব্যারাম chronic দাঁড়িয়েছে, তাই। পুরানো ম্যালেরিয়া থেকে কালাজ্বর দাঁড়িয়েছে। দামোদরবাবুকে জিজ্ঞাসা কর!"

দামোদর শচীনের প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টির উত্তরে বলিল, "ভালবাসা প্রতারণা, শচীন বাবু।" দামোদরের আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। শচীন দামোদরের দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িতে দেখিয়া বলিল, "দামোদর বাবু! মনে আপনার তা' হলে খুব জোর আঘাতই লেগেছে। এ অবস্থায় মানুষ বিষয়ে বিরাগী হয়ে যায়। কিন্তু যাই বলুন, আপনার শ্বশুর কিন্তু খুব জোয়ান! সত্যি কি ডাকাতি করেন না কি?"

দামোদর উত্তর দিল, "ও-কথা আর আমায় মনে করিয়ে দেবেন না শচীন্ বাবু!"

রমেশ বলিল, "থাক্! যা' হয়ে গেছে তা' নিয়ে আর আলোচনা নিষ্প্রয়োজনীয়। ও রকম হয়। দু'দিন বাদে আবার রাগ পড়ে যাবে। তখন বুঝা যাবে। এখন দু'চার দিন এইখানে থাকুন।"

ছেলেরা ও চারু বাবু বাজার করিয়া ফিরিল। চারু বাবু একবার উপরে উঠিয়া দামোদরের কাছে গিয়া বলিলেন, "দামোদর, তুমি বস্‌বে, না শোবে? না হয় ত' নীচে চল। আজ খাও। খুব ধুম কর্ত্তে হবে। নগেন, শচীন, রমেশ, তোরা যাবি নীচে? চল্। রান্না কর্ত্তে হবে। সবাই না গেলে রান্না কোর্ব্বে কে? রাত্রের ভিতরই ত সারতে হবে। কাল্ সকাল না হয়ে যায়। ঘুমুবো কখন তা' হ'লে। উঃ! কাল যদি কলেজের ছুটি থাক্‌তো! তো'দের কি? গেলি না গেলি সব সমান্। চল্, ওঠ্।"

সকলে নীচে চলিল। দামোদর দেখিল মেসের অর্দ্ধেক ছেলে নীচে একতলায় জড় হইয়াছে ; বাকী অর্দ্ধেক দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। সোরগোলের সীমা নাই। নরেন, নলিন, মোহিনী, সতীশ প্রভৃতি সকলেই জটলা করিতেছে, আর কথা চলিতেছে। একতলা ও দ্বিতলের মধ্যে কথা বলিতেছে। চারু বাবু গিয়া বলিলেন, "আরে, তোরা দেখ্‌ছি সেই সকাল কোর্‌বি তবে ছাড়্‌বি।

লাগা, লাগা! শীগ্‌গির রান্না চড়া। নিধি, ওরে নিধে, কোথায় তুই? লাগা শীগ্‌গির রান্না চড়িয়ে দে। আগে কোন্‌টা? ওরে নরেন, আগে কোন্‌টা রাঁধ্‌বি? দুটো উনানে দুটো কিছু চড়িয়ে দে। ও ঠাকুর? তোমার ও ভাত দাল ছাই নামাও না। ও আজ আর কে খাবে শুনি। তোমাদের উড়ে জাতের আর বুদ্ধি হোল না। কি ক'রে জলের কল মেরামত কর সব?" চারু বাবু হাঁফাইয়া পড়িলেন। নরেন বলিল, "চারু বাবু, আপনি ঐখানে চেয়ার পেতে বসুন্। দেখুন্ আমরা সব করে ফেল্‌ছি।" নগেন কহিল, "এ আর কতক্ষণ লাগ্‌বে? ভোর হবার আগেই সম্ভব সব সারা হবে।" দ্বিতলের বারান্দা হইতে কে বলিয়া উঠিল "শুন্‌ছেন, চারু বাবু? নগেনের কথা শুন্‌ছেন। কাল আর কাউকে কলেজ যেতে হবে না।"

চারু বাবু চেয়ার পাতিয়া বসিয়া বলিলেন, "না, না, রাত্রেই সব করা চাই, নগেন, মোহিনী, তো'রা সব কি গণ্ডগোল কোরছিস্, রাত যে শেষ হো'য়ে গেল। কতক্ষণ বসে থাক্‌বো? কি কোর্‌বি কর না!"

দামোদর এই গোলমালের ভিতর তাহার নিজের কথা ভুলিয়া গেল। সে বলিল, "চারু বাবু! আমি এতটা আশা করি নি। আপনারা যা আয়োজন করেছেন, এতে রাতই কাট্‌বে; কিন্তু বড় আনন্দ হবে।"

শচীন্ কহিল, "চারু বাবু, গান গাইব? তা' না হলে কিন্তু আমি কাজ কোরতেই পারি না।"

নগেন্ ধমক্ দিল, "তুই থাম্, শচী, তুই দেখ্‌ছি আমাদের কাজ কর্ত্তে দিবি না।"

চারু বাবু দামোদরকে বলিলেন, "দামোদর! ভাগ্যে তুমি আজ এসেছিলে? কেমন, ভাগ্যে এসেছিলে? তা' না হলে কি আজ feast হো'তো! কি রে নগেন, হো'ত?"

নগেন উত্তর দিল, "কিছুতেই না। আজ হবার কোন সম্ভাবনা ছিল না।"

শচীন্ দামোদরকে বলিল, "দামোদরবাবু, আপনার মনে যদি আপনার স্ত্রী আঘাত না দিত, আর আপনার শ্বশুর মশাই যদি ভয় না দেখাতো, তবে কি আস্‌তেন, না এই রকম feast হো'ত? উঃ! আমাদের খুব জোর বরাত। তাই না এই রকম ঘটনা ঘটেছিল।"

দামোদর কহিল, "না। আমি আপনাদের মত আবার হোতে যদি পার্ত্তুম! আমার আবার এই রকম ক'রে থাক্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে, শচীন্ বাবু। ভালবাসা প্রতারণা; তাহাতে আনন্দ নাই। কিন্তু আপনাদের বন্ধুত্ব বেশ্।"

শচীন্ চুপি চুপি বলিল, "দামোদর বাবু, আমিও যে ভালবেসেছি। এখন তা' হলে উপায়?"

দামোদর সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল, "শচীন্ বাবু! কেন ও কাজ কর্‌লেন? আপনার এই বয়সে? আমার আসা পর্য্যন্ত যদি অপেক্ষা কর্ত্তেন। আর অগ্রসর হবেন না। আমি বন্ধুর মতই পরামর্শ দিচ্ছি, আর এগুবেন না। বিবাহ করিবেন না। কখনও না।" (ক্রমশঃ)

প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়

শ্রীহরিহর শেঠ

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ

(৫)

স্বামী বিবেকানন্দ—১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে সিমুলিয়ার দত্ত-বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম বিশ্বনাথ দত্ত। বিবেকানন্দের প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ, শৈশবে বিশ্বেশ্বর নামে অভিহিত হইতেন। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার অসাধারণ মেধা ও স্মরণশক্তি, আর্ত্তের প্রতি সহানুভূতি

স্বামী বিবেকানন্দ

এবং আধ্যাত্মিক ভাবপ্রবণতা লক্ষিত হয়। পাশ্চাত্য দর্শন শিক্ষা করিয়া প্রথমে তিনি নাস্তিক ভাবাপন্ন হন। পরে ব্রাহ্মগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার সে ভাবের পরিবর্ত্তন হইলেও আধ্যাত্মিক তৃষ্ণার উপশম না হওয়ায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়েন। তিনি যখন বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, সেই সময় রামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয়; এবং প্রথম সাক্ষাতেই উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। অতি অল্প কাল মধ্যে তিনি পরমহংসদেবের শিষ্যগণের মধ্যে অগ্রণী হইয়া উঠিলেন।

ভগিনী নিবেদিতা

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে পরমহংসদেবের দেহান্তর ঘটিলে তিনি ছয় বৎসর কাল হিমালয় পর্ব্বতে অতিবাহিত করেন। সেই সময় তিনি তিব্বতে গমন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম অনুশীলন করেন। তৎপরে খেতড়ী রাজ্যে আসিয়া তথাকার

রাজাকে স্বমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজের রামনাদের রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মাদ্রাজবাসীদের অনুরোধে ও অর্থ-সাহায্যে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার চিকাগো নগরে Parliament of religion নামক সমিতির বৈঠকে প্রেরিত হন। সেখানে হিন্দুর প্রতিনিধি স্বরূপে হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে অসাধারণ বাগ্মিতার পরিচয় দিয়া যে সকল বক্তৃতা দান করেন, তাহাতে তথায় হুলস্থুল পড়িয়া যায়। সেখানে মাদাম্ লুই ও মিষ্টার স্যাণ্ডস্‌বার্গকে শিষ্যরূপে লাভ করেন। বহু স্থানে বক্তৃতা করিয়া তথায় তিনি বৈদান্তিক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন।

কাপ্তেন রাজকৃষ্ণ কর্ম্মকার

৮৯৬ সালে তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন এবং নানা সভায় বক্তৃতা করিয়া যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের সহিত আলাপ করিয়া Life and Sayings of Ramkrishna নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে তাঁহাকে প্রবৃত্ত করান। এই স্থানে তিনি কুমারী মার্গারেট নোবেল্ নাম্নী মহিলাকে শিষ্যত্বে দীক্ষিত করেন। ইনিই পরে সিষ্টার নিবেদিতা নামে সুপরিচিতা হন এবং ভারতের ধর্ম্মকে তাঁহার নিজের ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়া ১৮৯৬ সালে বিবেকানন্দের সহিত ভারতে আইসেন। বিবেকানন্দ ভারতে আসিলে কলম্বো হইতে আলমোড়া পর্য্যন্ত যে সকল স্থানে গমন করিয়াছিলেন, সকল স্থানেই আন্তরিকতার সহিত অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া স্বামিজী প্রথমে বেলুড় মঠ ও আলমোড়ায় ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দানার্থ একটি মঠ স্থাপন করেন। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা ইঁহার জীবনের অন্যতম প্রধান কার্য্য। ১৮৯৭ সালে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সাহায্যার্থ নানা স্থানে কেন্দ্র স্থাপিত করেন। বহু পরিশ্রমে স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়ায় চিকিৎসকের পরামর্শে পুনরায় অল্প দিনের জন্য ইংলণ্ড ও আমেরিকায় গমন করেন। এই সময় স্যান্‌ফ্রান্সিস্কো নগরে একটি

সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস

বেদান্ত সোসাইটি ও শান্তি আশ্রম স্থাপিত করেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিস্ নগরে Congress of Religion সভায় নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় ফরাসী ভাষায় হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। তথা হইতে দেশে প্রত্যাগমন করি রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, রামকৃষ্ণ হোম্ প্রভৃ বহু প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি জাপানের ধ সম্বন্ধীয় কংগ্রেসেও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন; কিন্তু শারীরি অসুস্থতা নিবন্ধন তথায় যাইতে সমর্থ হন নাই। ত ও সেবা ইঁহার জীবনের মূল মন্ত্র ছিল। সার্ব্বজনীন

সংস্থাপন ইঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ইঁহার ন্যায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, ধর্ম্ম-প্রাণতা, বহু-ভাষা জ্ঞান ও বক্তৃতাশক্তি-সম্পন্ন অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি কমই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি 'রাজ-যোগ', 'ভক্তি-যোগ', 'জ্ঞান-যোগ', কর্ম্ম-যোগ', 're-incarnation' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। তিনি ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই বেলুড় মঠে বৈকালিক ভ্রমণ করিয়া আসিয়া ধ্যানস্থ হন এবং রাত্রি ৯টার সময় মহাসমাধিস্থ হইয়া পরলোক গমন করেন।

* * * *

রাজকৃষ্ণ কর্ম্মকার—১২৩৫ সালে হাবড়া দরফপুর গ্রামে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার

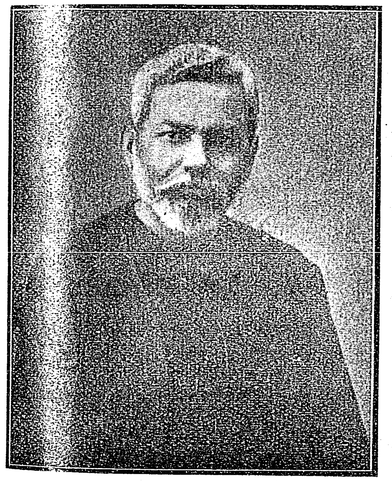

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নাম মাধবচন্দ্র কর্ম্মকার। বিদ্যালয়ের শিক্ষালাভ রাজকৃষ্ণের ভাগ্যে ঘটে নাই, কিন্তু স্বীয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অধ্যবসায় বলে কলকারখানার কাজ, এঞ্জিন, বয়লার, জাহাজ, ষ্ট্যাম্প কাগজের কল প্রভৃতিতে ইনি অসাধারণ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। কাশীপুর ও দমদমার গন্ ফাউণ্ডারীতে কামান বন্দুকের কাজ শিক্ষা করিয়া অল্পকাল মধ্যেই এখানকার হেড্ মিস্ত্রী হন। তৎপরে নেপাল-রাজের কার্য্যে নিযুক্ত হন। তথায় তিনিই প্রথম যন্ত্রযোগে মুদ্রা প্রস্তুত করেন, এবং আধুনিক উন্নত প্রণালীর যন্ত্রাদি আনাইয়া কামান বন্দুকের কারখানা স্থাপন করেন। তিনি কাবুলেও বার জন কারিকরসহ আড়াই বৎসর আমীর আবদার রহমানের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া তথায় কল বসাইয়া প্রথম কামান বন্দুকের কারখানা স্থাপন করেন। তথা হইতে আমীরের প্রদত্ত বহু পুরস্কার সহ প্রত্যাগমন করিয়া নেপাল-রাজের আহ্বানে ১২৯১ সালে পুনরায় তথায় গমন করেন। তাঁহার পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত কারখানার বহুল উন্নতিসাধন করা ভিন্ন কাঠের কারখানা, বৈদ্যুতিক আলোক প্রতিষ্ঠা, উন্নত প্রণালীর কামান, কামানের গাড়ী, মেসিন্ গান্ প্রভৃতি

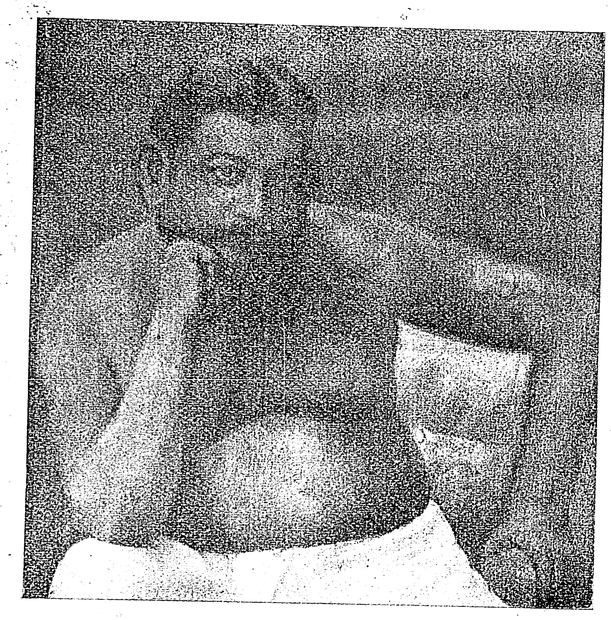

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

নির্ম্মাণের ব্যবস্থাদি করিয়া আপনার কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তথাকার যাবতীয় কলকারখানা ইহাঁরই তত্ত্বাবধানে স্থাপিত হয়। মহারাজা সন্তুষ্ট হইয়া ইহাঁকে কাপ্তেন উপাধি ও বহুমূল্য একটী সুদৃশ্য পাগড়ী উপহার দেন।

* * *

রামমোহন বসু—কলিকাতার পরপারে শালিখা গ্রামে ১১৯৩ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম রবিলোচন বসু। কলিকাতায় যোড়াসাঁকোয় থাকিয়া ইনি শিক্ষালাভ করেন। এই সময় তিনি অবসর সময়ে কবিতাও লিখিতেন।

কথিত আছে তৎকালীন প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা ভবানী বেণে তাঁহার রচিত কতিপয় গান পথে কুড়াইয়া পান। সেই উচ্চভাবাত্মক শ্রুতিমধুর গানগুলিতে মুগ্ধ হইয়া ভবানী রামমোহনের সহাধ্যায়ীদিগের শরণাপন্ন হইয়া অনেক অনুনয় বিনয় দ্বারা গান সংগ্রহ করিতে থাকেন। কিছুদিন অতিবাহিত হইলে ভবানীর অনুরোধে একদিন রামমোহন কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটীতে ভবানীর দলে প্রথম গান করেন। পিতা ইহা জানিতে পারিয়া অসন্তুষ্ট হওয়ায় রামমোহন দলের সংশ্রব পরিত্যাগ করেন। পিতার মৃত্যুর পর কিছুদিন কেরাণীগিরি কাজ করিয়া, স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য ভবানী বেণে, নীলু ঠাকুর, মোহন সরকার প্রভৃতি কবিওয়ালাদের দলে গান বাঁধিয়া দুই

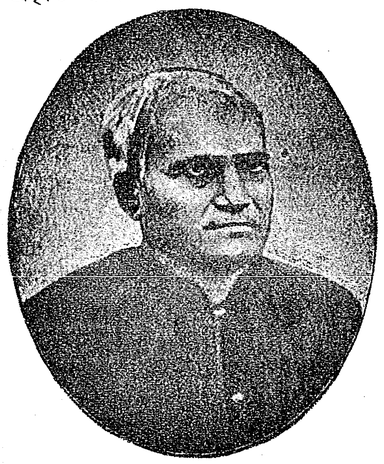

নবকৃষ্ণ ঘোষ

পয়সা উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই তাঁহার যশ চতুর্দ্দিকে কীর্ত্তিত হইতে লাগিল। পরে তিনি নিজে সখের দল করিলেন এবং শেষে তাহা পেশাদারীতে পরিণত হইল। তিনি কবিওয়ালাদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত বিরহ, সখীসংবাদ, লহর, সপ্তমী প্রভৃতি গানগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যের অমূল্য রত্নস্বরূপ। ১২৩৫ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

* * *

সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস—১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে রাণাঘাট মাতুলালয়ে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম গিরিশচন্দ্র বিশ্বাস। কলিকাতার London Missionary Society বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থ প্রবেশ করেন। লেখাপড়ায় মনোযোগী না হওয়ায় এবং খ্রীষ্টানগণের সহিত ঘনিষ্ঠতা করায় পিতার সহিত মনোবিবাদ ঘটে। তৎপরে গৃহত্যাগ করিয়া য়্যাস্টন্ সাহেবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ১৭ বৎসর বয়সে B S. N. কোম্পানীর একখানি জাহাজে Assistant Steward রূপে ইনি লণ্ডনে যান এবং সেইখানে সংবাদপত্র বিক্রয় ও পরে কুলীর কার্য্য করিয়া অতি কষ্টে দিন যাপন করেন। এই সময় ইনি রসায়ন, গণিত, জ্যোতিষ, ল্যাটিন্ ও গ্রীক্ কিছু কিছু শিক্ষা

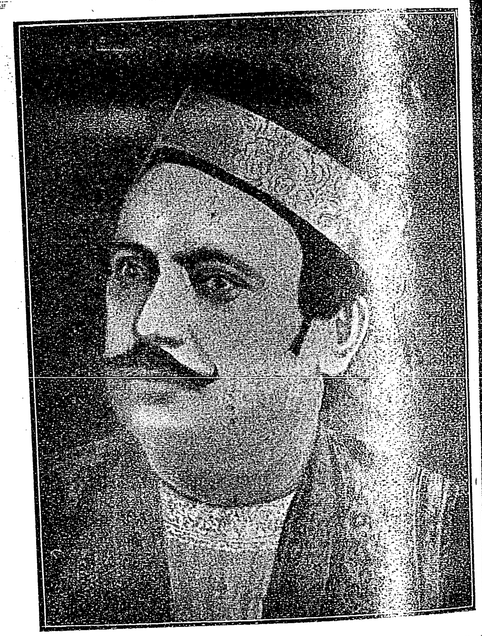

রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

করেন। তৎপরে তিনি একটি সার্কাস্ কোম্পানীতে নিযুক্ত হন। হিংস্র পশু দমন শিক্ষা করিয়া ইনি বহু প্রদর্শনীতে বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করেন। সার্কাস্ দলের সহিত তিনি জার্ম্মানীতে গমন করেন। তথায় জামবাক্স পরে জোগ কার্ল কর্ত্তৃক পশু দমন কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই সময় তথাকার জনৈক ভদ্রবংশসম্ভূতা যুবতী সার্কাসে সুরেশের সহিত ক্রীড়া করিত। উভয়ের মধ্যে প্রণয়সঞ্চার হওয়ায় যুবতীর আত্মীয়গণ বিরক্ত হইয়া সুরেশের প্রা

সংহার করিবার সঙ্কল্প করিলে তিনি একটী বড় সার্কাস্ কোম্পানীর অধীনে কর্ম্ম লইয়া আমেরিকা পলায়ন করেন। এখানে আসিয়া অনেক ভাষা শিক্ষা করিলেন এবং সার্কাস্ পরিত্যাগ করিয়া পশুশালার অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিলেন। স্থানীয় একজন চিকিৎসকের কন্যার সহিত ইহাঁর প্রণয় জন্মিল। তাঁহারই ইচ্ছায় ইনি ব্রেজিল্ গভর্ণমেণ্টের অধীনে সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করিলেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি চিকিৎসক-কন্যাকে বিবাহ করেন। ইনি কর্পোরাল্ হইতে পদাতিক প্রথম সার্জ্জেণ্ট পদে উন্নীত হন। ব্রেজিলের নৌসেনাগণ বিদ্রোহী হইয়া যখন নাথেরয় নগর আক্রমণ

লালমোহন ঘোষ

করে, তখন সুরেশ মাত্র পাঁচটী সেনা লইয়া অসীম সাহসের সহিত শত্রুগণকে পরাভূত করেন। এই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ ইনি প্রথম লেপ্টেন্যাণ্ট্ পদে উন্নীত হন। ইহার পর হইতে ইনি রাজ্যের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিলেন। ইনি চিকিৎসাশাস্ত্রে অস্ত্রোপচারে বিলক্ষণ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন। ইনি ক্রমে লেপ্টেন্যাণ্ট্ কর্ণেল্ ও মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে কর্ণেলের পদ লাভ করেন। ১৯০৫ সালে রাইও দে জেনারো নগরে ইহাঁর মৃত্যু হয়। যুদ্ধকার্য্যে বাঙ্গালীর এরূপ প্রতিষ্ঠালাভ ইদানিং আর দেখা যায় নাই।

* * *

রামপ্রসাদ সেন—অনুমান ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে কুমারহট্ট (বর্ত্তমান হালিসহর) গ্রামে ইহাঁর জন্ম হয়। পিতার নাম রামরাম সেন। রামপ্রসাদ সংস্কৃত, বাঙ্গালা, পারসী ও হিন্দি ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় অভিলাষানুরূপ বিদ্যালাভ করিতে পারেন নাই। তিনি অর্থোপার্জ্জনের জন্য এক ধনীর গৃহে মুহুরিগিরি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার হৃদয় ভক্তিপ্রবণ ছিল। তিনি অবকাশ পাইলেই শ্যামা-বিষয়ক গীত রচনা করিতেন এবং হিসাবের খাতায় লিখিয়া

রাজকৃষ্ণ রায়

রাখিতেন। একদিন তাঁহার সহৃদয় গুণগ্রাহী ধর্ম্মপরায়ণ প্রভু খাতায়—

"আমায় দাও মা তবিলদারি,
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করি।"

ইত্যাদি গানটী দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং রামপ্রসাদকে মাসিক ৩০৲ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া তাঁহাকে স্বগৃহে যাইয়া ধর্ম্মচিন্তা ও শ্যামা-বিষয়ক গীত রচনা করিবার অনুমতি প্রদান করেন। তৎপরে রামপ্রসাদ বাটীতে থাকিয়া একান্ত মনে তাহাই করিতে থাকেন। নদীয়ার গুণগ্রাহী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদের গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে একশত বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করেন এবং তাঁহার

রচিত "বিদ্যাসুন্দর" কাব্য উপহার পাইয়া তাঁহাকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি প্রদান করেন। তাঁহার রচিত ভাবপূর্ণ মধুর শ্যামা-বিষয়ক সঙ্গীতগুলি দুর্লভ বস্তু। রামপ্রসাদ তান্ত্রিক উপাসক ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সাধক, ভক্তিমূলক গীতরচক ও গায়ক বাঙ্গালায় আর কেহ জন্মিয়াছেন কি না সন্দেহ। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দেহান্ত ঘটে।

* * *

গৌরী সেন—অনুমান তিন শত বৎসর পূর্ব্বে হুগলীতে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম হরেকৃষ্ণ মুরলীধর সেন। গৌরী প্রথম সামান্য মূলধনে একটী ব্যবসায় আরম্ভ করেন। পরে কলিকাতায় বড়বাজারে বাস স্থাপন

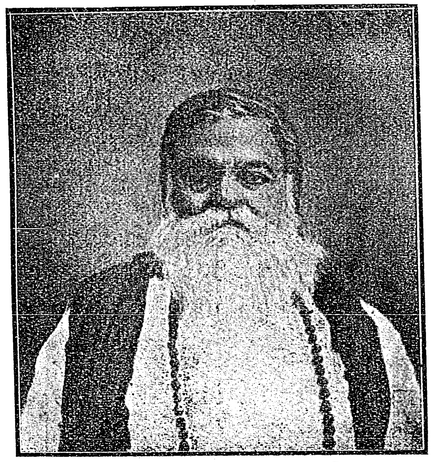

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

করিয়া তথাকার বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী বৈষ্ণবচরণ শেঠের কারবারের অংশীদার হইয়া কার্য্য করিতে থাকেন। তিনি প্রধানতঃ শস্য ও ধাতুদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া মেদিনীপুর অঞ্চলে চালান দিতেন। কথিত আছে একবার তিনি সাতখানি নৌকা বোঝাই করিয়া রাং চালান দেন। তথাকার কর্ম্মচারী ভৈরবচন্দ্র দত্ত, নৌকা পৌঁছিলে দেখিলেন, নৌকাগুলি রাং নহে, রূপা পূর্ণ। তিনি তৎক্ষণাৎ উহা ফেরৎ পাঠাইলেন। এদিকে নৌকা ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই গৌরী স্বপ্নে দেখিলেন দেবানুগ্রহে তাঁহার প্রেরিত রাং রূপা হইয়া গিয়াছে। পরে তিনি এই রৌপ্য বিক্রয় করিয়া প্রচুর ধন লাভ করেন এবং প্রত্যাদেশ অনুসারে হুগলীতে নিজগৃহে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া শিবস্থাপনা করেন ও যথোচিত সেবার ব্যবস্থা করেন। অপরিমিত ধনোপার্জ্জন করিয়াও তিনি কখন গর্ব্বিত হন নাই এবং দান-ধ্যানাদির দ্বারা ধনের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ দানশীলতার সুযোগ লইয়া অনেক অসাধু ব্যক্তিও তাঁহাকে প্রতারণা করিয়াছেন। কেহ অর্থাভাবে আরব্ধ কার্য্য সম্পাদনে অসমর্থ হইলে গৌরী সেনের নিকট প্রার্থী হইলেই তিনি তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতেন। ইহা হইতেই "লাগে টাকা দিবে গৌরী সেন" কথাটির সৃষ্টি হইয়াছে।

* * *

সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি একজন অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন। ইনি হাইকোর্টে ওকালতী করিতেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য হইয়া শিক্ষা বিষয়ে ইনি বহু উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। ইনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙ্গালী রেজিষ্ট্রার। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন্ সভা স্থাপনে ইনি অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ইনি একজন সদস্য ছিলেন, তথায় তিনি নির্ভীকতার অনেক পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বিনয়ী ও মিষ্টভাষী ছিলেন। ১৯০৭ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

* * *

রসিকলাল দত্ত—ইনি ডাক্তার আর, এল, দত্ত (Lieut Col Dr. R. L. Dutt) নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। হুগলী জেলার আঁটপুর গ্রামে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর জন্ম হয়। মেডিক্যাল্ কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া তিনি চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তৎপরে আই-এম্ এস পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত যান। তখন অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য এই পরীক্ষা স্থগিত থাকায় তিনি এডিন্‌বরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করিয়া এম-বি পরীক্ষা দেন এবং তাহাতে উত্তীর্ণ হইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিছু দিন পরে তিনি পুনরায় বিলাত যাইয়া আই-এম্-এস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী চাকুরী লইয়া ফিরিয়া

রজনীকান্ত গুপ্ত

আইসেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মেডিক্যাল কলেজের অন্যতম অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময় হইতেই সুচিকিৎসক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে; এবং প্রচুর অর্থাগম হইতে আরম্ভ হয়। তৎপরে তিনি বহু স্থানে সিভিল্ সার্জ্জনের কার্য্য করিয়া শেষে অবসর লইয়া কলিকাতায় চিকিৎসা আরম্ভ করেন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেও অতিশয় স্বজাতি- ও স্বজনবৎসল ছিলেন। স্বজাতীয় বিধবাদিগের সাহায্যার্থ তিনি একটী সাহায্য-ভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৯২৪ সালে তিনি পরলোক প্রাপ্ত হন।

* * *

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—১২৫০ সালে কলিকাতায় ইঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম নীলকমল ঘোষ। ইনি বিদ্যালয়ে প্রবেশিকার পাঠ্য পর্য্যন্ত পড়িয়া বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। তৎপরে চারি বৎসর কাল বাটীতে অবিশ্রান্ত অধ্যয়ন করেন। প্রথমে কয়েকজন বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া ইনি বাগ্-বাজারে একটি থিয়েটারের দল গঠন করেন এবং "সধবার একাদশী" অভিনয়ে তিনি নিমচাঁদের ভূমিকা গ্রহণ করেন। ইহাই পরে ন্যাসানাল্ থিয়েটার নাম প্রাপ্ত হয়। ইহাতে টিকিট বিক্রয় আরম্ভ হইলে গিরিশচন্দ্র ইহার সংস্রব ত্যাগ করেন, কিন্তু পরে গ্রেট্ ন্যাসন্যাল্ থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত

রাজা শ্রীনাথ রায়

হইলে তিনি ইহাতে অবৈতনিক ভাবে যোগদান করেন। পরে এক শত টাকা বেতনে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তৎপরে এমারেল্ড, ষ্টার, মিনার্ভা, ক্লাসিক ও কোহিনুর থিয়েটারে যোগদান করেন এবং অভিনয়ও করেন; অনেক সময় অধ্যক্ষতাও গ্রহণ করিয়াছিলেন। নাট্যশালার সহিত সংযুক্ত হইবার পর হইতেই তিনি নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং সর্ব্বসমেৎ প্রায় ৭০খানি নাটক, প্রহসন, গীতিনাট্য প্রণয়ন করেন। ইহাঁর নাটকগুলি বঙ্গীয় নাট্যজগতে যুগান্তর উপস্থিত করে। ইহাঁর ন্যায় সুনিপুণ অভিনেতাও কমই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি রামকৃষ্ণ দেবের

একজন ভক্ত শিষ্য ছিলেন। ১৩১৮ সালে ইহাঁর পরলোক প্রাপ্তি ঘটে।

* * *

মদনমোহন তর্কালঙ্কার—১২২২ সালে নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী বিল্বগ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম রামধন চট্টোপাধ্যায়। সংস্কৃত কলেজে দর্শন, স্মৃতি, সাহিত্য প্রভৃতিতে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া প্রথম গভর্ণমেণ্টের পাঠশালায় ১৫৲ টাকা বেতনে কার্য্য করেন। পরে বারাসত গভর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়, ফোর্ট্ উইলিয়ম কলেজ এবং কৃষ্ণনগর কলেজে প্রধান পণ্ডিতের কার্য্য করিয়া কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যাধ্যাপকের কার্য্য করেন। কলিকাতার জলবায়ু অসহ্য হওয়ায় দেড় শত টাকা বেতনে মুর্শীদাবাদে

এ, আপ্‌কার

জজ্‌পণ্ডিতের কার্য্য করেন এবং ছয় বৎসর এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া শেষে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হন। অধ্যয়ন কাল হইতেই ইঁহার বাঙ্গালা রচনায় দক্ষতা জন্মে। সেই সময় তিনি 'বাসবদত্তা' ও 'রসতরঙ্গিনী' নামে দুইখানি কাব্য রচনা করেন। ইঁহার রচিত ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ শিশুশিক্ষা সর্ব্বজনবিদিত। "সর্ব্বশুভঙ্করী" নামে একখানি মাসিক পত্রিকাও ইনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১২৬৪ সালে ইনি বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করেন।

* * * *

নবকৃষ্ণ ঘোষ—ইনি রামশর্ম্মা নামে খ্যাত ছিলেন। পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত ঘোষ বংশে ১৮৩৭ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। ইংরাজী ভাষায় ইঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের ভারত আগমন কালে ইংরেজী কবিতা রচনায় ইনি সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার লাভ করেন। ইহার কিছু পরে A Reply to Moncrieff's Fidelity of Conscience নামক তাঁহার একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। তাঁহার রচিত The ode in welcome to Prince Albert বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছিল। প্রিন্স এলবার্টের কথামত উহার কয়েকখণ্ড মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। তাঁহার লিখিত বহু সংখ্যক ইংরাজী কবিতার মধ্যে কতকগুলি একত্র করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় প্রথম জ্যোতিষগ্রন্থ 'জ্যোতিষপ্রকাশ' তিনি প্রকাশ করেন। তিনি একজন

জেনসেট্‌জি ফ্রেমজি ম্যাডান্

সামান্য কেরাণী হইতে Assistant of the Accountant General, Bengal পদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি দয়া ও দানশীলতা প্রভৃতি বহু গুণের আধার ছিলেন।

* * * *

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়—১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার সূর্য্যকুমার ঠাকুরের ইনি দৌহিত্র। ডিরোজিও সাহেবের ইনি অন্যতম প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ইনি প্রথম কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর ট্যাক্স কলেক্টর ও তৎপরে বাঙ্গালার নবাব নাজিমের দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত হন। পরে বর্দ্ধমানের ডেপুটি কলেক্টর হন। বিশেষ কারণে তিনি কিছুদিন লোক-নয়নের অন্তরালে

থাকিয়া ১৮৫১ অথবা ৫২ সালে লক্ষ্ণৌ নগরে গমন করেন। সিপাহি-বিদ্রোহের সময় গভর্ণমেণ্টের সহায়তা করার জন্য মর্ড্ ক্যানিং ইঁহাকে রায়বেরেলির অন্তর্গত শঙ্করপুর তালুক জায়গীর স্বরূপে প্রদান করেন এবং ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে রাজা উপাধি দান করেন। ইঁহারই চেষ্টায় 'আউধ তালুকদার এসোসিয়েসন্' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইনিই উহার প্রথম সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। লক্ষ্ণৌ টাইম্‌স্ নামক সংবাদ-পত্র ইনি ক্রয় করিয়া উহাকে তালুকদারদিগের মুখ-পত্র রূপে পরিণত করেন। কলিকাতার বেথুন্ বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নতি-কল্পে ইনি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

* * * *

লালমোহন ঘোষ—ইনি স্বনামপ্রসিদ্ধ মনোমোহন ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনিও ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইংলণ্ডে অবস্থিতিকালে তথায় ভারতের অভাব অভিযোগের কথা ওজস্বিনী ভাষায় বহু স্থানে বক্তৃতা করিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন। ইনি ইংলণ্ডে উন্নতিশীল দলের প্রতিনিধিরূপে একবার পার্লামেণ্টে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়া অসফলকার্য্য হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশে দেশীয় সংবাদ-পত্র বিষয়ক আইন ও ইলবার্ট্ বিল সম্বন্ধে আন্দোলন উপস্থিত হইলে ইনি বহু স্থানে নির্ভীকতার সহিত আপনার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ইঁহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে।

* * *

রাজকৃষ্ণ রায়—১২৬২ সালে ইঁহার জন্ম হয়। কবি ও নাট্যকার রূপে তিনি অশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত বহুসংখ্যক নাটক, উপন্যাস, কাব্য প্রভৃতির মধ্যে 'প্রহ্লাদচরিত্র,' 'নরমেধ যজ্ঞ', 'লয়লা মজনু', 'হিরণ্ময়ী' 'কিরণ্ময়ী', সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বঙ্গসাহিত্যে বিশেষ পরিচিত। তাঁহার পূর্ব্বে সংখ্যায় এত অধিক পুস্তক খুব কম লোকই প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার রচিত নাটকগুলির মধ্যে কয়েকখানি আজিও প্রশংসার সহিত কলিকাতার শ্রেষ্ঠ নাট্যালয়ে অভিনীত হইতেছে। ১৩০০ সালে তাঁহার পরলোকান্তর প্রাপ্তি ঘটে।

* * * *

সাতুরায়—১২০৯ সালে নদীয়া জেলার বেঁচিগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম পীতাম্বর রায়। ইনি একজন অবৈতনিক বাঁধনদার ছিলেন। কবিওয়ালাদের গান বাঁধিয়া দিতেন, কিন্তু কোন পারিশ্রমিক লইতেন না। কবি-ওয়ালা ভোলা ময়রাকে ইনি অনেক গান বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। গরাণহাটার সখের দলের অধিকারী শিবচন্দ্র সরকার শান্তিপুরে গিয়া তাঁহার নিকট হইতে গান লইয়া আসিতেন। ইনি শেষ বয়সে পালচৌধুরীদিগের পক্ষে বারাসত মহকুমায় মোক্তারী কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১২৭৩ সালে ইঁহার প্রাণত্যাগ ঘটে।

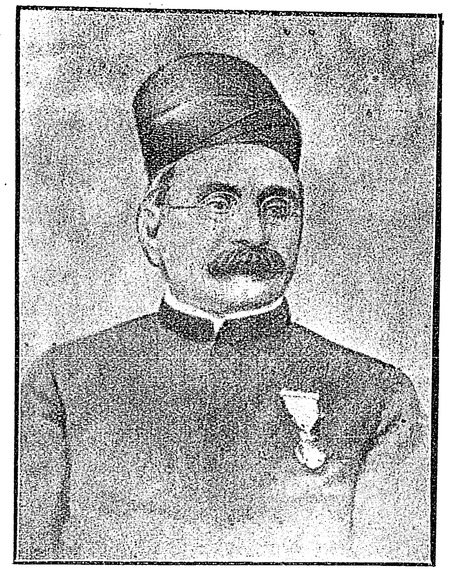

রস্তম্‌জী ধান্‌জিভাই মেটা

* * * *

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়—১২৫৪ সালে ২৪ পরগণার অন্তর্গত রাহুতা গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। বিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার সুযোগ না পাইলেও তিনি নিজের পরিশ্রম, উৎসাহ ও অধ্যবসায়-বলে ইংরাজী, সংস্কৃত, হিন্দী, উড়িয়া, পারসী ও উর্দ্দু শিখিয়াছিলেন। ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়েও তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞানলাভ হইয়াছিল। তিনি ১৮৲ টাকা বেতনে একটী সামান্য কার্য্যে প্রবেশ করিয়া শেষে ৬০০৲ টাকা বেতনে

একজন ভক্ত শিষ্য ছিলেন। ১৩১৮ সালে ইহাঁর পরলোক প্রাপ্তি ঘটে।

* * *

মদনমোহন তর্কালঙ্কার—১২২৩ সালে নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী বিল্বগ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম রামধন চট্টোপাধ্যায়। সংস্কৃত কলেজে দর্শন, স্মৃতি, সাহিত্য প্রভৃতিতে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া প্রথম গভর্ণমেণ্টের পাঠশালায় ১৫৲ টাকা বেতনে কার্য্য করেন। পরে বারাসত গভর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়, ফোর্ট্ উইলিয়ম কলেজ এবং কৃষ্ণনগর কলেজে প্রধান পণ্ডিতের কার্য্য করিয়া কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যাধ্যাপকের কার্য্য করেন। কলিকাতার জলবায়ু অসহ্য হওয়ায় দেড় শত টাকা বেতনে মুর্শীদাবাদে

এ, আপ্‌কার

জজ্‌পণ্ডিতের কার্য্য করেন এবং ছয় বৎসর এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া শেষে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হন। অধ্যয়ন কাল হইতেই ইঁহার বাঙ্গালা রচনায় দক্ষতা জন্মে। সেই সময় তিনি 'বাসবদত্তা' ও 'রসতরঙ্গিনী' নামে দুইখানি কাব্য রচনা করেন। ইঁহার রচিত ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ শিশুশিক্ষা সর্ব্বজনবিদিত। "সর্ব্বশুভঙ্করী" নামে একখানি মাসিক পত্রিকাও ইনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১২৬৪ সালে ইনি বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করেন।

* * * *

নবকৃষ্ণ ঘোষ—ইনি রামশর্ম্মা নামে খ্যাত ছিলেন। পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত ঘোষ বংশে ১৮৩৭ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। ইংরাজী ভাষায় ইঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রিন্স অব্ ওয়েলসের ভারত আগমন কালে ইংরেজী কবিতা রচনায় ইনি সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার লাভ করেন। ইহার কিছু পরে A Reply to Moncrieff's Fidelity of Conscience নামক তাঁহার একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। তাঁহার রচিত The ode in welcome to Prince Albert বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছিল। প্রিন্স এলবার্টের কথামত উহার কয়েকখণ্ড মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। তাঁহার লিখিত বহু সংখ্যক ইংরাজী কবিতার মধ্যে কতকগুলি একত্র করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় প্রথম জ্যোতিষগ্রন্থ 'জ্যোতিষপ্রকাশ' তিনি প্রকাশ করেন। তিনি একজন

জেনসেট্‌জি ফ্রেমজি ম্যাডান্

সামান্য কেরাণী হইতে Assistant of the Accountant General, Bengal পদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি দয়া ও দানশীলতা প্রভৃতি বহু গুণের আধার ছিলেন।

* * * *

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়—১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার সূর্য্যকুমার ঠাকুরের ইনি দৌহিত্র। ডিরোজিও সাহেবের ইনি অন্যতম প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ইনি প্রথম কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর ট্যাক্স কলেক্টর ও তৎপরে বাঙ্গালার নবাব নাজিমের দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত হন। পরে বর্দ্ধমানের ডেপুটি কলেক্টর হন। বিশেষ কারণে তিনি কিছুদিন লোক-নয়নের অন্তরালে

থাকিয়া ১৮৫১ অথবা ৫২ সালে লক্ষ্ণৌ নগরে গমন করেন। সিপাহি-বিদ্রোহের সময় গভর্ণমেণ্টের সহায়তা করার জন্য লর্ড ক্যানিং ইঁহাকে রায়বেরেলির অন্তর্গত শঙ্করপুর তালুক জায়গীর স্বরূপে প্রদান করেন এবং ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে রাজা উপাধি দান করেন। ইঁহারই চেষ্টায় 'আউধ তালুকদার এসোসিয়েসন্' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইনিই উহার প্রথম সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। লক্ষ্ণৌ টাইম্‌স্ নামক সংবাদপত্র ইনি ক্রয় করিয়া উহাকে তালুকদারদিগের মুখ-পত্র রূপে পরিণত করেন। কলিকাতার বেথুন্ বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নতি-কল্পে ইনি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

* * * *

লালমোহন ঘোষ—ইনি স্বনামপ্রসিদ্ধ মনোমোহন ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনিও ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইংলণ্ডে অবস্থিতিকালে তথায় ভারতের অভাব অভিযোগের কথা ওজস্বিনী ভাষায় বহু স্থানে বক্তৃতা করিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন। ইনি ইংলণ্ডে উন্নতিশীল দলের প্রতিনিধিরূপে একবার পার্লামেণ্টে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশে দেশীয় সংবাদপত্র বিষয়ক আইন ও ইলবার্ট্ বিল সম্বন্ধে আন্দোলন উপস্থিত হইলে ইনি বহু স্থানে নির্ভীকতার সহিত আপনার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ইঁহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে।

* * *

রাজকৃষ্ণ রায়—১২৬২ সালে ইঁহার জন্ম হয়। কবি ও নাট্যকার রূপে তিনি অশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত বহুসংখ্যক নাটক, উপন্যাস, কাব্য প্রভৃতির মধ্যে 'প্রহ্লাদচরিত্র,' 'নরমেধ যজ্ঞ', 'লয়লা মজনু', 'হিরণ্ময়ী' 'কিরণ্ময়ী', সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বঙ্গসাহিত্যে বিশেষ পরিচিত। ইহাঁর পূর্ব্বে সংখ্যায় এত অধিক পুস্তক খুব কম লোকই প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার রচিত নাটকগুলির মধ্যে কয়েকখানি আজিও প্রশংসার সহিত কলিকাতার শ্রেষ্ঠ নাট্যালয়ে অভিনীত হইতেছে। ১৩০০ সালে তাঁহার দেহান্তর প্রাপ্তি ঘটে।

* * * *

সাতুরায়—১২০৯ সালে নদীয়া জেলার বেঁচিগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম পীতাম্বর রায়। ইনি একজন অবৈতনিক বাঁধনদার ছিলেন। কবিওয়ালাদের গান বাঁধিয়া দিতেন, কিন্তু কোন পারিশ্রমিক লইতেন না। কবিওয়ালা ভোলা ময়রাকে ইনি অনেক গান বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। গরাণহাটার সখের দলের অধিকারী শিবচন্দ্র সরকার শান্তিপুরে গিয়া তাঁহার নিকট হইতে গান লইয়া আসিতেন। ইনি শেষ বয়সে পালচৌধুরীদিগের পক্ষে বারাসত মহকুমায় মোক্তারী কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১২৭৩ সালে ইঁহার প্রাণত্যাগ ঘটে।

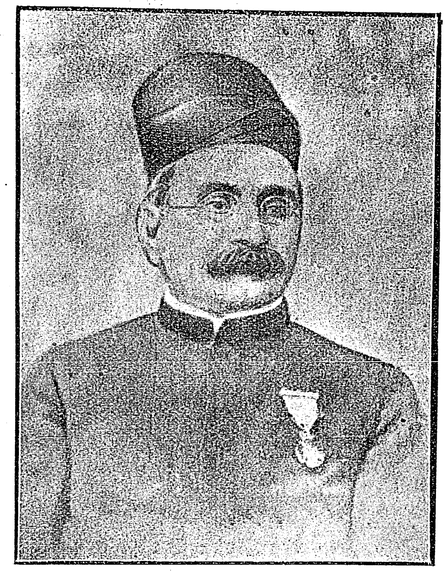

রস্তম্‌জী ধান্‌জিভাই মেটা

* * * *

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়—১২৫৪ সালে ২৪ পরগণার অন্তর্গত রাহুতা গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। বিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার সুযোগ না পাইলেও তিনি নিজের পরিশ্রম, উৎসাহ ও অধ্যবসায়-বলে ইংরাজী, সংস্কৃত, হিন্দী, উড়িয়া, পারসী ও উর্দ্দু শিখিয়াছিলেন। ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়েও তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞানলাভ হইয়াছিল। তিনি ১৮৲ টাকা বেতনে একটী সামান্য কার্য্যে প্রবেশ করিয়া শেষে ৬০০৲ টাকা বেতনে

যাদুঘরের তত্ত্বাবধায়কের পদ প্রাপ্ত হন। ইনি উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে কৃষিবাণিজ্যের অফিসে কেরাণীগিরি কার্য্য করিবার কালে দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিকল্পে বিশেষ রূপে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে অনেক দেশীয় শিল্প রক্ষা পায়। বড় বড় রেল ষ্টেশনে ভারতীয় কারুকার্য্যের যে সকল দোকান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা তাঁহারই চেষ্টায় প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ নিরাকরণকল্পে গাজরের চাষ দ্বারা যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন। ঐ সকল দেশে শিল্পোন্নতির জন্য যথেষ্ট

হিরজিভাই মানকৃজী রস্তমজী

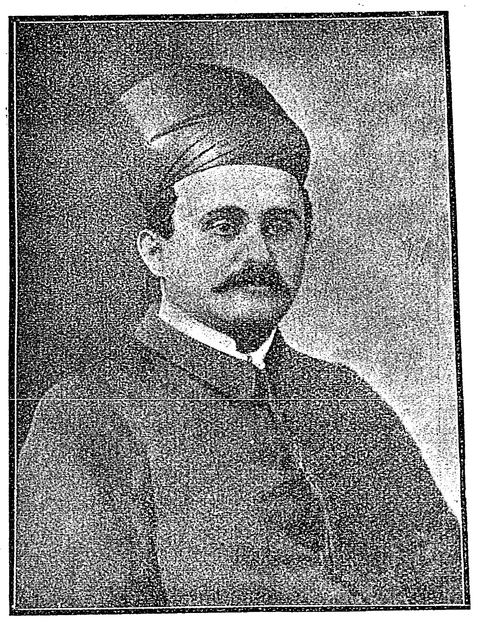

চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং বিশেষ কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বিলাতে প্রদর্শনী আরম্ভ হইলে তিনি তথায় গমন করেন এবং ইউরোপের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া Visit to Europe নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মিউজিয়মে কার্য্য করিবার কালে গভর্ণমেণ্টের অনুরোধে 'Art Manufacturers of India' নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 'জন্মভূমি' 'Wealth of India' প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি সোনা, লোহা, কয়লা, প্রভৃতি বিষয় বহু সারবান প্রবন্ধ লেখেন। বিদ্যালয়পাঠ্য ও অপ্রাপ্ত-বয়স্ক বালকবালিকাদের জন্যও কতিপয় গল্পের বহি লিখিয়া-ছিলেন। 'বিশ্বকোষ' নামক সুবৃহৎ অভিধানখানি ইনি এবং ইহাঁর অগ্রজ রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম আরম্ভ করেন। ১৩২৬ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

* * *

তনুবাবু—হাটখোলার দত্তবংশের খ্যাতনামা মদন-মোহন দত্তের জ্যেষ্ঠপুত্র রামতনু দত্তকে লোকে তনুবাবু বলিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নীলমণি হালদার, গোকুল মিত্র, রাজা রাজকৃষ্ণ দেব, ছাতুবাবু, দর্পনারায়ণ ঠাকুর, রাজা সুখময় প্রভৃতি আটজন বাবু বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের 'আটবাবু' বলিত। ইঁহাদের মধ্যে তনুবাবুই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ঐ বাবুদিগের মধ্যে প্রত্যেকই নিজেকে অন্য বাবুদের অপেক্ষা আপনাকে অধিক অমিতব্যয়ী প্রমাণ করিবার জন্য ব্যস্ত থাকিতেন। বাবুগিরির খাতিরে তাঁহারা অজস্র অর্থব্যয় করিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিবার চেষ্টা করিতেন। তনুবাবুর পরবর্ত্তী কালেও বাবুয়ানার উপমা দিবার জন্য তনুবাবুর সম্বন্ধে কোন একটী ঘটনা উল্লেখ করিয়া তাঁহার বাবুগিরী সম্বন্ধে মহিমা প্রচার করিত। কথিত আছে ৪০৲।৫০৲ টাকা দামের ঢাকাই কাপড় তিনি ব্যবহার করিতেন এবং একবার ব্যবহারের পর তাহা ত্যাগ করিতেন। কোমরে না আঘাত লাগে এইজন্য সেই স্থানের পাড় কাটিয়া ফেলা হইত। তাঁহার বাটীর উপর হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত সমস্ত অংশ প্রত্যহ আতর ও গোলাপজল দ্বারা ধৌত করা হইত। তাঁহার বাটীতে স্বর্ণ রৌপ্য ভিন্ন পিতল কাঁসার তৈজসাদি ব্যবহার হইত না। শুনা যায় প্রত্যহ শতাবধি স্বর্ণ ও রৌপ্য থালা তাঁহার বাটীতে আহারান্তে ধৌত ও মার্জ্জিত হইবার জন্য উঠানে পড়িত। লোকে তাঁহাকে "বাবু তো বাবু তনুবাবু" বলিয়া সম্বোধন করিত।

* * *

ভোলা ময়রা—প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা ভোলা ময়রার প্রকৃত নাম ভোলানাথ দে, সম্ভবতঃ ১৭৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কৃপারাম। বাগবাজারে বারুদখানার ঠিক দক্ষিণ দিকে তাঁহার খাবারের দোকান ছিল। তাঁহার জন্মস্থান সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ

বলেন কলিকাতা, আবার কেহ বলেন শ্রীরামপুর, কেহ বলেন গুপ্তিপাড়া। তিনি লেখাপড়া সামান্য জানিলেও পারসী, সংস্কৃত ও হিন্দীভাষায় তাঁহার কিছু অধিকার ছিল। তিনি একজন সুরসিক কবি ছিলেন। সমাজের দোষ ত্রুটি লক্ষ্য করিয়া শ্লেষাত্মক গান বাঁধিতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। খুব সম্ভব ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহাদের বংশের গঙ্গাময়রা ভূতের রোজা বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

* * *

হরু ঠাকুর—ইহাঁর প্রকৃত নাম হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী। ১১৫৪ সালে কলিকাতার সিমুলিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কল্যাণচন্দ্র দীর্ঘাঙ্গী। হরেকৃষ্ণ লেখাপড়া জানিতেন না, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার কবিত্ব-শক্তির অভাব ছিল না। অর্থোপার্জ্জনের জন্য তিনি কবির দল করিয়াছিলেন। রঘুনাথ দাস নামক অপর একজন কবিওয়ালার নিকট তাঁহার স্বরচিত গানগুলি সংশোধন করাইয়া লইয়া গাওনা করিতেন। তাঁহার কবির দল যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল এবং ইহা দ্বারা তাঁহার অর্থাগমও খুব হইয়াছিল। রাম বসুর যেমন বিরহ গানের প্রসিদ্ধি ছিল, হরুঠাকুরের সখীসংবাদও তদ্রূপ ছিল। সমস্যা পূরণেও তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। মহারাজা নবকৃষ্ণের সভায় বহুবার পণ্ডিতমণ্ডলীর সম্মুখে বহু সমস্যা পূরণ করিয়া হরেকৃষ্ণ প্রচুর পুরস্কার ও যশঃ লাভ করিয়াছেন। ১২১৯ সালে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়।

* * *

সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী—ইনি ডাক্তার গুডিভ্ চক্রবর্ত্তী নামে খ্যাত ছিলেন। ১৮২৪ সালে ঢাকা জেলার কানসার নামক ক্ষুদ্র গ্রামে ইহাঁর জন্ম হয়। পিতার নাম রাধামাধব চক্রবর্ত্তী। ইনি কলিকাতার হেয়ার স্কুলে বৃত্তিলাভ করিয়া জুনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন। কলেজের অন্যতম অধ্যাপক গুডিভ্ সাহেব ইহাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে গভর্ণমেণ্ট হইতে একটি বৃত্তি পাইয়া ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে সূর্য্যকুমার চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার্থ বিলাত যাত্রা করেন। ১৮৫০ সালে প্রশংসার সহিত এম-ডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ফিরিয়া আইসেন এবং মেডিক্যাল্ কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পাঁচবৎসর পরে বেঙ্গল্ মেডিক্যাল্ সার্ভিসে চাকরী প্রাপ্ত হন। ইহার পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালী কভ্ন্যাণ্টেড্ সার্ভিসে প্রবেশ করেন নাই। ইনি একজন সুচিকিৎসক বলিয়া খ্যাত ছিলেন। বিলাতে অবস্থানকালে ইনি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং তথায় একটী ইংরাজ মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সূর্য্যকুমারের পরলোক প্রাপ্তি হন।

* * *

মতিলাল রায়—বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ভাতশালা গ্রামে ১২৩৯ সালে ইঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম মনোহর

রায় বদ্রীদাস বাহাদুর

রায়। ইনি এণ্ট্রেন্স্ স্কুলে কিছু দূর পর্য্যন্ত পড়িয়া প্রথম কলিকাতা যোড়াসাঁকো থানায় কিছুদিন কেরাণীগিরি করিয়া পরে নবদ্বীপের স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তৎপরে জেনারেল্ পোষ্ট অফিসেও কিছুদিন কার্য্য করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার বাঙ্গালা রচনায় ঝোঁক ছিল। পোষ্ট অফিসে কার্য্য করিবার কালে একখানি নাটক রচনা করেন। তৎপরে দোগাছিয়া নিবাসী হরিনারায়ণ রায় চৌধুরীর অনুরোধে যাত্রার দলের নিমিত্ত একখানি নাটক লেখেন এবং তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া মতিলাল একটী

যাত্রার দল বাঁধেন। এই দল ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর স্বয়ং নবদ্বীপে একটী দল প্রতিষ্ঠা করেন। তথায় পোড়ামাতার সম্মুখে দলের প্রথম গাওনা হয়। এই যাত্রার দল ক্রমে শ্রেষ্ঠ দল হইয়া উঠে। বাস্তবিক গোবিন্দ অধিকারী ও রাধাকৃষ্ণ দাসের পর এরূপ খ্যাতি ও অর্থোপার্জ্জন আর কেহ করিতে পারেন নাই। ইনি 'রাম বনবাস', 'রাবণ বধ' 'নিমাই-সন্ন্যাস' প্রভৃতি অনেকগুলি পালা রচনা করিয়াছিলেন। ১৩১৫ সালে কাশীবাসে ইঁহার প্রাণত্যাগ ঘটে।

* * * *

রূপচাঁদ পক্ষী—ইঁহারা দক্ষিণদেশবাসী গৌড়েশ্বর ষড়ঙ্গদেবের বংশসম্ভূত। উড়িষ্যার চিল্কা হ্রদের নিকট ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ বাস করিতেন। পিতা গৌরহরিদাস মহাপাত্র

কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত

কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। ১২২১ সালে ইঁহার জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই ইনি সঙ্গীত-বিদ্যায় অনুরাগী ছিলেন। ইনি বহু শান্তরসাত্মক ও বিদ্রূপাত্মক সঙ্গীত রচনা ও সঙ্গীত দ্বারা যশস্বী হইয়াছিলেন।

* * * *

রজনীকান্ত গুপ্ত—ঢাকা জেলার অন্তর্গত তেওতা গ্রামে ১২৫৬ সালে ইঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম কমলাকান্ত গুপ্ত। কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে ইনি শিক্ষালাভ করেন। অভিভাবকদের ইচ্ছা ও অনুরোধ সত্ত্বেও ইনি সাহিত্যসেবা ত্যাগ করিয়া জাতীয় ব্যবসায় অবলম্বন করেন নাই। সাহিত্যসেবাই ইঁহার জীবনের ব্রত ছিল। পাঠ্যাবস্থাতেই 'ইনি 'জয়দেব চরিত' নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। পরে 'সিপাহিযুদ্ধের ইতিহাস', 'আর্য্যকীর্ত্তি', 'নবভারত' 'ভারতপ্রসঙ্গ' 'ভীষ্মচরিত' 'বীরমহিলা' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেন। কয়েকখানি বিদ্যালয়-পাঠ্য গ্রন্থও ইনি রচনা করিয়াছিলেন। ১৩০৭ সালে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

* * * *

রাজা শ্রীনাথ রায়—ঢাকা জেলার ভাওয়াকুল গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ কুণ্ডুবংশে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এই কুণ্ডুবংশ ইংরাজ আগমনের পূর্ব্ব হইতেই পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যে বিত্তোৎসাহী, দাতা ও ক্রিয়াবান বলিয়া পরিচিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে যখন দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তখন তাঁহাদের দয়ায় সহস্র সহস্র লোকের প্রাণরক্ষা হয়। সেইজন্য তদানীন্তন নবাব কর্ত্তৃক বংশের জ্যেষ্ঠ রাসগোবিন্দ কুণ্ডু 'রায়' উপাধি এবং বাৎসরিক ১৪০০৲ টাকা আয়ের নিষ্কর ভূমি জায়গীর প্রাপ্ত হন। অদ্যবধি সংসারের যিনি জ্যেষ্ঠ তিনি এই 'রায়' উপাধি গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। শ্রীনাথ বাবু প্রথম ঢাকা ও পরে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষালাভ করেন। তিনি ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, রোড্‌সেস্ ও শিক্ষা সমিতির সদস্য ছিলেন। তিনি একনমিক্ মিউজিয়মের ট্রাষ্টী, জুলজিক্যাল্ গার্ডেনের আজীবন সভ্য, ঢাকার মিডফোর্ড হাঁসপাতালের আজীবন গভর্ণর এবং ঢাকার বিভিন্ন স্থানে অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। তাঁহার সহোদর রাজা জানকীনাথ ও রায় সীতানাথ রায় বাহাদুর সহিত মিলিত হইয়া পূর্ব্ব-বঙ্গে চক্ষু-চিকিৎসালয়, সীতাকুণ্ড ওয়াটার ওয়ার্কস ও অন্যান্য বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করেন। তাঁহারা কলিকাতায় দরিদ্রদের জন্য একটী আদর্শ বস্তি বিল্ডিং নির্ম্মাণ করেন। পূর্ব্ব-বঙ্গ ও কলিকাতায় তাঁহাদের বহু ব্যবসায় ও ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান আছে। কলিকাতা ও ঢাকায় একটী ষ্টীমার সার্ভিস্‌ও তাঁহাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজভক্তি ও বহু জনহিতকর কার্য্যের জন্য ১৮৯১ সালে গভর্ণমেণ্ট শ্রীনাথকে রাজোপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁহাদের ন্যায় ধনী বাঙ্গালায় অতি অল্পই আছেন। তাঁহাদের দানের পরিমান ছয় লক্ষ টাকারও অধিক।

* * * *

এ, আপকার—ইনি এলেক্‌জেণ্ডার আরাটুন্ আপকারের পুত্র ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। এই আপ্‌কার বংশ প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী হিসাবে ভারতের সর্ব্বত্র পরিচিত। আপ্‌কার সাহেব বিলাতে শিক্ষালাভ করিয়া ভারতে ফিরিয়া আইসেন এবং ১৮৬৯ সালে পৈত্রিক ব্যবসায়ে অংশীদাররূপে যোগদান করেন। তিনি বেঙ্গল্ চেম্বার্সের সভাপতি, ছোটলাটের কাউন্সিলের সদস্য ও কলিকাতা বন্দরের কমিশনর ছিলেন। তিনি ১৯০৫ সালে কলিকাতার সেরিফ্ হন এবং পরবৎসর গভর্ণমেণ্ট্ কর্ত্তৃক C. S. I. উপাধিতে ভূষিত হন।

* * * *

জেম্‌সেট্‌জি ফ্রেমজি ম্যাডান্—১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। পার্শী বেনেভোলেণ্ট্ স্কুলে ইনি শিক্ষালাভ করেন। তিনি প্রথম একটী সামান্য থিয়েটারে অল্প বেতনে কার্য্য গ্রহণ করেন এবং তাঁহার কার্য্যদক্ষতা গুণে ক্রমে তিনি এই থিয়েটার কোম্পানীর একজন অংশীদার হন। তৎপরে তিনি করাচি যান এবং তথায় একটী নীলামে কিছু দ্রব্যাদি কিনিয়া দুই সহস্র টাকা লাভ করেন। তৎপরে তিনি বহু স্থানে নীলামে কেনাবেচা করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করেন। শেষে মিষ্টার সাক্‌লথের (Mr. Sakloth) সহিত কলিকাতায় একটি কারবার আরম্ভ করেন। দুই বৎসর একত্রে কার্য্য করার পর তিনি পৃথক ভাবে নিজস্ব ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং পর পর বহু স্থানে বহু শাখাপ্রশাখা প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। তিনি অন্যান্য কার্য্যে মনোযোগ দিলেও থিয়েটার কখন ছাড়েন নাই। এক্ষণে ভারতের অধিকাংশ বড় বড় সহরে ম্যাডান্ কোম্পানির বায়স্কোপ বা থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত আছে।

* * *

রস্তমজী ধান্‌জিভয় মেটা—১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই নগরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ধান্‌জিভয় বাইরামজী মেটা। ১৮৬০ সালে তাঁহারা সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়া বাসস্থাপন করেন এবং রস্তমজী কলিকাতাতেই শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ইনি ইংলণ্ড ও ইউরোপের বহু দেশ ভ্রমণ করেন। ব্যবসায়-কার্য্যে তিনি বিশেষ দক্ষতালাভ করেন এবং তাঁহারই উৎসাহে "এম্প্রেস্ অব্ ইণ্ডিয়া" নামক সূতার কল প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি কলিকাতার সেরিফ্, বেঙ্গল্ ন্যাস্‌ন্যাল্ চেম্বার অব্ কমার্শের সহঃসভাপতি, অবৈতনিক্ ম্যাজিষ্ট্রেট্, জাষ্টিস্ অব্ দি পিস্, আলিপুরের লোক্যাল ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সভাপতি ও কলিকাতা বন্দরের কমিশনর ছিলেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে পারস্যের সা কর্ত্তৃক তাঁহার কলিকাতার কন্‌সুল্ নিযুক্ত হন। তিনি একজন দানশীল বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক C. I. E. উপাধি প্রাপ্ত হন।

* * *

হিরজীভাই মানকৃজী রস্তম্‌জী—ইহাঁর পিতামহ রস্তমজী কাওয়াসজী গত শতাব্দীর প্রথমাংশে কলিকাতায় আসিয়া

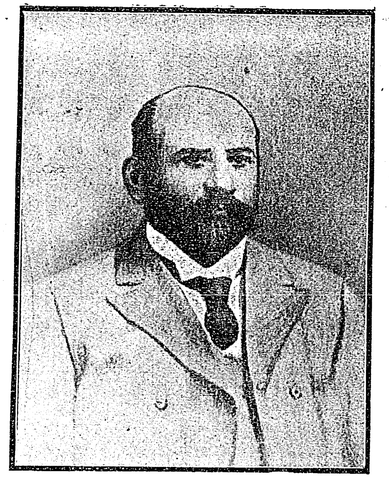

বিহারীলাল গুপ্ত

বাস করেন এবং জাহাজের কাজ ও ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম কলিকাতার সেরিফ্ নিযুক্ত হন। ১৮৭০ সালে তিনি পারস্যের কন্‌সুল ছিলেন। কলিকাতার টাউন্‌হলে তাঁহার একখানি প্রতিকৃতি রক্ষিত আছে। মানকৃজী ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতাতেই তিনি শিক্ষালাভ করেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ন্যাসন্যাল্ ব্যাংকের বোম্বাই শাখায় ডেপুটী একাউণ্টেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত হন। পর বৎসর তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া পিতার ব্যবসায়ে প্রবিষ্ট হন। তিনি কলিকাতায় আসিয়া বহু জনহিতকর কার্য্যে যোগ

দান করেন। তিনি জাষ্টিস্ অব্ দি পিস্, অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট, মিউনিসিপ্যাল্ কমিশনর, মেয়ো হাঁসপাতালের গভর্ণর, প্রেসিডেন্সি ও আলিপুর জেলের এবং আলিপুর Reformatory Schoolএর পরিদর্শক, ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল্ সোসাইটীর কার্য্যনির্ব্বাহক সভ্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, কলিকাতার সেরিফ্ এবং পিতার মৃত্যুর পর পারস্তের কঁন্সুল্ হইয়াছিলেন। তিনিও তাঁহার পিতার ন্যায় পারসী সম্প্রদায়ের নেতা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন। দিল্লির দরবারের সময় তিনি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক C. I. E. উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। ১৯০৪ সালে তাঁহার

শ্রীগোপাল বসু মল্লিক

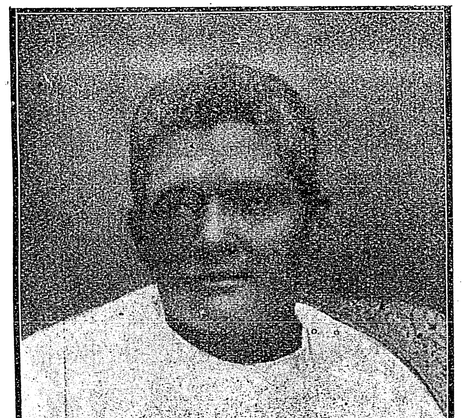

পরলোকপ্রাপ্তি হয়। তিনি সকল সম্প্রদায়ের নিকটই সম্মানিত ছিলেন।

* * *

রায় বদ্রীদাস বাহাদুর—১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম লালা কালকা দাসজী। ১৮৫৩ সালে ইনি কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করেন এবং জহুরির ব্যবসায় আরম্ভ করেন। অতি অল্পদিনের মধ্যে কলিকাতার একজন শ্রেষ্ঠ মণিকার বলিয়া পরিচিত হন। ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ড যুবরাজ রূপে যখন কলিকাতায় আগমন করেন, তখন তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে লাটভবনে হীরা জহরতের সমাবেশ করেন। ১৮৬৩ ৬৪ সালে কলিকাতার ইণ্টারন্যাসন্যাল্ একজিবিশনে তিনি একটী প্রদর্শনী খোলেন। তথায় তিনি প্রথম শ্রেণীর প্রশংসাপত্র লাভ করেন। লর্ড মেয়ো তাঁহাকে মুকিম্ উপাধি প্রদান করেন এবং লর্ড নর্থব্রুক্ মুকিম্ ও রাজকীয় মণিকার বলিয়া গণ্য করেন। ১৮৭৭ সালে দিল্লির দরবারে লর্ড লিটন্ কর্ত্তৃক রায় বাহাদুর উপাধি এবং এম্প্রেস্ অব্ ইণ্ডিয়া পদক প্রাপ্ত হন। মাণিকতলার জৈন মন্দির নামে খ্যাত শ্রীশীতলনাথজীর উদ্যান সম্বলিত মনোহর মন্দির তাঁহারই সম্পত্তি। ইহা কলিকাতার একটী দ্রষ্টব্য বস্তু। বদ্রীদাস করোনেসন দরবারে প্রদর্শনী খুলিয়াও প্রথম শ্রেণীর প্রশংসাপত্র পাইয়াছিলেন। কলিকাতায় পিঁজরাপোলের কথা তিনিই প্রথম চিন্তা করেন এবং তিনিই উহা স্থাপন করেন। তিনি বৃটীশ্ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশনের এবং ন্যাসন্যাল চেম্বার অব্ কমার্সের সদস্য ছিলেন। ভারতের জৈনসম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। [illegible] সালে বোম্বাইপ্রদেশে যে দ্বিতীয় জৈনসভা হইয়াছিল তিনি তাহাতে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

* *

কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত—১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জেলার ভাটপাড়া গ্রামে ইহাঁর জন্ম হয়। তিনি মৈমনসিং ও ঢাকায় শিক্ষালাভ করিয়া ১৮৬৯ অব্দে সিভিল্ সার্ভিস্ পরীক্ষা দিবার জন্য ইংলণ্ড যান এবং উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৭১তে সিভিল্ সার্ভিসে যোগদান করেন। ভারতে ফিরিয়া বা র গঞ্জের সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কলেক্টর পদে নিযুক্ত হন। তৎপরে কতিপয় বৎসর বিভিন্ন স্থানে ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কলেক্টরের কাজ করিয়া ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় বোর্ড অব রেভিনিউতে জুনিয়ার সেক্রেটারি পদে অস্থায়ী-ভাবে কার্য্য করেন এবং পরে এই পদে পাকা হন। পরে তিনি বাঙ্গালার এক্সাইস্ কমিশনর হন। তৎপরে উড়িষ্যার কমিশনর এবং ট্রিবিউটারি মহলের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। ১৯০৪ সালে তিনি অস্থায়ীভাবে কলিকাতার বোর্ড অব্ রেভিনিউএর সদস্য হন। ইতিপূর্ব্বে কোন ভারতীয় এই পদ প্রাপ্ত হন নাই। এই সময় তিনি বেঙ্গল্ কাউন্সিলের সদস্য হন। ইনি ইণ্ডিয়ান্ ফিসারিস্

কমিশনের নেতৃত্ব করেন। ১৯০৭ সালে ভারত-সচিবের সভার সদস্য মনোনীত হন। ভারতবাসীর উক্ত সভায় এই প্রথম প্রবেশলাভ। তিনি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নাইট্ উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯২৬ সালে তাঁহার দেহত্যাগ ঘটে।

* * *

বিহারীলাল গুপ্ত—১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সুপ্রসিদ্ধ হরিমোহন সেনের দৌহিত্র এবং চন্দ্রশেখর গুপ্তের পুত্র। প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া ইনি বাটীর সকলের অজ্ঞাতসারে ইংলণ্ড যান এবং তথায় সিভিল্ সার্ভিস ও ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায়

জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বাটী

উত্তীর্ণ হইয়া দেশে ফিরিয়া আইসেন। মানভুম হুগলী প্রভৃতি কয়েক স্থানে সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও কলেক্টর পদে কার্য্য করিয়া কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও করোণার পদে নিযুক্ত হন। দেশীয় সিভিলিয়ান্গণ ইউরোপীয় অপরাধিগণের বিচার করিতে আইন অনুসারে অসমর্থ থাকায় তিনি একটী মন্তব্য লিখিয়া তদানীন্তন ছোটলাট স্যার এ্যাস্লে ইডেনের নিকট প্রেরণ করেন। ইহাই প্রসিদ্ধ ইলবার্ট বিলের মূলভিত্তি। তিনি পরে ডিষ্ট্রীক্ট্ ও শেসন্ জজ, Superintendent and Remembrancer of Legal affairs এবং অস্থায়ীভাবে হাইকোর্টের জজ্ হইয়াছিলেন। রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের পর ইনি কিছুকাল বরোদা রাজ্যে ব্যবস্থা-সচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে ইনি C I. E. উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯১৬ অব্দে ইহাঁর পরলোক প্রাপ্তি ঘটে।

* *

শ্রীগোপাল বসু মল্লিক—১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে পটলডাঙার বিখ্যাত মল্লিক বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রাধানাথ বসু মল্লিক। শ্রীগোপাল সাধারণ শিক্ষা শেষ করিয়া দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ করেন এবং অচিরে ভারতীয় ও ইউরোপীয় দর্শন-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "শ্রীগোপাল ফেলোসিপ্ লেক্-

রমাপ্রসাদ রায়

চারের" আসন যাহা প্রতিষ্ঠিত আছে, ইহা তাঁহার দর্শন ও বেদান্তের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ও উদার হৃদয়ের পরিচায়ক। বেদান্তচর্চ্চার সহায়তা-কল্পে তিনি মৃত্যুকালে বেদান্ত-বৃত্তি স্থাপনের জন্য বাৎসরিক পাঁচ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি উইল্ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে অর্পণ করিয়া যান। দরিদ্রদের সাহায্য-কল্পে তিনি সর্ব্বদা মুক্তহস্ত ছিলেন। দুস্থ হিন্দু বিধবাদের সহায়তা-কল্পে তাঁহার জননী বিন্দুবাসিনীর নামে একটী তহবিল স্থাপন করিয়াছিলেন। কলিকাতায় যখন প্লেগ্ নামক মহামারী প্রথম দেখা দেয়, তখন রোগীদের হাঁসপাতালের জন্য তিনি তিনখানি বৃহৎ অট্টালিকা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার

হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস ও ভগবদ্ভক্তি অসীম ছিল। তাঁহার সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ তাঁহার গৃহদেবতা শ্রীধরজীর সেবার্থ উইল্ করিয়া দিয়া যান। ১৩০৬ সালে তাঁহার দেহান্ত ঘটে।

* * *

মহারাজা মহ্‌তাবচাঁদ—১৭৪৮ শকে বর্দ্ধমানাধিপতি তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর ইহাঁকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ১৭৬৫ শকে ইনি রাজপদে অভিষিক্ত হন। ইনি মহাভারতের একখানি বিশুদ্ধ অনুবাদ প্রকাশ করিয়া ও বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত বিবিধ বিষয়ক গান পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া

গৌরীশঙ্কর দে

ছিল। রাজসরকারে ইঁহার প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল। ইনি সম্মানসূচক তোপ পাইবার অধিকারী হইয়াছিলেন। ইনি ভিন্ন বঙ্গদেশীয় জমিদারদিগের মধ্যে এ সম্মান আর কেহ পান নাই। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে ইনি মহারাণীর এক প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি সাধারণকে দান করেন। উহা কলিকাতার যাদুঘরে স্থাপিত আছে। বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান রাজবাটী, গোলাপ-বাগ্, কৃষ্ণসায়ার্ ইহাঁরই কীর্ত্তি। ১৮৭৯ সালে ইনি পরলোকগত হন।

* * *

কৃষ্ণরাম বসু—১১৪০ সালে হুগলীর অন্তর্গত তাড়া-গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম দয়ারাম। জনৈক সন্ন্যাসী বালক কৃষ্ণরামের ভবিষ্যৎ মহত্ত্বের পরিচয় পাইয়া পিতার অনুমতিক্রমে ইঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। কৃষ্ণরাম কলিকাতায় আসিয়া পিতার সামান্য মূলধন লইয়া লবণের কারবার করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই বিশেষ সৌভাগ্য-লাভ করেন। কিছুদিন পরে ইনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে হুগলীতে দেওয়ানি পদ লাভ করেন। তৎপরে এই কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কলিকাতার শ্যামবাজারে আসিয়া বসতি করেন। তৎকালে তিনি একজন বিখ্যাত ধনী এবং দানবীর বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। একবার দুর্ভিক্ষের সময় ইনি একলক্ষ টাকার চাউল বিতরণ করিয়াছিলেন। মাহেশের সুপ্রসিদ্ধ রথের ইনিই প্রবর্ত্তক। যশোহরে শ্রীশ্রীমদনগোপাল ও বীরভূমে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা এবং কাশীতে ও ভাগলপুরে শিবমন্দির সমূহ স্থাপন এবং গয়ায় রামশিলা সোপানশ্রেণী প্রস্তুত প্রভৃতি কীর্ত্তির দ্বারা ইনি অক্ষয় যশঃ লাভ করিয়াছেন।

* * * *

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন—১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ ত্রিবেণী গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম রুদ্রদেব তর্কবাগীশ। কথিত আছে দেবতার প্রত্যাদেশে পুত্রের জগন্নাথ নাম রাখা হয়। স্থানীয় টোলে শিক্ষা লাভ করিয়া জগন্নাথ স্বীয় বুদ্ধি, মেধা ও প্রতিভাবলে স্মৃতি ও ন্যায় শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ করেন এবং 'তর্কপঞ্চানন' উপাধি প্রাপ্ত হন। ক্রমে তাঁহার পাণ্ডিত্যের কথা চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, মহারাজা নন্দকুমার, রাজা নবকৃষ্ণ হইতে ওয়ারেণ্ হেষ্টিং, স্যার্ উইলিয়ম্ জোন্স্, স্যার্ জন্ শোর প্রভৃতি তখনকার খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট মান্য করিতেন। রাজা নবকৃষ্ণ তাঁহার বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া দেন এবং 'হেদে গোতা' নামক একখানি তালুক প্রদান করেন। বর্দ্ধমানের রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র বহু নিষ্কর ভূমি এবং ত্রিবেণীতে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী দান করেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে উখুড়া পরগণায় সাত শত বিঘা ভূমি প্রদান করেন। আবশ্যক হইলেই গভর্ণমেণ্ট হিন্দু দায়ভাগ সংক্রান্ত পরামর্শাদি তাঁহার নিকট গ্রহণ করিতেন। ৭০০৲ টাকা মাসিক বৃত্তি দিয়া গভর্ণমেণ্ট

তাঁহার নিকট হইতে "অষ্টাদশ বিবাদের বিচারগ্রন্থ" ও "বিবাদ ভঙ্গার্ণব" নামক দায়ভাগ-সংক্রান্ত দুইখানি বৃহৎ গ্রন্থ সঙ্কলন করাইয়া লন। ইহার পরেও তিনি ৩০০৲ মাসিক সরকারি বৃত্তি পাইতেন। ইনি ন্যায়-শাস্ত্রের কয়েক-খানি সংগ্রহ পুস্তক ও দুই একখানি সংস্কৃত নাটক রচনা করিয়াছিলেন। ইনি একজন শ্রুতিধর পুরুষ ছিলেন। দুইজন সাহেবের মারামারি বিষয়ক সাক্ষী দিয়া তিনি যে স্মৃতি-শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা দুর্ল্লভ! তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত খুব কমই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ১৮০৬ সালে ১১১ বৎসর বয়সে তাঁহার লোকান্তর-প্রাপ্তি ঘটে।

* * * *

ধর্ম্মদাস সুর—১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বাগবাজারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম অভিনেতৃরূপে দুই একটী সখের থিয়েটারে যোগদান করেন। ইঁহারই চেষ্টা ও পরিশ্রমে সীন্ ও দৃশ্যপট প্রস্তুত হইয়া শ্যামবাজারের রাজেন্দ্র পালের বাটীতে লীলাবতী নাটকের অভিনয় আরম্ভ করা হয়। ইহা হইতেই সাধারণ নাট্যালয় স্থাপনের সংকল্প হয় এবং জোড়াসাঁকোয় মধুসূদন সান্যালের বাটীতে নীলদর্পণ নাটক লইয়া ন্যাসন্যাল্ থিয়েটার নামে বাঙ্গালীর প্রথম সাধারণ নাট্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ভুবনমোহন নিয়োগীর অর্থে ধর্ম্মদাসের ঐকান্তিক পরিশ্রমে গ্রেট্ ন্যাসন্যাল্ থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার দৃশ্যপটাদি তিনি স্বয়ং অঙ্কা করিয়া অনেকগুলি প্রস্তুত করেন। ইনি কিছুদিন কোহিনুর থিয়েটারের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা থিয়েটার প্রাথমিক যুগে তাঁহার ন্যায় নাট্যমঞ্চের শিল্পী আর কেহ ছিলেন না। ১৯১০ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

* * * *

রমাপ্রসাদ রায়—১২২৪ সালে রাধানগরের নিকট রঘুনাথপুর গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি রাজা রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তিনি প্রথম রামমোহনের প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী বিদ্যালয়ে, তৎপরে পেরেণ্ট্যাল্ অ্যাকা-ডেমিতে ও শেষে হিন্দু কলেজে বিদ্যালাভ করেন। রামমোহনের বিলাত যাত্রার পর দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহাকে অভিভাবকরূপে তত্ত্বাবধান করেন। ডেভিড্ হেয়ার্ও তাঁহাকে বিশেষ যত্ন করিতেন। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া প্রথম নদীয়া তৎপরে বর্দ্ধমান, হুগলী, ২৪ পরগণার ডেপুটি কলেক্টর হন। বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই প্রথম এ কার্য্য পান। পরে তিনি এই কার্য্য ত্যাগ করিয়া ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুরের অবসর গ্রহণের পর সরকারী উকিল নিযুক্ত হন। এই সময় তাঁহার বাঙ্গালী ও ইংরাজ উভয় সমাজেই প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি যথেষ্ট হয়। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তিনি তৎকালীন শিক্ষা-পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি একজন সদস্য নিযুক্ত হন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা হইলে একজন দেশীয় বিচারপতি নিযুক্ত করিবার কথা স্থির হয়। লর্ড এলগিন্ তাঁহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া এই পদের জন্য মনোনীত করেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই বিচারপতির আসনে বসিবার পূর্ব্বেই তিনি ইহবাস ত্যাগ করেন। তিনি বহু গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। তিনি একজন নীরব কর্ম্মী হইলেও শক্তিমান স্বদেশহিতৈষী ছিলেন।

* * * *

শম্ভুচন্দ্র শেঠ—উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে চন্দননগরে ইঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম রাধামোহন শেঠ। ইঁহাদের প্রকৃত উপাধি নন্দী, শেঠ নবাব-প্রদত্ত উপাধি। শম্ভুচন্দ্র সামান্য বাঙ্গালা লেখাপড়া শিখিয়া, শুনা যায় প্রথম কলিকাতায় এক তুলার দোকানে মাসিক ছয় টাকা বেতনে চাকুরী গ্রহণ করেন। তৎপরে তিনি তাঁহার শ্বশুর প্রদত্ত একহাজার টাকা মূলধন লইয়া বড়বাজারে একখানি সামান্য লোহার দোকান করেন। ক্রমে তাঁহার সততা, সত্যবাদিতা ও অধ্যবসায় গুণে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শম্ভুচন্দ্র শেঠ এণ্ড সন্স্ কলিকাতার মধ্যে লৌহ ও ষ্টীল্ ব্যবসায়ে শীর্ষস্থান অধিকার করেন। শুধু ভারতের বহু স্থানেই নয়, বেলজিয়ম, জার্ম্মাণী, ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানেও এই ফার্ম্মের নাম সুপরিচিত এবং এই সকল স্থানে ব্যবসায় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁহার সাধুতার জন্য তিনি তাঁহার দেশে ও সমাজেই যে শুধু শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন তাহা নহে, কলিকাতায় ও ইউরোপে ব্যবসায়-ক্ষেত্রে তাঁহাকে সকলে এত অধিক বিশ্বাস করিতেন যে, তাঁহার সহিত কাজ করিতে সকলেই উৎসুক হইতেন এবং এজন্য কোন এগ্রিমেণ্ট্ সহি করাইবার আবশ্যকতা বোধ করিতেন না। কণ্ট্রাক্ট্ সহি না করিয়া

কাজ করা শুধু দেশীয় ফার্ম্মি কেন বড় বড় বৈদেশিক ফার্ম্মের মধ্যে অদ্যাপিও ব্যবস্থা নাই। তাঁহাদের এ সম্মান বরাবরই অব্যাহত ছিল এবং পরে তাঁহার পুত্র নিত্যগোপাল শেঠও ব্যবসায়-ক্ষেত্রে এতাদৃশ সম্মানিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুতে সমগ্র লোহাপটি একদিন বন্ধ ছিল। শম্ভুচন্দ্রই প্রধানতঃ পাশ্চাত্য দেশ-সমূহের সহিত ব্যবসায় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া বাঙ্গালীকে লৌহ ও ষ্টীল প্রভৃতির আমদানী ব্যবসায়ের পথ প্রদর্শন করেন। তাঁহাকেই বাঙ্গালীর মধ্যে এ কার্য্যের প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে। এ কার্য্য ভিন্ন বগুড়া, মুঙ্গের, হাটখোলা প্রভৃতি স্থানে তাঁহার মোকামী কাজও যথেষ্ট ছিল। তিনি একজন যথার্থ ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন। পূজা পার্ব্বণ দান-ধ্যান ক্রিয়া কলাপ তিনি ভাল বাসিতেন। প্রায় পঁচাত্তর বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

* * * *

গৌরীশঙ্কর দে—১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মধুসূদন দে। ইনি প্রবেশিকা হইতে আরম্ভ করিয়া এম, এ পর্য্যন্ত সম্মানের সহিত সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রবেশিকা ও এম, এ-তে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তৎপরে বি, এল পাশ করেন এবং রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। তিনি ৪৭ বৎসর ধরিয়া জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ্‌ ইন্‌ষ্টিটিউসনে গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের পরীক্ষক এবং সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি একাধারে যেমন অগাধ পণ্ডিত ছিলেন, তেমনই কর্ত্তব্যপরায়ণতা, শ্রমশীলতা, দানশীলতা প্রভৃতি বহু সদ্‌গু বিভূষিত ছিলেন।

* * * *

কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় (দেওয়ান)—১২২৭ সালে ইঁহা জন্ম হয়। পিতার নাম উমাকান্ত রায়। ইহাঁদের ব কৃষ্ণনগর রাজসংসারের দেওয়ান চক্রবর্ত্তী বলিয়া বিখ্যাত ইনি বাল্যকালে পার্শী ও বাঙ্গালা শিখিয়া ইংরাজী শিক্ষা জন্য কলিকাতায় আইসেন। তিনি চিকিৎসা-বিদ্য শিক্ষার্থ মেডিক্যাল্‌ কলেজে প্রবিষ্ট হন। কিন্তু না কারণে উহা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তৎপরে কৃষ্ণনগ রাজবাটীতে সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন, পরে তথাকা দেওয়ানী পদলাভ করেন। ইহাঁর দ্বারা রাজষ্টেটে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। "ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত নামক কৃষ্ণনগর রাজবংশের একখানি বৃহৎ ইতিহাস ই রচনা করেন। ইহা ব্যতীত "গীতমঞ্জরী" এবং একখা আত্মজীবনচরিত প্রণয়ন করেন। সঙ্গীত-বিদ্যাতেও ইহাঁ পারদর্শিতা যথেষ্ট ছিল। সুবিখ্যাত নাট্যকার ও হা রসাত্মক গীত-রচয়িতা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ইহাঁর অন্যত পুত্র। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর দেহান্ত ঘটে। *

* বিগত সপ্ততি বৎসরের মধ্যে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাঁহাদের এবং জীবিত ব্যক্তিদের কথা লিখিত হয় নাই। যে সক খ্যাতনামা ব্যক্তিদের কথা বাদ পড়িয়াছে, তাঁহাদের সম্বন্ধে আম না জানা থাকা অথবা তাঁহাদের জীবনী সংগ্রহ করিতে না পারা এ স্থানাভাব ইহাই কারণ। সংক্ষেপ করিবার জন্যও কোন কোন দে কোন কোন বিষয় উল্লেখ করিতে বিরত হইতে হইয়াছে।

সতী

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, বি-এসসি

গাড়াগাঁয়ের একটা বহু পুরানো বাড়ী—দোতলা। বাড়ীটার রেওয়ালে অনেকগুলি ছোট ছোট আগাছা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। বাড়ীর বাসিন্দে দুজন—প্রবীণ স্বামী, আর তার দ্বিতীয় পক্ষের যুবতী স্ত্রী। স্বামী আর স্ত্রীর মধ্যে বয়সের যে পার্থক্য, সেটা বাপ মেয়ের মধ্যেই শোভনীয়। অনীতার বাপের অবস্থা মোটেই ভাল নয়,—কেরাণীগিরি করেই অন্নের সংস্থান কর্ত্তে হয়;—আবার তা'রই থেকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হয় কিছু মেয়ের বিয়ের খরচের যোগাড় কর্ত্তে। এর উপর কুলীন সে; কুলীনের সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দিতে হ'বে—এই না কি সমাজের দাবী। তাই অনীতার বিয়ের সময় অনীতা যখন মুখ তুলে চেয়েছিল শুভদৃষ্টির ক্ষণে, তখন সে দেখেছিল, যে তা'র জীবন-পথের সঙ্গী হ'তে চলেছে, সে বয়সে তার বাপের চেয়ে বড় না হ'লেও ছোট নয়। শুদ্ধভাবে, মন্ত্র পড়ে, এমন কি ধর্ম্মমতে নারায়ণ সাক্ষী করে অনীতাকে সেই বৃদ্ধের হাতে সমর্পণ করা হ'ল। তার-পর, যখন বিদায়ের ক্ষণ এগিয়ে এল, তখন মা মেয়েকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে বল্লেন—"মা, স্বামীর ঘর কর্ত্তে যাচ্ছ—মনে রেখ, স্বামী দেবতা, সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে তাঁকে ভালবেস, তাঁর সেবা কোরো—স্ত্রীলোকের এই ধর্ম্ম ভুলে না! আশীর্ব্বাদ করি সতী সাবিত্রী হও।"—এর পর দুতিন বৎসর কেটে গেছে—অনীতা তা'র স্বামীকে সেবা করে, যত্ন করে সত্যিই প্রাণ দিয়ে। সবাই বলে—"আহা, জাতি বৌটী সতীলক্ষ্মী; স্বামীকে কি রকম ভালবাসে—কত যত্ন করে।"—সকলে সেবা যত্নটাকেই ভালবাসা বলে ভুল করে। বোঝে না যে, স্নেহ সেবা যত্ন নারী অকাতরে বিতরণ কর্ত্তে পারে ব্যক্তি-নির্ব্বিশেষে—কারণ সেইটাই তা'র ধর্ম্ম; কিন্তু ভালবাসা বল্‌তে যা বোঝায়, তা নারী সাধারণতঃ এক-জনকেই পারে দিতে—আর সেও তা'র ইচ্ছানুযায়ী নয়—যায় যা'কে চায়, তারই পায়ে আপনাকে সে বিলিয়ে দেয় একেবারে নিজেকে নিঃস্ব করে।

তরী যখন জীর্ণ হয়ে আসে, তখন তা'কে নদীর বুকে চল্‌তে হ'লে অনেক সাবধানে ঢেউএর ধাক্কা বাঁচিয়ে কোনও রকমে চল্‌তে হয়। ঠিক সেই রকম করেই চল্‌তে হচ্ছিল অনীতার স্বামী পরমেশকে; তা'র জীর্ণ দেহখানাকে নিয়ে তা'র জীবন-নদীর বুকে অনীতা ধরে ছিল সে তরীর হাল। কিন্তু অনেক বাঁচিয়ে চল্লেও একদিন পরমেশকে একটু ভাল ভাবেই শয্যা নিতেই হ'ল। নিরালা বাড়ী; অনীতা একাই তা'র রোগী স্বামীকে নিয়ে দিন কাটায়। কিছুদিন গেলে একদিন পরমেশ নিজে থেকেই বল্লেন—"অনীতা, একা আর কত কর্ব্বে তুমি! সংসারের অন্য সমস্ত কাজ থেকে আমার সেবা যত্ন পথ্য সব এক হাতে কি করে হবে রোজ রোজ? কাকেও আস্‌তে লিখলে হ'য় না?"

অনীতা বল্লে—"কাকে লিখ্‌বে? আমি ত জানি না তোমার কোথায় কে আত্মীয় আছেন।"

উত্তরে পরমেশ একটু যেন ব্যথিত সুরেই বল্লেন—"আত্মীয়বা আত্মীয়া আমার কেউ যে বিশেষ আছে, তা নয় অনীতা। আর যা দু-একজন আছে তা'রা আমার এ দুঃসময়ে আস্‌বে না—যদিও একদিন তা'দের দুঃসময়ে আমি তা'দের সকলের জন্যই আমার যথাসাধ্য করেছিলাম"—বলে পরমেশ অনেকক্ষণ চুপ করে বাইরের দিকে তাকিয়ে রৈলেন; পরে আস্তে আস্তে মুখটী ঘুরিয়ে নিয়ে বল্লেন—"তবে—"

অনীতা তাঁর মুখের কথাটীর যেন প্রতিধ্বনি করে বল্ল—"তবে—"

"তবে আমার এক দূর-সম্পর্কের মামাত ভাই নিশীথ কলকাতার 'ল' পড়ে। এবার তা'র ফাইনাল্‌ পরীক্ষা হ'য়ে গেল সে-দিন। তা'কে লিখ্‌লে সে বোধ হয় আস্‌বে—বড় পরোপকারী, বড় ভাল ছেলে সে। সে এলে মাঝে মাঝে রাতও জাগ্‌তে পার্ব্বে, তোমার সেবারও সাহায্য হ'বে। আর তা ছাড়া কয়েকদিন অন্ততঃপক্ষে তোমার কথা বল্‌বারও একটা সঙ্গী হ'বে।"

* * * *

সেদিন সেই পুরানো বাড়ীটার উপর থেকে সূর্য্যের শেষ

ষিদায় রশ্মিটুকু তখন মুছে গেছে ;—চারিদিকে আঁধার জমে উঠেছে ; দূরে শৃগালের চীৎকার শোনা যাচ্ছে ; ঝিল্লীরবও উঠেছে চারিধারে। অনীতা তার স্বামীর শিয়রে বসে—অদূরে একটা প্রদীপ জ্বল্‌ছে। আজ দিন দুই-তিন থেকে পরমেশের অসুখটা আরও একটু বেড়েছে। পরমেশের কপালে জলপটী দিয়ে হাওয়া করার এখন যেন একটু সুস্থির হয়ে তিনি চোখ বুজেছেন। এমন সময় নীচে দরজার কড়া সজোরে নড়ে উঠ্‌ল। পরমেশের তন্দ্রাটা ভেঙ্গে গেল ;—তিনি চম্‌কে উঠে বল্লেন—"দেখ, দেখ বোধ হয় নিশীথ এল—" অনীতা ধীরে ধীরে উঠে গেল। একজন অপরিচিত পুরুষকে দরজা খুলে দিতে যেতে তার যেন কেমন একটু লজ্জা কর্ত্তে লাগ্‌ল ; অথচ তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না ; কাজেই তা'কেই যেতে হ'ল।—দরজা খুলে দিতেই প্রবেশ কর্ল্ল একটী যুবক। তার এক হাতে প্রকাণ্ড একটা সুটকেশ, আর এক হাতে বিছানা। যুবকটীও ঘরে ঢুকেই অপরিচিতা এক যুবতী মহিলাকে দেখে একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে গেল।—কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে বল্লে—"আপনি নিশ্চয় আমার বৌদি। আমি নিশীথ—আপনার দেওর। পরমেশদা কেমন আছেন ? চলুন, তাঁর সঙ্গে দেখা করিগে।"

অনীতা প্রত্যুত্তরে কোন কথা বল্লে না—মাথার ঘোমটাটী আরও অনেকখানি টেনে দিয়ে নিশীথের আগে আগে চল্‌ল। নিশীথ সিঁড়িতে উঠ্‌তে উঠ্‌তে বল্ল—"আমার সুটকেশ, বিছানা ঐ নীচেকার ঘরেই থাক্‌ল—আমার আস্তানা কিন্তু ঐ নীচেই হবে বৌদি।"

নিশীথকে ওপরে নিয়ে গিয়ে পরমেশের ঘর দেখিয়ে দিয়েই সে বা'র হয়ে এল। নারীর লজ্জা যেমন একটী আভরণ, অহেতুক ঔৎসুক্যও তেমনি তা'র স্বভাবের একটা অঙ্গ। অনীতা বাইরে এসে ঘোমটাটী তুলে আড়াল থেকে এই নবাগত দেওরটীকে বেশ ভাল করে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। দেখ্‌লে যে বেশ বলিষ্ঠ শ্যামবর্ণ সুপুরুষ যুবা—বয়স চব্বিশ পঁচিশ হ'বে। মুখে যেন তা'র হাসি মাখান রয়েছে।

নিশীথ ঘরে ঢুকে পরমেশের পায়ে প্রণাম কর্ত্তেই পরমেশ বল্লেন—"কি রে নিশীথ, আয়। আমার বড় অসুখ, তাই তোকে আস্‌তে লিখেছিলুম। বস্, অনীতা, একটা বস্‌বার জায়গা দাও ত।"

নিশীথ বল্লে—"না, না কিছুর দরকার নেই, আ আপনার এই বিছানাতেই বস্‌ছি।"—বলে সে পরমে বিছানার উপরেই বসে পড়ল। পরমেশ আবার বল্লে "অনীতা, তুমি নিশীথের সঙ্গে গল্প কর—নিশীথ, কিছু ম করিস্ না ভাই, আমি ত বেশী কথা কইতে পারি না—"

বাধা দিয়ে নিশীথ বল্লে—"না, না, আপনি কথা বল্‌ না, ঘুমুন। তবে যাঁকে কথা কইতে বল্‌ছেন তিনি এত বোধ হয় নীচের তলায় গিয়ে হাজির। আর কথা বল্‌ কি—আমাকে দেখে তিনি যত বড় ঘোমটা দিয়েছিলেন এ বিংশ শতাব্দীর কথা ছেড়ে দিন—ঊনবিংশ শতাব্দীর কোনও বৌ দেওরকে দেখ্‌লে তত বড় ঘোমটা দিত না এমন কি ভাসুরকে দেখ্‌লেও না।"

পরমেশ মাথাটা একটু উঁচু করে দেখ্‌লেন যে, অনী মাথার দিকে নেই। তখন একটু ব্যস্তভাবেই বল্লেন—" কি ?"—ক্ষীণকণ্ঠে ডাকলেন—"অনীতা, অনীতা!"

অনীতা ততক্ষণ সত্যই নীচে চলে গেছে। নি বাধা দিয়ে বল্লে—"আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমিই ভ করে নেব। ও ঘোমটা যদি কালকের মধ্যে না কপা কাছে তোলাতে পারি, তাহ'লে আমার নাম নিশী নয়।—কিন্তু যাক্, এখন আপনি চোখ বুঁজে এ ঘুমোবার চেষ্টা করুন ত—আমি হাওয়া কচ্ছি—বেশী ক বল্লে আবার কষ্ট হ'বে।"

পরমেশ পাশ ফিরে শুলেন ;—পাশে একটা পাখা ছি নিশীথ সেইটা তুলে নিয়ে পরমেশকে বাতাস কর্ত্তে লাগ খানিক পরে যখন নিশীথ দেখলে যে পরমেশ ঘুমি পড়েছেন, তখন সে অতি সন্তর্পণে উঠে আস্তে আস্তে নী নেমে গেল। নীচে গিয়ে আড়াল থেকে দেখ্‌ল যে, উনু ধারে বসে অনীতা খাবার তৈরী কর্চ্ছে ;—সুন্দর—গৌর মুখটী আগুনের তা'তে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। সে টিপে টিপে পিছন থেকে গিয়ে হঠাৎ ডাক্‌লে—"বৌদি"

অনীতা চম্‌কে উঠে মুখ ফিরিয়ে নিশীথকে দেখে এ লজ্জিত হয়েই ঘোমটা টেনে দিল। নিশীথ হো হো ক হেসে উঠ্‌ল—বল্ল—"আর কি হ'বে ঘোমটা দিয়ে— দেখে ফেলেছি ত ?"

এর পর নিশীথ হাত মুখ ধুয়ে খেতে বস্‌ল। খে বসে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন সুরু করে দিল গম্ভীর ভা

অনীতা প্রথমে ঘাড় বাঁ-দিক থেকে ডাইনে, আর ডাইনে থেকে বাঁয়ে নেড়ে কাজ সারতে লাগ্‌ল—পরে "হুঁ" আর "না"—শেষে একটু-আধটু কথা—এমনি করে প্রথম আলাপ সুরু হ'ল।

কয়েক দিন কেটে গেছে। অনীতার সে লজ্জার বাঁধ ভেঙ্গে গেছে—ঘোমটাও উঠেছে গিয়ে কপালে। এমন কি দুই দেওর বৌদির মাঝে "আপনি" সম্বোধনটা উঠে গিয়ে "তুমি" সম্বোধন সুরু হ'য়ে গেছে। সেবা করা ও রাত জাগার পালাও তারা ভাগ করে নিয়েছে। নিশীথ জাগে রাত্রের প্রথম দিকটা, আর অনীতা শেষের দিকটা। নিশীথ আসায় বাড়ীটাতে এত বড় একটা অসুখ থাকা সত্ত্বেও যেন চারিদিকে একটা খুসীর রং লেগেছে—সে যেন কি এক' যাদুমন্ত্রে কান্নাকে হাসির পাতে মুড়্‌তে পারে।—তার সেবা-শুশ্রূষায় পরমেশের মহা তৃপ্তি হয় ;—আবার পরমেশ যখন ঘুমান, তখন সে তার বৌদির প্রাণটা খুসীতে ভরিয়ে তোলে রসিকতা, ঠাট্টা চালাকি সখের ঝগড়া করে। দুই দেওর-বৌদির মাঝে দিন দিন একটা মধুর সখ্যতা গড়ে ওঠে।

একদিন নিশীথ বসেছে খেতে—অনীতা সম্মুখে বসে হাওয়া কর্চ্ছে। নিশীথ খেতে খেতে কত গল্প কর্চ্ছে—তার কালেজের, খেলাধূলার, দেশের আরও কত কিসের। অন্য দিন হ'লে অনীতা নিশীথকে এতক্ষণ কত প্রশ্নই না কর্ত্ত। কিন্তু আজ হঠাৎ তা'র কি খেয়াল—কোন কথাই বল্‌ছিল না সে—শুধু নিশীথের মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিল ; —ভারী ভাল লাগছিল আজ তার নিশীথের কথাবার্ত্তা, হাস্যোজ্জ্বল চোখের চাহনি।—অনীতার এই নীরবতা হঠাৎ নিশীথের গল্পের স্রোত বন্ধ করে দিল। সে তা'র গল্প থামিয়ে বল্ল—"বৌদি, তুমি যে কোন কথা বল্‌ছ না ?"

অনীতা একটু চমকে উঠে বল্‌ল—"তোমার গল্প শুন্‌ছি যে—আমি কথা বল্‌ব কি করে ?"

নিশীথ খেয়ে উপরে পরমেশের কাছে চলে গেল। অনীতা নিজে ভাত বেড়ে নিয়ে খেতে বস্‌ল। খেতে বসে ভাব্‌তে লাগ্‌ল—আচ্ছা, নিশীথ ঠাকুরপোকে বন্ধুর মত মনে হয়।—অন্তর বলে বন্ধুর মতই বেশী ;—সংস্কার অন্তরের কণ্ঠরোধ করে বলে—না ভাইএর মতই বেশী—দেওর যে ভাইএরই সমান—

সেই দিন রাত্রে পরমেশ ঘুমুলে পরে অনীতা ধীরে ধীরে নীচে নেমে এল নিশীথকে খেতে দিতে। নিশীথের ঘরের কাছে এসে দেখ্‌লে যে তা'র ঘরের দরজাটা ভেজান রয়েছে ;—মাঝখানে একটু ফাঁক ;—তার মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে, নিশীথ টেবিলের সম্মুখে বসে এক মনে একটা বই পড়্‌ছে, আর তার মুখের অনেকখানিই এদিক থেকে দেখা যাচ্ছে। অনীতা দরজা না খুলেই সেই ফাঁকটুকুর ভিতর দিয়ে একদৃষ্টে নিশীথকে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। নিশীথকে সামনাসামনি যেন এতটা পূর্ণভাবে সে দেখ্‌তে পার্ত্ত না। খানিক পরে হঠাৎ সে চমকে উঠ্‌ল ; মনে হ'ল কি কর্চ্ছে সে ; এ রকম ভাবে দেখা অন্যায়। সে তক্ষণি দরজাটা খুলে ঢুকে পড়ে ডাক্‌ল—"ঠাকুরপো!"

নিশীথ বইটা থেকে মুখ তুলে বল্ল—"কি ভাই বৌদি, খেতে দিয়েছ।"

—"হ্যাঁ, চল তোমাকে ভাত দিয়ে নিইগে। তোমার দাদা একটু চোখ বুঁজেছেন, তাই এক্ষণি তাড়াতাড়ি নেমে এলাম—এই ফাঁকে তোমায় ভাতটা দিয়ে যেতে।—হয় ত এখনি উঠে পড়বেন—এস।"

নিশীথ এসে খেতে বস্‌ল—অনীতা তার সামনে বসে নিজ মনে ভাব্‌ছিল—অন্যায় কিছুই নয়, ও খানিকটা খেয়াল অ্যর খানিকটা অন্যমনস্কতার জন্য।—কিন্তু অন্যায় যদি না হবে, ত মিথ্যা সে বল্‌তে গেল কেন ? বল্‌তেই ত পার্ত্ত যে, সে অনেকক্ষণ থেকে লুকিয়ে নিশীথকে দেখ্‌ছিল।

অনীতার মনের কোণে যেন কিসের একটা সন্দেহের ছায়া পড়্‌ল। সে তাড়াতাড়ি উপরে গিয়ে তার স্বামীর পায়ের কাছে বসে তা'র পা-দুটি কোলের উপর তুলে নিয়ে হাত বুলাতে লাগ্‌ল।

দু-চারদিন কেটে গেছে এর পর। অনীতার মনের মধ্যের সন্দেহের যে সামান্য দোলা—সেটা থেমে গেছে। সেদিন তখন বেলা দুপুর—চারিদিকে রোদ খাঁ খাঁ কর্চ্ছে —মাঝে মাঝে দুপুরের নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে কয়েকটা চিলের চীৎকার আকাশে উঠে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। নিশীথ অনীতার ঘরে বসে নভেল পড়ছে। অনীতা পাশের ঘরে পরমেশের কাছে বসে ছিল ;—খানিক পরে উঠে এল এ-ঘরে। এসে আস্তে আস্তে পিছন দিক থেকে নিশীথের বইটা কেড়ে নিল।

নিশীথ জিজ্ঞাসা কর্ল্লে—"তুমি উঠে এলে যে?"

অনীতা বল্লে—"উনি ঘুমিয়েছেন—তাই সেই ফাঁকে তোমাকে একটু জ্বালাতন কর্ত্তে এলাম—"

নিশীথ একটু অনুনয়ের সুরেই বল্লে—"বইটা দাও, লক্ষ্মীটি—বড় সুন্দর গল্পটা।"

অনীতা বল্লে—"আমাকে বল কিসের গল্প, তবে বই পাবে।"

—"সে তুমি বুঝ্‌বে না—"

—"বলই না—বুঝি কি না সে পরের কথা।"

—"একটী মেয়ের হতাশাময় প্রেমের গল্প—"

—"কি রকম?"

—"মেয়েটীঅতি সচ্চিত্রা; কনভেণ্টে শিক্ষিতা সে—বিয়েও হয়েছিল তার। কিন্তু স্বামীকে সে ভালবাস্‌তে পারে-নি—ভাল বেসেছিল আর একজনকে—স্বামীরই এক বন্ধু সে। কিন্তু মেয়েটী তার জীবনে কারো কাছে সে ভালবাসা স্বীকার কর্ত্তে পার্ল্ল না—এমন কি নিজের কাছেও না। নিজের মনের মাঝে অহর্নিশি এই দ্বন্দ্ব তাকে পাগল করে তুলল। শেষে একদিন আত্মহত্যা করে সে সব জ্বালার হাত থেকে ত্রাণ পেল।—"

—কথা শেষ করে নিশীথ অনীতার মুখের দিকে মুখ তুলে তাকাতেই দেখ্‌ল অনীতার মুখে যেন রক্তের লেশ-মাত্র নেই—একেবারে সাদা হ'য়ে গেছে। সে আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"ও কি বৌদি, তোমার মুখ যে ফ্যাকাশে হ'য়ে গেছে! কি হয়েছে ভাই?"

অনীতা চেষ্টা করে মুখে একটু হাসি এনে বল্লে—"না, ও কিছু না"—তারপর হঠাৎ অসংলগ্ন ভাবে জিজ্ঞাসা করে ফেল্‌ল—"ঠাকুরপো, তুমি কাউকে ভালবাস?"—জিজ্ঞাসা করেই তা'র মুখটা লাল হ'য়ে উঠ্‌ল। নিশীথের মুখটাও রাঙা হ'য়ে উঠ্‌ল সঙ্গে সঙ্গে। অনীতা যেন বিশেষ কোন একটা উত্তরের প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হ'য়ে রৈল। নিশীথ চুপ করে থাকায় অনীতা বল্লে—"বল না, লজ্জা কি?"

নিশীথ মাথাটা নীচু করে বল্লে—"হ্যাঁ, বাসি।"

অনীতার দেহের সমস্ত রক্ত যেন মাথায় উঠে গেল। হঠাৎ সে মন্ত্রমুগ্ধের মত বলে উঠ্‌ল—"কে সে?—"

নিশীথ বল্লে—"আমার এক বন্ধুর বোন—নাম রাণী।"

—"সে তোমাকে ভালবাসে?"

—"হ্যাঁ, বাসে। সে এবার ম্যাট্রিক দেবে—তারপর আমাদের বিয়ে হ'বে—এই ঠিক আছে।"

নিশীথের লজ্জা গেল কেটে। সে রাণীর গল্পে শতমুখ হ'য়ে উঠ্‌ল;—অনীতা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল।

নিশীথ অনুনয়ের সুরে বল্লে—"কোথায় চল্লে বৌদি? দাদার কাছে ত সারাদিন ছিলে। এখন ত তিনি ঘুমিয়েছেন—এস না একটু গল্প করা যাক।"

অনীতা একটু গম্ভীর ভাবেই বল্ল—"না যাই, তোমার দাদার জন্য ফলগুলি ছাড়িয়ে রাখিগে।"

—"সে ত বৈকালে খাবেন—তার এত তাড়াতাড়ি কেন?"

—"না, কাজ সেরে রাখাই ভাল—কাজ ফেলে গল্প কর্ত্তে আমি ভালবাসিনে মোটেই—" বলেই অনীতা আর কোন উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই সিঁড়ি দিয়ে নাম্‌তে লাগ্‌ল। নিশীথ উঠে এসে দরজার কাছ থেকে বল্লে—"ফল-কটা ছাড়িয়ে রেখে এস কিন্তু বৌদি—একটু গল্প কর্ব্ব।"

অনীতা নীচে থেকে যেন বেশ একটু বিরক্ত ভাবেই বল্লে—"না ঠাকুরপো, এখন আর গল্প কর্ত্তে ইচ্ছে নেই। তুমি তোমার দাদার কাছে পার ত একটু ব'স। ফল-কটা ছাড়িয়ে রেখে আমি একটু ঘুমুব—আমার বড় ঘুম পাচ্ছে।"

দিন যায়—

অনীতার মনে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হ'য়েছে। সেদিনের সেই গল্পের মেয়েটীর শেষ অবস্থা মনে করে সে শিউরে ওঠে। স্বামীর সেবায় সে যতদূর সাধ্য আত্মনিয়োগ করেছে; কিন্তু তবুও তা'র মন নিশীথের কথা নিয়েই নাড়াচাড়া করে—সে নিশীথ সামনে থাকলেও, না থাক্‌লেও।—অনীতা ভাবে, তবে কি মনে মনে সে নিশীথকে—তার সংস্কারাচ্ছন্ন মন সঙ্গে সঙ্গে আর্ত্তনাদ করে ওঠে—না, না, তা হ'তে পারে না, তা হ'তে পারে না কখনও। দেওরের প্রতি স্নেহেরই রূপান্তর—এটা।—কিন্তু তখনি আবার তার অন্তরের কোন্ গভীর তলদেশ থেকে কে

যেন বলে, তবে সেদিন নিশীথের বন্ধুর বোনের কথা শুনে তা'র বুকটা ব্যথায় রণিয়ে উঠেছিল কেন? আর কেনই বা সেই গল্পের মেয়েটীর কথা তাকে প্রতি মুহূর্ত্তে আজও এমন আকুল করে তোলে?—কিন্তু স্বীকার ত সে কর্ত্তে পারে না—মনে মনেও। এ কি হোলো? তার জীবনে ত কোন স্পন্দনই ছিল না; বেশ কেটে যাচ্ছিল একরকম করে। নিশীথ আস্‌তেই তার জীবনে যেন একটা সাড়া পেয়েছে সে। নিশীথকে চলে যেতে বলুক সে। কিন্তু নিশীথ চলে যাবে ভাবতেও যে তার মনটা বিষাদে ভরে উঠে—চারিদিক আঁধার মনে হয়। মনকে ত চিরকাল ফাঁকী দেওয়া চলে না। এত দিনের সুপ্ত যৌবন আজ তা'র দেহের মাঝে জেগে উঠেছে—সে যৌবনের ঢেউ উঠে আজ তার সারা প্রাণটাকে মাতিয়ে তুলেছে। কুড়ি বৎসরের অনীতার বুকের মাঝে আজ কি এক কামনা, কি এক আকাঙ্ক্ষা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। সে সেই কামনার, সেই আকাঙ্ক্ষার কণ্ঠরোধ কর্ত্তে প্রাণপণ চেষ্টা কর্চ্ছে;—কিন্তু সব চেষ্টাকে বিফল করে দিয়ে, ব্যর্থ করে দিয়ে সেই আকাঙ্ক্ষার, সেই কামনার ক্ষীণ ধ্বনি তা'র কাণে এসে বাজছে—সব সময় সব কাজের মাঝে।

অনীতা সেদিন হঠাৎ পরমেশকে বল্লে—"দেখ, নিশীথ-ঠাকুরপো অনেক দিন এসেছে—রাত জাগ্‌ছে সমানে। তবে ও যে রকমের পরোপকারী ছেলে তাতে ও নিজে থেকে কোনও দিন বলবে না যে ওর যাওয়া দরকার! তার উপর ওর বৃদ্ধা মা রয়েছেন;—পরীক্ষা হয়ে গেছে এতদিন। এখন ওর মার কাছে যাওয়া নিতান্ত উচিত।"

পরমেশ বল্লেন—"সবই ত বুঝি অনীতা, কিন্তু আমি ত এখনও ভাল করে সার্‌তে পারিনি। ও চলে গেলে তুমি একলা ত পেরে উঠবে না। আরও দিনকতক থাক—তারপর বলব'খনি।" অনীতা হঠাৎ কেঁদে উঠে বল্‌লে—"তোমার পায়ে পড়ি ওকে যেতে বল—আমি খুব পার্ব্ব একা তোমার সেবা কর্ত্তে।"

পরমেশ ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লেন—"ও কি, ও কি কাঁদ্‌ছ কেন অনীতা? ওকে না হয় যেতে বলছি—কিন্তু তুমি কাঁদ্‌ছ কেন?"

অনীতার অন্তরের মধ্যে একটা পরম আত্ম-লাঞ্ছনার প্রবাহ বহে গেল। সে ক্রন্দনের সঙ্গে একটু অভিমানের সুর মিশিয়ে ক্রন্দনের কারণটাকে হাল্কা করে দিয়ে বল্লে—"কাঁদব না, তুমি কেবলই বল একলা আমি পার্ব্ব না সেবা কর্ত্তে। কেন, আমি ত কাকেও আস্‌তে বলিনি। তুমিই ত নিশীথ ঠাকুরপোকে আস্‌তে বলেছিলে—তাই আমিও মত দিয়েছিলাম। নিশীথ ঠাকুরপো ত আমার কোনও মহা ক্ষতি কর্চ্ছে না যে, ও গেলেই আমি বাঁচি।"

পরমেশ কৃতজ্ঞতায় ভরা চোখ দুটী তুলে বল্লেন—"না, না অনীতা, তোমার সেবার কি তুলনা হ'তে পারে? এখনও যে বেঁচে আছি, সে তোমারই সেবার জোরে। ভুল বুঝ না, লক্ষ্মীটি! তোমার সুবিধার জন্যই বলেছিলাম। বেশ ত, ওকে এখনি ডেকে বুঝিয়ে বল্‌ছি। সত্যিই, ওর বুড়া মায়ের প্রতি কর্ত্তব্যও আছে বৈ কি—আর ওর মত ছেলে সে কর্ত্তব্য পালন কর্ত্তে পার্চ্ছে না আমারই জন্য;—ঠিকই বলেছ তুমি; ওকে বলব'খনি।"

"আমার যা বক্তব্য তোমাকে বলেছি—তুমি যা ভাল বোঝ তা কর—" বলে অনীতা পরমেশের কাছ থেকে বাইরে চলে এল। বাইরে এসেই তা'র মনে হ'ল যে, এ কি কর্ল্ল সে! তা'র নিরানন্দ জীবনের মাঝে ক-দিনের জন্য যে আনন্দের ক্ষীণ শিখাটুকু জ্বলে উঠেছিল, তা'কে সে নিজে ইচ্ছা করে এক মুহূর্ত্তে একটী ফুঁয়ে নিবিয়ে দিয়ে এল। হৃদয়ের মাঝে এক মহা অন্তর্দাহ নিয়ে গিয়ে সে তা'র নিজের বিছানায় শরাহত পক্ষিণীর মত লুটিয়ে পড়্‌ল।

কতক্ষণ কেটে গেছে তা' তার জ্ঞান ছিল না। জ্ঞান হ'ল তখনই, যখন নিশীথ এসে কাছে দাঁড়িয়ে ডাক্‌ল—"বৌদি" ডাক শুনে মুখ তুলে তাকাতেই নিশীথ জিজ্ঞাসা কর্ল্ল—"অসময়ে ঘুমুচ্ছ কেন বৌদি, অসুখ করেছে।" তার সুর যেন স্নেহ-সহানুভূতিতে ভরা। নিশীথের স্নেহভরা ডাক শুনেই অনীতার বুকের ভিতরকার রক্ত উচ্ছল হ'য়ে উঠ্‌ল;—অনীতা প্রাণপণে নিজের প্রবৃত্তির রাশ টেনে ধরল। সে উঠে বসে বল্‌ল—"না ঠাকুরপো—শরীর খারাপ হয়নি; এমনি শুয়ে ছিলাম।"

নিশীথ একটু চুপ করে থেকে বল্লে—"কাল যাচ্ছি বৌদি। দাদা বল্লেন যে, আমার আর থাকার বিশেষ দরকার নেই। মা আছেন, তাঁর কাছে যাওয়া উচিত এখন।

সত্যিই বৌদি, মা আমাকে দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন—আমারও মনটা ভারী ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে মাকে দেখবার জন্য। কাল সকালের গাড়ীতেই যাব—" খানিক চুপ করে থেকে আবার বল্লে—"বৌদি ভাই, তোমাকে ছেড়ে যেতেও মনটা ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌ছে—তোমার স্নেহের স্মৃতি আমার মনটাকে অনেক দিনই আচ্ছন্ন করে রাখবে। আমার কথা তোমার মনে থাক্‌বে ত বৌদি?"

অনীতার অন্তরের ঘাত-প্রতিঘাত ক্রমশঃই বেড়ে উঠ্‌ছিল; ক্রন্দনের একটা রুদ্ধ আবেগ তার বুকের মাঝে গুম্‌রে গুম্‌রে উঠ্‌ছিল। কিন্তু সে সব চাপা দিয়ে শুধু বল্লে—"মনে থাক্‌বে বৈ কি ঠাকুরপো! তুমি কত উপকার কর্ল্লে আমাদের—কত আমোদে রেখেছিলে—সব মনে পড়্‌বে।"—বলে সে উঠে দাঁড়ালে।

নিশীথ আবার বল্লে—"বৌদি, আমার বোন নেই—জানি না বোন্‌কে মানুষ কতখানি ভালবাসে;—কিন্তু এই কয় দিনে তোমাকে যতখানি ভালবেসেছি নিজের বোন থাকলেও জানি না ততখানি——" অনীতা হঠাৎ কথায় বাধা দিয়ে বল্লে—"আমি চল্লাম ঠাকুরপো, তোমার দাদাকে ওষুধ খাওয়ানর সময় হয়ে গেছে—" বলেই কথার মাঝেই চলে গেল।

রাত্রি তখন প্রায় তিনটে। নিশীথ তার ঘরে অঘোর নিদ্রায় নিদ্রিত;—অস্পষ্ট চাঁদের আলো এসে ছড়িয়ে পড়েছে। নিশীথের বিছানার উপর নিশীথের মুখে চোখে সে আলোর ছোঁয়াচ লাগ্‌ছে। হঠাৎ কিসের একটা শব্দে নিশীথের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে "কে" বলে উঠে বস্‌তেই চাঁদের অস্পষ্ট আলোতে তার চোখে পড়ল কে একজন মাটীতে বসে। সে তাড়াতাড়ি মাথার কাছ থেকে দেশলাইটা নিয়ে জ্বেলে দেখে—অনীতা। তখন সে একটা বিস্ময়সূচক শব্দ করে পাশের আলোটা জ্বেলে ফেল্‌ল। তারপর উঠে অনীতার কাছে এগিয়ে গিয়ে বল্লে—"এ কি বৌদি, তুমি এ সময়ে এখানে?"

অনীতা মুখ নীচু করে বসে ছিল,—তার পায়ের কাছেই নিশীথের প্রকাণ্ড সুটকেশটা। নিশীথ এ কথা বলার পরও অনীতা যেমনি মাথা নীচু করে বসে ছিল তেমনিই বসে রৈল। নিশীথ একেবারে কাছে গিয়ে বল্লে—"বৌদি, বসে রৈলে কেন ভাই—লেগেছে নাকি?—"বলে ভাল করে তাকাতেই দেখ্‌লে যে, অনীতার বাঁ হাতের কনুইএর কাছটা খুব কেটে গেছে—রক্ত পড়ছে। নিশীথ তা দেখে অস্ফুট চীৎকার করে উঠ্‌ল। কোমল-হৃদয় নিশীথের মনের ভিতর থেকে তখন সংস্কার, সম্পর্কের বাধা সব লুপ্ত হ'য়ে গেল মুহূর্ত্তের মাঝে;—সে ভুলে গেল যে গভীর রাত্রে একই ঘরে রয়েছে কেবলমাত্র সে, আর তার দূরসম্পর্কীয়া এক যুবতী বৌদি। অনীতার হাতের রক্ত দেখে তার মনটা সহানুভূতিতে কেঁদে উঠ্‌ল। সে গিয়ে তাড়াতাড়ি অনীতাকে দুহাতে তুলে ধরে নিয়ে গিয়ে তার বিছানায় বসিয়ে দিলে। তার সুটকেশ খুলে একটা ফরসা কাপড় বার করে তাই ছিঁড়ে অনীতার হাতের ক্ষতস্থানটা বাঁধ্‌তে সুরু করে দিল।—বাঁধ্‌তে অসুবিধা হচ্ছিল বলে সে অনীতার হাতটা নিজের কোলের উপর টেনে নিল। অনীতার সারা শরীর এতক্ষণ থর থর করে কাঁপছিল;—এখন নিশীথ তা'র হাতটা কোলের উপর টেনে নিতেই তা'র সারা শরীরের মধ্যে একটা শিহরণ খেলে গেল। নিশীথের স্পর্শটা তার শরীরের মধ্যে বিদ্যুৎস্পর্শের মত মনে হ'তে লাগল।—বাঁধ্‌তে বাঁধ্‌তে নিশীথ জিজ্ঞাসা কল্লে—"কি জন্যে এ সময়ে এত রাত্রে নেমে এসেছিলে ভাই?"

অনীতার শরীরের সকল রক্ত যেন হঠাৎ জমাট হয়ে গেল। সে প্রথমটা ভেবেই পেল না কি বল্‌বে—কারণ সে ত নিজেই ঠিক এখানে আসবে বলে আসেনি। পরমেশের মাথার কাছে বসে সে ভাব্‌ছিল নিশীথের আসন্ন বিদায়ের কথা। ভাব্‌তে ভাব্‌তে তার বুকটা এক মহাব্যথায় ভরে উঠ্‌ল—মনের ভিতরকার যে প্রবৃত্তিটাকে সে এত দিন চাপা দিয়ে রেখেছিল—বাইরে প্রকাশ হ'তে দেয়নি, সেই প্রবৃত্তিটা আবার আজ মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়াল তা'র মনের মাঝে। হঠাৎ তার অন্তরে এক মহা উন্মাদনার সৃষ্টি হ'ল। তার পর যেন তার মাথার মাঝে এক প্রলয় নাচন সুরু হ'ল। সে ধীরে ধীরে পরমেশের কাছ থেকে উঠে নেমে এল নিশীথের ঘরের দিকে। কিন্তু অনীতার তখন সত্যিকারের জ্ঞান ছিল না;—সত্যিকারের জ্ঞান হ'ল তখনই যখন সুটকেশটা পায়ে বেধে সে পড়ে গেল।—তখন তা'র মনে হ'ল কি করেছে সে—এতদিনের সংযম, সাধনা বিফল করে নিজের সর্ব্বনাশ করেছে সে?—তাই নিশীথের কথার

প্রথমে কোন উত্তর খুজে পেল না সে।—একটু পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে বল্ল—"আমার শরীরটা বড় খারাপ বোধ হচ্ছিল; আর বস্‌তে পার্‌ছিলাম না। তাই তোমাকে ডাক্‌তে এসেছিলাম—তোমার দাদার কাছে একটু বস্‌বে বলে।"

নিশীথ সে কথা পূর্ণ বিশ্বাস করে স্নেহবিগলিত স্বরে বল্লে—"তা বেশ করেছিলে;—কিন্তু একটা আলো হাতে আস্‌তে হয়। দেখ দেখি, পড়ে গিয়ে হাতটা কতখানি কেটে গেছে—" বলে সে অনীতার সেই ক্ষত-স্থানটার চারিধারে স্নেহভরে হাত বুলাতে লাগল। নিশীথের স্নেহভরা কথায়, নিশীথের স্পর্শে অনীতার সমস্ত সংযমের বাঁধ আজ এক নিমিষে চুরমার হয়ে গেল। সে সব ভুলে গিয়ে নিশীথের হাত দুটী সবলে চেপে ধরে তা'র রক্তরাঙ্গা চোখদুটী নিশীথের মুখের দিকে তুলে আবেগ-কম্পিত স্বরে ডাক্‌লে—"ঠাকুরপো, ঠাকুরপো—"

নিশীথ তার এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখে মহা বিস্মিত হয়ে শুধু বল্লে—"কি বৌদি?"

অনীতার সারা শরীর তখনও থর থর করে কাঁপছিল;—তার বুকের মধ্যে একটা আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠ্‌ছিল—তা'র ইচ্ছা হচ্ছিল ঐ সম্মুখের মানুষটাকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরে তার ঐ প্রশস্ত বুকের মাঝে মুখটী রেখে বল্‌তে—"আমি আমার শত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তোমাকে আমার সর্ব্বস্ব দান করে যে একেবারে নিঃস্ব হয়ে বসে আছি।"—তা'র এ আকাঙ্ক্ষা, এ ইচ্ছাকে আজ আর কোন কিছুই দমিয়ে রাখ্‌তে পাচ্ছিল না—লোকলজ্জা না—তা'র আবাল্যের সতীত্বের সংস্কারও না। অনীতা একেবারে আত্মজ্ঞান হারিয়ে ফেলে নিশীথের হাত-দুটী সবলে তা'র বুকের মধ্যে টেনে নিতে গেল—এমন সময় উপর থেকে হঠাৎ তার কাণে এসে পৌঁছল পরমেশের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর—"অনীতা, অনীতা, কোথায় গেলে—" অনীতার কাণে সে স্বর অগ্নিশলাকার মত এসে বিঁধ্‌ল। সে চমকে উঠে নিশীথের হাত ছেড়ে দিয়ে মুহূর্ত্তের মধ্যে বিদ্যুৎবেগে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নিশীথ খানিকক্ষণ তেমনিই বসে রৈল। অনীতার এর আগেকার দু-একদিনে ব্যবহার নিশীথের মনে মহা বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে বটে, কিন্তু কোনও সন্দেহের দোলা দেয়নি। আজ কিন্তু অনীতার এই আত্মহারা ব্যবহারে নিশীথের সরল মনের মাঝেও একটা সন্দেহের সুস্পষ্ট ছায়াপাত হ'ল। মনটা তা'র এই নিয়েই নাড়াচাড়া কর্ত্তে লাগল। তার অন্তরের মধ্যে কে যেন বল্‌লে যে, তা যদি হয় ত বড় অন্যায়; কিন্তু তা বলে ও-কথা ভাবতে তা'র মনে যে খুসীরও একটু ছোঁয়াচ লাগল না তা নয়।—ভাব্‌তে ভাব্‌তে কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছিল আবার, তা সে জানে না। যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন দেখ্‌ল যে রোদ এসে ঘর ভরে গেছে—বেলা হ'য়ে গেছে অনেক। অন্যদিন হলে অনীতা তাকে ডেকে দিত—ঠাট্টা করে হয় ত হেসে বল্‌ত—"নবাব, ওঠা হোক, আপনার চা প্রস্তুত।" কিন্তু আজ আর সে ডাকেনি।

নিশীথ বাইরে এসে দেখ্‌লে যে অনীতা তা'র দৈনিক কাজে ব্যস্ত। সে জিজ্ঞাসা কর্ল্লে—"দাদা কেমন আছেন, বৌদি?"

—"ভাল।"

নিশীথ আবার বল্লে—"তুমি কাল শরীর খারাপ বলে আমাকে ডাক্‌তে গেলে, কিন্তু—"

কথার মাঝে বাধা দিয়েই অনীতা একটী ছোট্ট শুষ্ক উত্তর দিলে—"আর দরকার ছিল না।"

নিশীথ বল্লে—"আজ সকালেই আমি যাব মনে আছে ত বৌদি! সকাল সকাল দুটী ভাত চাই—"

অনীতা শুধু বল্লে—"সে আমার মনে আছে।"

অনীতা পিছন দিয়ে বসেই কাজ কর্চ্ছিল—এতক্ষণেও সে ফিরে একবার নিশীথের দিকে তাকাল না। অগত্যা নিশীথ সেখান থেকে আস্তে আস্তে চলে গেল;—যাওয়ার সময় বল্লে—"আমি মুখ ধুয়ে আমার ঘরে যাচ্ছি—তুমি সেইখানেই 'চা' নিয়ে এস বৌদি।"

অনীতা একটু চীৎকার করেই বল্লে—"না, তুমি উপরে তোমার দাদার কাছে বসগে—তিনি জেগে আছেন—আমি সেইখানেই তোমার চা নিয়ে যাচ্ছি।"

সেদিন সকাল বেলাটীতে ঘুরতে ফিরতে নিশীথের সঙ্গে অনীতার অনেকবারই দেখা হয়েছে। কিন্তু অন্য দিনের মত আজ একটী বারও হাসি-তামাসায় তা'দের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি—এমন কি বিদায়ের পূর্ব্বে দুই প্রিয়-জনের মধ্যে যে করুণ অথচ স্নেহভরা কথার বিনিময় হয়,

তাও হয়নি। যা দু-একটী কথা না বল্‌লে নয় তাই শুধু বলেছে অনীতা। অনীতার আজকের এ শুষ্ক ব্যবহারে নিশীথের মনটা বেশ একটু বিষণ্ণই হ'য়ে পড়েছে। কালকের রাত্রিকালের সে সন্দেহের ছায়া কখন সরে গিয়ে তার জায়গায় একটা উল্টো ধারণাই আজ তার মনে স্থান অধিকার করেছে। মনুষ্য-চরিত্রে অনভিজ্ঞ নিশীথ আজ শুধুই ভাব্‌ছে কতটা ভুল ধারণাই করেছিল সে। বৌদিকে ছাড়তে আজ তা'র এতটা কষ্ট হ'চ্ছে, আর তার বৌদি একবারটীও একটা মিষ্টি কথা পর্য্যন্ত বল্‌ছে না তাকে—বলছে না একটী বারও—"নিশীথ ঠাকুরপো, তুমি চলে গেলে বড় খারাপ লাগ্‌বে," কি "তোমার কথা খুব মনে পড়্‌বে"—কিছু না! এতটুকু স্নেহেরও কি যোগ্য নয় সে! —বুকটা তার অভিমানের ব্যথায় রণিয়ে উঠল।

নিশীথের যাওয়ার সময় হ'য়ে এল। সে পরমেশকে গিয়ে প্রণাম করে দাঁড়াতে পরমেশ স্নেহ-বিগলিত কণ্ঠে বল্লেন—"নিশীথ, আজ তুই চলে যাচ্ছিস—কতটা কষ্ট যে তাতে আমার হ'চ্ছে, তা' আর কি বলব! আমাকে মরণের পথ থেকে যে জীবনের পথে মোড় ফিরিয়ে দিয়ে গেলি কত চেষ্টা কত যত্ন করে—তা আমি যে কটা দিন বেঁচে থাক্‌ব মনে রাখ্‌ব।"

অনীতার ব্যবহারে অভিমান-ক্ষুব্ধ নিশীথের মনটা অল্প-ভাষী পরমেশের স্নেহমাখা এই কটা কথাতেই গলে গেল। সে শুধু বল্লে—"আমি ত—বিশেষ কিছুই করিনি পরমেশদা, বৌদিই করেছেন সব; আমি তাঁর সাহায্য করেছি মাত্র। আচ্ছা তা' হ'লে আসি পরমেশদা—" বলে সে নীচে নেমে এল। তারপর সুটকেশটা আর বিছানাটা নিয়ে সে রান্না-ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। অনীতা তখন রান্নাঘরে বসে উনুনে নূতন করে কয়লা দিচ্ছিল—ধোঁয়াতেই লাল হয়েছিল। নিশীথ এসে ছোট একটী প্রণাম করে বল্লে—"বৌদি, তাহলে চল্লাম ভাই।"

উত্তরে অনীতা শুধু বল্লে—"এস।"

স্নেহ-পাগল নিশীথ ভেবেছিল যে যাওয়ার সময় অন্ততঃপক্ষে তার বৌদি তাকে বল্‌বে যে, আজ তাকে ছেড়ে দিতে তার বড় কষ্টে হচ্ছে; তা না ব'লে একটা ছোট্ট "এস" বলেই চুপ করে বসে রৈল;—তখন আশাহত নিশীথ আর তার বৌদির মুখের পানে ভাল করে মুখ তুলে তাকাতে পার্ল্‌না। শুধু একটী ছোট্ট "আচ্ছা" বলে তার প্রকাণ্ড সুটকেশটা আর বিছানাটা তুলে নিয়ে বার হয়ে এল—চোখ দুটী তার তখন অভিমানের ব্যথায় ছল ছল কর্চ্ছে।

গ্রামের সেই সরু-পথটা ধরে সে ষ্টেশনের দিকে চলেছিল —মনটা তার কেবলি গুমরে গুম্‌রে উঠছিল এই ভেবে যে, সে কি এতটুকু স্নেহ, এতটুকু মিষ্ট ব্যবহারের যোগ্য নয়।— সামনের দিকে দৃষ্টি রেখেই সে চলেছিল—যদি একবারটীও সে পিছন ফিরে তাকাত সেই বাড়ীটার দিকে, যে বাড়ীটা সে এক্ষণি ছেড়ে এসেছে, তাহ'লে তার চোখে পড়্‌ত—সেই বাড়ীটার দোতলার জানালা থেকে দুটী চোখ ব্যাকুলভাবে এক-দৃষ্টে চেয়ে আছে তা'র দিকে—আর সেই ধোঁয়ায় লাল চোখ দুটী থেকে অশ্রু-বিন্দু টপ্‌ টপ্‌ করে ঝরে পড়ছে সেই ভাঙ্গা জানালায় উপর—।

এর পরে আরও কিছুদিন চ'লে গেছে কালের গর্ভে।—পরমেশ একেবারে রোগমুক্ত হয়েছেন।—দিন যেমন চলেছিল পরমেশের অসুখের পূর্ব্বে, এখনও তেমনিই চলছে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে হয় ত পাড়ার লোকে এসে পরমেশের অসুখের কথা উঠলে তা'রা রোজই প্রায় বলে "পরমেশবাবু সেরে উঠবেন না ত উঠবে কে? ঐ-রকম সতী স্ত্রী যার তার কখন কোনও আশঙ্কা থাকতে পারে জীবনের? কি প্রাণপাত করে সেবা! পুরাণে সতী সাবিত্রীর গল্পই পড়েছি, কলিতে সাক্ষাৎ সতী সাবিত্রী দেখলাম।"

অনীতা তখন হয় ত নিশীথ যে ঘরটীতে থাকৃত, সেই ঘরটীর কোনও জানালায় বসে দু'রে সেই ঘন বনানীর দিকে তাকিয়ে থাকে। তার কাণে ভেসে আসে বাইরের কথা বার্ত্তা।—শুনে ম্লান হাসি হাসে সে;—মনে মনে ভাবে—সতী! মস্ত বড় সতী বলেই লোকে তাকে জান্‌ল।—সামান্য একটা সুটকেশের ধাক্কা কিংবা সামান্য একটা লোকের ডাকের জন্য আজ তার বাইরের সতীত্বটা বজায় থেকে গেল লোকে বাইরেটাই দেখে, অন্তরটা কেউ দেখে না!

ধীরে ধীরে সে উঠে দাঁড়ায়; চোখ দুটীতে হয় ত তার অজ্ঞাতে দুটী বিন্দু অশ্রু এসে টলমল করে;—সামনের সব কিছুর উপর আঁধারের আঁচল বিছিয়ে হয় ত তখন ধরার বুকে সন্ধ্যা নেমে আসে।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

স্বপ্ন-রহস্য

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

কাম-মূলক মনোভাব

ছেলে-মেয়েরা সাধারণতঃ আত্মসর্ব্বস্ব। সেইজন্য তাহারা প্রথমে নিজেদের ভালবাসে, এবং নিজ দেহের উপর কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। পরিণত বয়সে ইহার পরিণাম কিছু উৎকট হইয়া পড়ে।

কিছুকাল আত্ম-তৃপ্তি সাধনের পর বালক-বালিকারা তাহাদের এই অনুরাগ নিজের উপর হইতে স্থানান্তরিত করিয়া পিতামাতা, ভাই-ভগিনীর উপর স্থাপন করে। বালকরা তাহাদের জননী-ভগিনীর এবং বালিকারা তাহাদের পিতা অথবা ভ্রাতাদের প্রতি অনুরক্ত হয়। এই অগম্য ও অগম্যা নর-নারীর সম্পর্কে মানসিক অভিসার-নিচয়ের নাম দিয়াছেন ফ্রয়ড—Œdipus Complex। Œdipus একজন গ্রীক রাজা। তাঁহার পারিবারিক কলঙ্কমূলক একটি উপাখ্যান হইতে এই নামটি সঙ্কলিত হইয়াছে। এটি হইল ছেলেদের মনোভাব। আর, মেয়েদের মনোভাবের নাম দেওয়া হইয়াছে Electra-Complex। ইহারও সংশ্রবে ঐরূপ একটি উপাখ্যান প্রচলিত আছে। ফ্রয়ড প্রথম উপাখ্যানটি সোফোক্লেসের (Sophocles) বর্ণনা হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই যে, রাজা Œdipus তাঁহার জননীর প্রতি 'অনুরক্ত' হইয়া (falling in 'love') তাঁহাকে পত্নীরূপে লাভ করিবার জন্য নিজের পিতাকে বধ করেন। Beeton's Classical Dictionaryতে Œdipus সংজ্ঞায় দেখিতেছি গল্পটি অন্য রকম। Œdipus শব্দের অর্থ গোদা-পা। রাজপুত্রের এইরূপ নাম হইবার কারণ কি? কারণ এই—Thebesএর রাজা ছিলেন Laius, আর রাণী ছিলেন Creonএর ভগিনী Jocasta। Œdipus ছিলেন ইঁহাদের পুত্র। Laius দৈববাণী (oracle) শুনেন যে, তাঁহার পুত্র তাঁহার প্রাণবধ করিবে। সেইজন্য রাণীর সদ্যোজাত শিশু-সন্তানের পায়ের ছিদ্র করিয়া উভয় পদ একত্র বন্ধন করিয়া Mount Cithæron নামক পর্ব্বত-শিখরে নিক্ষেপ করা হয়। শিশুর দুই পা ফুলিয়া গিয়াছিল বলিয়া রাজকুমারের নাম হয় গোদা-পা (Œdipus)। এক রাখাল বালক শিশুকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে স্বীয় প্রভু—করিন্থের রাজা Polybusএর কাছে লইয়া যায়। রাজা পোলিবাস কুড়ানো ছেলেকে নিজ পুত্ররূপে লালন-পালন করেন। বড় হইয়া এড্ডিপাস ডেলফির মন্দিরে দৈববাণী শুনিতে গমন করেন। দৈববাণীতে তাঁহাকে উপদেশ দেওয়া হয় যে, তিনি যেন গৃহে প্রত্যাগমন না করেন; করিলে তিনি তাঁহাকে পিতৃ-বধের পাপ অর্জ্জন করিতে হইবে। এড্ডিপাস জানিতেন পোলিবাস তাঁহার পিতা, এবং এই পালক পিতাকে তিনি ভালও বাসিতেন। পাছে স্নেহময় পিতাকে বধ করিতে হয়, এই আশঙ্কায় তিনি নিজ গৃহ করিন্থে না গিয়া ফোসিস নামক স্থানের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। এড্ডিপাসের আসল পিতা—থিবসের রাজা লেয়াস এই সময়ে রথারোহণে ডেলফির মন্দিরে যাইতেছিলেন। পথের একটা অপ্রশস্ত অংশে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। ইঁহাদের প্রত্যেকেই অপরকে পথ ছাড়িয়া দিতে অস্বীকার করায় উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধে লেয়াস নিজ পুত্রহস্তে নিহত হইলেন, দৈববাণী সফল হইল। লেয়াসের অপর কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় তাঁহার সম্বন্ধী ক্রিয়োন উত্তরাধিকারী হইয়া ঘোষণা করিলেন যে, যে-কেহ স্ফিঙ্ক্‌সের সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে, তাহাকে থিবসের সিংহাসন অর্পণ করা হইবে এবং রাণী জোকাষ্টার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দেওয়া হইবে। এই ঘোষণা-বাণীতে আকৃষ্ট হইয়া এড্ডিপাস থিবসে গমন করিলেন, এবং সমস্যার সমাধান করিয়া দেওয়ায় রাজ্যলাভ করিলেন, রাণীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহও হইল। এই রাণীর গর্ভে তাঁহার চারিটি সন্তান জন্মিল। কিছু কাল পরে থিব্‌স্ নগরে প্লেগের মড়ক উপস্থিত হইল। তখন দৈববাণী হইল যে, রাজা লেয়াসের হত্যাকারীকে থিব্‌স্ হইতে নির্ব্বাসিত করিলে তবে মড়ক থামিবে। যে রাখাল পর্ব্বত-শিখরে পরিত্যক্ত সদ্যোজাত শিশুকে রক্ষা করিয়াছিল, সেই রাখালই রাজা লেয়াসের হত্যাকারীকে আবিষ্কার করিল, এবং রাজার আত্মজ বলিয়া সনাক্ত করিল। দৈবদৃষ্টিসম্পন্ন টাইরেসিয়াসও এই আবিষ্ক্রিয়ার সমর্থন করিল। রাণী জোকাষ্টা যখন জানিতে পারিলেন যে, তাঁহারই গর্ভজাত পুত্র তাঁহার বর্ত্তমান স্বামী, এবং এই পুত্রেরই ঔরসে তিনি চারিটি সন্তানের জননী হইয়াছেন, তখন ঘৃণায়, দুঃখে মর্ম্মাহত হইয়া জোকাষ্টা গলায় ফাঁসী দিয়া আত্মহত্যা করিলেন। এড্ডিপাসও যখন জানিতে পারিলেন যে, তিনি নিজের পিতৃহন্তা, এবং নিজের মাতৃহরণকারী, তখন তাঁহারও ঘৃণা-দুঃখ কম হইল না। আত্ম-গ্লানিতে অধীর হইয়া এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য তিনি নিজের চক্ষুর্দ্বয় উপড়াইয়া ফেলিলেন, এবং স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসন দণ্ড গ্রহণ করিলেন।

সোফোক্লেসের বিবরণটি কিরূপ তাহা জানি না; কিন্তু এই গল্পে দেখিতেছি, এড্ডিপাস তাঁহার জননীর প্রতি 'অনুরক্ত' হইয়া জোকাষ্টাকে 'মা বলিয়া জানিয়া' তাঁহাকে বিবাহ করেন নাই, কিম্বা জানিয়া শুনিয়া নিজ জননীকে পত্নীরূপে লাভ করিবার জন্য লেয়াসকে তাঁহার পিতা বলিয়া জানিয়া বধ করেন নাই। তিনি একটা সমস্যার সমাধান

করিয়া তাহার পুরস্কার স্বরূপ নিজের অজ্ঞাতসারেই তাঁহার নিজেরই পিতৃরাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, এবং সেই দেশের রাণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বরং শেষে যখন তিনি এবং তাঁহার জননী জোকাষ্টা জানিতে পারিলেন যে, একজন জননী এবং অপর তাঁহার পুত্র, তখন উভয়েই তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে অনুষ্ঠিত অগম্যা-গমন-জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন—একজন আত্মহত্যা করিয়া এবং অপর জন নিজ চক্ষুরুৎপাটন করিয়া ও স্বেচ্ছায় আত্ম-নির্ব্বাসন করিয়া। এই ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া Œdipus-Compelx নামক একটা বৈজ্ঞানিক থিওরী গঠন করা ফ্রয়ডের পক্ষে কতটা যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। এরূপ একটা অবৈধ ব্যাপারের সংস্রবে এমন একটা থিওরী গঠনের পূর্ব্বে ইহার সমর্থনসূচক আরও অন্যান্য প্রমাণ সংগ্রহ করা ফ্রয়ডের পক্ষে উচিত ছিল বলিয়া মনে হয়, যে, পরস্পরের জ্ঞাতসারে মাতা-পুত্রের মধ্যে প্রেম এবং সংসর্গ ঘটিয়াছে। আর সেই প্রমাণ কল্পিত উপন্যাস না হইয়া প্রত্যক্ষ ও সত্য ঘটনা মূলক হওয়া উচিত। আমাদের দেশে এরূপ দুর্ঘটনা বাস্তব জগতে কল্পনাতীত ব্যাপার; এবং যদিই বা পরস্পরের অজ্ঞাতসারে এরূপ ঘটনা ঘটিয়া যায়, এমন কি বিমাতা ও সপত্নীপুত্রের মধ্যে ঘটিলেও, তাহা মহাপাপ বলিয়া গণ্য হয়; এবং তাহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত—তুষানল।

Beeton's Classical Dictionaryতে Electraর ব্যাপারটা এইরূপ—ইলেক্‌ট্রা রাজা আগামেমননের কন্যা। রাজা আগামেমনন ট্রয়-যুদ্ধজেতা বীর। তিনি ছিলেন মাইসিনি ও আর্গোসের রাজা। তাঁহার রাণীর নাম ক্লাইটেমনেষ্ট্রা। আগামেমনন ট্রয় হইতে ফিরিয়া আসিলে রাণী ক্লাইটেমনেষ্ট্রা তাঁহার উপপতি ইজিস্থাসের সাহায্যে আগামেমননকে হত্যা করেন। ইলেকট্রা আগামেমননের পুত্র তাঁহার ভ্রাতা ওয়েষ্টেসকে উত্তেজিত করিয়া ভ্রাতার দ্বারা স্বামীঘাতিনী তাঁহাদের জননী ক্লাইটেমনেষ্ট্রার বধসাধন করাইয়া পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। এ ক্ষেত্রেও দেখিতেছি, ইলেক্‌ট্রা যে তাহার পিতার প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী ছিল এমন কোন কথা নাই। স্নেহময় পিতার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের প্রয়াস কন্যার পক্ষে এমন কি অস্বাভাবিক ব্যাপার তাহাও বুঝা যায় না।

ফ্রয়ডের ধারণা, স্নায়ুঘটিত পীড়া মাত্রেরই মূলে এই দুইটি কম্‌প্লেক্সের (মনোভাবের) একটি না একটি আছেই; এবং এই জন্যই অন্যান্য পণ্ডিতরা তাঁহার মতের বিরোধী। ফ্রয়ড প্রথমে বলিতেন, তরুণ বয়সে যৌন ব্যাপার সম্পর্কে মানসিক বিপর্য্যয় সংঘটনের (অর্থাৎ কোনরূপ ব্যর্থ-প্রেমের) ফলে পরবর্ত্তী জীবনে স্নায়বিক বিকার জন্মে। পরে তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হয়, এবং তিনি বলিতে থাকেন যে, বংশানুক্রমিক কামপরতন্ত্রতা, শিশুসুলভ যৌনপ্রচেষ্টা, ইন্দ্রিয় সেবায় অতৃপ্তি, কিম্বা অতিমাত্র ইন্দ্রিয়-চর্চ্চা—এইরূপ কোন না কোন কারণে ঐ রোগ ঘটিয়া থাকে। ফ্রয়ডের সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক মত এই যে, যৌন-জীবন অস্বাভাবিক না হইলে প্রকৃত পক্ষে স্নায়বিক বিকার রোগ জন্মিতে পারে না। কিন্তু আধুনিক খাদ্যতত্ত্বজ্ঞ চিকিৎসা বৈজ্ঞানিকরা বলিতেছেন, খাদ্যে "বি" ভাইটামিনের অভাবই স্নায়বিক রোগের কারণ।

এ বিষয়ে ফ্রয়ডের যুক্তির ধারা কতকটা এইরূপ—শিশুর সকল অভাব-অভিযোগ মিটাইবার সর্ব্বপ্রধান পাত্রী—জননী। এই কারণে স্বভাবতই জননী পুত্রের প্রথম ভালবাসার পাত্রী। পুত্র জননীর কাছ হইতে সেবা পাইবার একচেটিয়া অধিকার পাইতে ইচ্ছুক। জননীর নিকট পিতার উপস্থিতি সে প্রতিদ্বন্দ্বীর উপস্থিতির ন্যায় দেখে এবং ঈর্ষাপ্রণোদিত হইয়া ক্রোধ প্রকাশ করে। সে মায়ের কাছে শুইতে চায়। শয়নের পূর্ব্বে মা যখন বস্ত্র পরিত্যাগ করেন, তখন সে তাহা আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করে; মায়ের গোপনীয় আচরণগুলির সম্বন্ধে তাহার কৌতূহল সদা-জাগ্রত। সময়ে সময়ে সে মায়ের সহিত সহবাস করিবার জন্য শিশু-সুলভ চেষ্টা করে। সময়ে সময়ে মাতার পরিবর্ত্তে ভগিনী শিশুর অবৈধ আকর্ষণের পাত্রী হইয়া উঠে। ফ্রয়ড বিবেচনা করেন, বালকের প্রথম প্রণয়-পাত্রী নির্ব্বাচন সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র অবৈধ ভাবে ঘটিয়া থাকে। ইহার প্রমাণস্বরূপ ফ্রয়ড বন্য অসভ্য সমাজের রীতি-নীতি ও আইন-কানুনের দৃষ্টান্ত উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, মাতা-পুত্রের বা পিতা-পুত্রীর অবৈধ যৌন-সম্মিলন সংরোধের জন্য অসভ্য বন্য সমাজে অসংখ্য আইন ও বিধি-নিষেধ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে! স্বভাবতঃ যৌন-সম্মিলনের কামনা পরিবারের বহির্ভূত ব্যক্তিগণের উপর অর্পিত হয়; আর বাহিরের লোকের সঙ্গে "প্রেমে পড়া"র পরিণামে আদর্শ বিবাহ সংঘটিত হইয়া থাকে।

কিন্তু ফ্রয়ডের এই যুক্তি কতদূর বিচারসহ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা দরকার। ফ্রয়ড বিশেষ করিয়া মায়ের প্রতি ছেলের ভাব কিরূপ তাহাই বলিয়াছেন—মেয়ের কথা বলেন নাই। কিন্তু মায়ের প্রতি মেয়ের ভাবও কি ঠিক সেই রকমই নহে? ছেলে যেমন তাহার সকল অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের জন্য মায়ের কাছে ছুটিয়া আসে, মেয়েও কি ঠিক সেইভাবেই আসে না? ছেলে যেমন মায়ের উপর একাধিপত্যের দাবী করে, মেয়েও কি ঠিক তাহাই করে না? ফ্রয়ড যুক্তি দিতেছেন, মায়ের নিকট পিতার উপস্থিতি ছেলে প্রতিদ্বন্দ্বীর চক্ষে দেখিয়া থাকে, মেয়ে তাহা পারে না, ইহা স্বীকার করিতেই হয়। ফ্রয়ডের যুক্তির অনুমোদন করিতে গেলে বলিতে হয়, পিতা-মাতা যখন একত্র অবস্থিতি করেন, তখন মেয়ের পক্ষে মাতাকে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিনী হিসাবে দেখিবার কথা। কিন্তু বস্তুতঃ মেয়ে তাহা করে না। পিতার উপস্থিতির দরুণ মাতার উপর মেয়ের একাধিপত্য ক্ষুণ্ণ হইবার উপক্রম দেখিলে মেয়েও পিতার উপস্থিতিতে রাগ প্রকাশ করে—যদিও সে পিতাকে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখিতে পারে না, এবং মাতাকে প্রতিদ্বন্দ্বিনীরূপে দেখে না। ফ্রয়ডের যুক্তি অনুযায়ী মাতার প্রতি ছেলের ভাব যেরূপ, পিতার প্রতি মেয়েরও সেই ভাব হওয়া উচিত; কিন্তু তাহা হয় না। ভাইএর ন্যায় বোনও মা বলিয়াই কাঁদে, মাকেই ডাকে, অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের জন্য মায়েরই কাছে আসে—বাবা বলিয়া কাঁদেও না, বাবাকে ডাকেও না, অভাব-অভিযোগের কথাও বাবাকে জানাইতে যায় না। অতি-শিশু দুই ভাই-বোন মায়ের উপর একাধিপত্য লাভের জন্য, মায়ের একলা দখল করিবার জন্য পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া, মারামারিও করে

মাকে ছেলেও যেমন ভালবাসে, মেয়েও ঠিক তেমনি ভালবাসে। তাহা হইলে কি বলিতে হইবে যে মেয়েও ছেলের ন্যায় মাকে অবৈধ প্রণয়পাত্রী বলিয়া মনে করে? এরূপ যুক্তির মর্ম্ম অনুধাবন করা কঠিন। আমরা ত একেবারেই অসমর্থ। বোধ হয় এই কারণেই ফ্রয়ডের সহযোগী মনোবৈজ্ঞানিকগণ তাঁহার থিয়োরীর বিরোধী। ফ্রয়ড 'এড্‌ডিপাস কম্‌প্লেক্সে'র উপর অত্যন্ত বেশী পরিমাণে নির্ভর করিয়াছেন; এমন কি তিনি যে নূতন মনোবিজ্ঞান-শাস্ত্র গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহার মূল ভিত্তিই এই। কিন্তু পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে, এ বিষয়ে তাঁহার যুক্তি অতি দুর্ব্বল; কাজেই তাঁহার বিচার প্রণালীর মধ্যে এড্‌ডিপাস কমপ্লেক্সই দুর্ব্বলতম অংশ। তাঁহার মনো-বিশ্লেষণ প্রণালীর যাঁহারা অনুমোদন করেন, তাঁহারাও বিবেচনা করেন যে, ফ্রয়ডের 'এড্‌ডিপাস-কমপ্লেক্সে'র কল্পনা অতিরঞ্জিত, ভিত্তিহীন।

অবৈধ সঙ্গমেচ্ছা নিতান্ত অস্বাভাবিক ব্যাপার। উহা কেবল বিকারগ্রস্ত মানসিক অবস্থাতেই সম্ভব। সুস্থ চিত্তে মানুষ ইহার কল্পনা করিতে পারে না। পৃথিবীর সকল সমাজেই এই প্রবৃত্তি অস্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত হয়, এবং বিশ্বের সমগ্র জনসাধারণই ইহাকে ভীতির চক্ষে দেখিয়া থাকে। যেখানেই এই সাধারণ ধারণার বিপরীত ভাব দেখা যায়, সেইখানেই উহা অস্বাভাবিক মনোভাব বলিয়া বুঝিতে হইবে,—জানিতে হইবে, লোকটিকে সুস্থ দেখাইলেও, সে বাস্তবিক সুস্থ ও স্বস্থ নহে। হয় তাহার মস্তিষ্ক বিকারগ্রস্ত, না হয়, তাহার মানসিক অবস্থা বিকৃত, আর, না হয়, তাহার স্নায়ুমণ্ডলী পীড়িত। পিতা-মাতার সহিত সন্তানগণের অবৈধ যৌন সম্বন্ধ বিশেষভাবে মানব-সমাজে ঘৃণিত ও নিষিদ্ধ।

ফ্রয়ডও স্বীকার করেন যে, স্নায়বিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা স্বাভাবিক মনোবৃত্তি সম্পন্ন নহে—তাহাদের অবস্থাকে অস্বাভাবিক অবস্থা বলিতেই হইবে। তাহারা স্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার সুযোগলাভ করিয়াও তাহাতে সন্তোষলাভ করিতে না পারিয়া নিজের অজ্ঞাতসারেই অস্বাভাবিক মানসিক অভিসারে লিপ্ত হয়—যত উদ্ভট কল্পনা তাহাদের মনে উদিত হয়।

ফ্রয়ড মানুষের মনের দুইটি ক্রিয়ার কল্পনা করিয়াছেন—(১) ভোগেচ্ছা,—Pleasure principle ও (২) বাস্তবতা, সতর্কতা—Reality principle। মানুষ মাত্রেরই মনে এই দুইটি ভাবের একটি না একটি প্রবল। প্রথম শ্রেণীর লোকরা কেবল সুখ ভোগ করিতে চায়। নিজের কামনা পূরণের জন্য তাহারা কোন বাধা-বিঘ্ন মানে না, অপর লোকের সুবিধা অসুবিধা গ্রাহ্য করে না—কেবল নিজেদের সুখটুকু হইলেই হইল। ইহারা পূর্ণমাত্রায়ই স্বার্থ সর্ব্বস্ব। ইহারা কল্পনাপ্রবণ—আকাশ-কুসুম রচনায় সিদ্ধ-হস্ত। বাস্তব কার্য্যক্ষেত্রে যাহা দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য—যাহা লাভ করা অসম্ভব, সেই সকল অবাস্তব অসম্ভব সুখ ভোগের দিবা-স্বপ্ন ইহারা দেখিয়া থাকে। বাস্তব জীবনে যাহার অভাব, ইহারা কল্পনায় তাহার অভাব পূরণ করিয়া লয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকরা বৃথা কল্পনায় মানসিক শক্তি হ্রাস করিবার বিরোধী। তাহাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথে যে সকল বাধা-বিঘ্ন থাকে, ইহারা তাহা খতাইয়া দেখে, সেই সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করে; এবং যতটুকু পারে বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বাস্তব কার্য্য-ক্ষেত্রে যাহা লাভ করিতে পারে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে। প্রথম মনোভাবটি ফলাফলের অপেক্ষা না রাখিয়া মানুষকে সুখ ভোগের প্রবৃত্তি দান করে। আর দ্বিতীয় প্রকার মনোভাব ফলাফলের কথা চিন্তা করিয়া অসঙ্গত কামনা সংযত করিবার প্রবৃত্তি দেয়।

ফ্রয়ডের এই সিদ্ধান্তটি যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। বিশ্বের কর্ম্ম-ক্ষেত্রে ইহার দৃষ্টান্ত নিয়তই দেখা যায়। ইহাকে কতকটা আমাদের অদৃষ্টবাদ ও পুরুষকারের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এমন অনেক লোক আছে যাহারা ফলাফলের কথা চিন্তা না করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়ে—লাগে তুক্ না লাগে তাক্। ইহারা হয় সফলতা লাভ করে, না হয়, সংসার সমুদ্রে ডুবিয়া মরে। পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক বড় বড় বিশ্বজয়ী বীরের এইরূপ মনোভাব দেখা গিয়াছে। আর, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক কর্ম্ম-ক্ষেত্রে যদি এক পদ অগ্রসর হয়, ত, দশ পদ পশ্চাৎগামী হয়। ইহারা খুব বড় কাজ বেশী করিতে পারে না, তবে একেবারে পতনও ইহাদের হয় না। সংসারের অধিকাংশ লোকই এই শ্রেণীর। ইহারা অতি-ভোগ-পরায়ণও নয়, আবার অতি-দুঃখীও নয়।

মধুর অভাবে গুড়ে সন্তুষ্ট থাকিবার ক্রিয়া এই বিশ্ব সংসারে অহরহঃ চলিতেছে। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার সীমা নাই। সঙ্গত হউক অসঙ্গত হউক, মানুষ অনেক আশা করিয়া থাকে। কিন্তু মানুষের কয়টা আশা পূর্ণ হয়? প্রথমতঃ, অসঙ্গত আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা আদৌ নাই। দ্বিতীয়তঃ, আশার শেষ না থাকিলেও, তাহা মিটাইবার ক্ষমতা আমাদের সীমাবদ্ধ। তৃতীয়তঃ, ক্ষমতা থাকিলেও, আশা পূর্ণ হওয়ার পথের সম্মুখে বাধা-বিঘ্নের হিমালয় দণ্ডায়মান। তাহা অতিক্রম করিয়া কয়টা আশা পূর্ণ হইতে পারে? অতএব বাস্তব জগতে নানা কারণে মানুষের অনেক আশা পূর্ণ হইতে পারে না। তাই বলিয়া কি মানুষ আশা করিতে বিরত হয়? কিন্তু যে আশা পূর্ণ হইবার নয় এরূপ বৃথা আশা করিয়া লাভ কি? লাভ কিছুই নাই, তবু মানুষ আশা করিতে ছাড়ে না। এবং বাস্তব জগতে আশানুরূপ ফল প্রাপ্তি না ঘটিলেও, কল্পনায়, স্বপ্নে মানুষ প্রাণ ভরিয়া আশা মিটাইয়া লয়। কায়ার অভাবে ছায়া লইয়া তাহাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়—ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া সে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখে।

উদ্ভট কল্পনার খেয়ালে শৈশব কাল হইতেই মানুষ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে দিবা-স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করে। বিশ্বব্যাপী প্রাধান্য লাভের কল্পনা প্রায় জন্ম-মুহূর্ত্ত হইতে মানব-চিত্তে স্থান লাভ করে। সদ্যোজাত শিশু কোন অসুবিধা বা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিলে কাঁদিয়া উঠে। অবলা শিশুর অভাব অভিযোগ জানাইবার একমাত্র উপায়—তাহার কান্না। মা কিম্বা অন্য কেহ শিশুর কান্না শুনিলেই ছুটিয়া আসে। দুই একবার এইরূপ আসিবার পর শিশু তাহার ক্রন্দনের শক্তি, তথা, তাহার নিজের শক্তির কথা জানিতে ও বুঝিতে পারে। তখন হইতেই শিশু এই শিক্ষা লাভ করে যে, তাহার ক্রন্দন উপেক্ষা করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই।

সে ক্রন্দন করিলে তাহাকে শান্ত করিবার জন্য কাহাকেও না কাহাকেও তাহার কাছে আসিতেই হইবে। মা কিম্বা দাস-দাসী কাহাকেও ডাকিতে হইলেই শিশু কাঁদিয়া উঠিবে। কেবল ক্রন্দন নহে; হাত-পা নাড়িয়াও শিশু তাহার অভাব জানায়, মাকে কিম্বা ধাত্রী প্রভৃতিকে আহ্বান করে। একজন ইয়োরোপীয় পণ্ডিত শিশুর এই অবস্থাকে সর্ব্ব-শক্তিমান অবস্থা বলিয়াছেন—এবং ঠিক কথাই বলিয়াছেন। যে যে বিষয়ে শিশুর স্বার্থ আছে সেই—খাদ্য, আরাম, নিদ্রা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে শিশু যে সর্ব্ব-শক্তিমান তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে?

শিশু যতটুকু অনুভব করিতে পারে, তাহার সম্বন্ধেই তাহার যাহা কিছু জ্ঞান জন্মায়। সেই জ্ঞানটুকুর সাহায্যে সে অনুমান ও কল্পনা করে যে, সমগ্র বিশ্বটা একমাত্র তাহারই—সে দয়া করিয়া তাহা গ্রহণও করিতে পারে, দয়া করিয়া বর্জ্জনও করিতে পারে। শিশুর যদি অনুগ্রহ হইল তবে হাতের কাছে আসিয়া পড়া জিনিসটি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরিয়া জানাইয়া দিল যে তাহার অনুগ্রহের সীমা নাই—সে জিনিসটি গ্রাহ্য করিয়াছে। আর নহে ত সে বস্তুটি গ্রহণ করিল না, অগ্রাহ্য করিয়া ঠেলিয়া দিল। এই ঘোর স্বার্থপর শিশুর এই অঙ্গ-চালনা তাহার ভাবী জীবনের পূর্ব্ব-সূচনা। স্বেচ্ছাচারী রাজার ন্যায় এই শিশু উৎপীড়ক তাহার নিজের আরাম, সুখ, সুবিধা ব্যতীত অপর কাহারও কোনও অধিকারই স্বীকার করে না। শিশুর প্রধান লোভ খাদ্য দ্রব্যের উপর। তাই তাহার নাগালের মধ্যে যাহা কিছু আসিয়া পড়ে তাহাই সে মুখে পূরিয়া দেয়। ধৃত বস্তুটি যদি খাদ্য নাও হয় তাহাতেই বা কি আসিয়া যায়—সাধ্য হইলে লালারস-সিক্ত করিয়া সে তাহা উদরস্থ করিবার চেষ্টা করে, আর অপরাগ হইলে বর্জ্জন করে কিম্বা কাঁদে। খাট, পালঙ্ক, বাক্স, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি টানিয়া নিজের কাছে আনিতে না পারিলে নিজেকেই উহাদের কাছে টানিয়া লইয়া যায়, এবং লেহন করিয়া উহাদের আস্বাদ গ্রহণের চেষ্টা করে। এইরূপে প্রথমে বস্তুতান্ত্রিক ভাবে শিশুর একচ্ছত্র অধিকার পরিচালিত হইতে আরম্ভ হয়। অবশেষে অতি তুচ্ছ ব্যাপারেও অপরের প্রশংসা লাভ করিয়া শিশু মানসিক আনন্দ লাভের খোরাক সংগ্রহ করে। শিশুর প্রত্যেক কাজেই বাড়ীর লোকরা অজস্র বাহবা দিয়া থাকে। শিশুও নিজের ক্ষমতা ও বাহাদুরী দেখিয়া গর্ব্বোৎফুল্ল হইয়া উঠে। অবশেষে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার অধিকার খর্ব্ব হইয়া আসিতে থাকে। পিতা মাতার বিরক্তি ভাব, জ্যেষ্ঠতর ভাই-বোনের প্রভুত্ব ক্রমে তাহাকে তাহার প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধ করাইয়া দেয়। ইহার পর শিশু (তিন বৎসর বয়স হইতে) সখা ভাবের ভাবুক হয়—নিজ সমবয়স্ক অন্য শিশুর সহিত সখ্য স্থাপন করে। ইহার পরবর্ত্তী অবস্থায় (প্রায় দশ বৎসর বয়স হইতে) শিশুর মনে দল বাঁধিবার আকাঙ্ক্ষা জন্মে। আর আন্দাজ বৎসর পনেরো বয়সের সময়—কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণ হইতে যৌন ক্ষুধা জাগ্রত হয়—হঠাৎ একদিন পৃথিবী তাহার চক্ষে সুন্দর লাগে—সমগ্র বিশ্ব-জগৎ নূতন ও মনোহর রূপ ধারণ করে—পুরুষের পক্ষের স্ত্রী সঙ্গ এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষ সঙ্গ স্পৃহনীয় হইয়া উঠে। তখন কবির ভাষায় বলা যায়—

"যে দিন সে প্রথম দেখিনু,—
সে তখন প্রথম যৌবন,—
প্রথম জীবন-পথে বাহিরিয়া এ জগতে
কেমনে বাঁধিয়া গেল নয়নে নয়ন!"

তখন যাহার নয়নের সহিত যাহার নয়ন বাঁধিয়া যায়, তাহাদেরই পরস্পরের প্রতি সকল চিত্তবৃত্তি কেন্দ্রীভূত হয়। এই বৃত্তিকে অনেক মনস্তত্ত্ববিদ্ জাতির ধারা বজায় রাখা বা বংশবৃদ্ধির প্রবৃত্তি বলিয়া মনে করেন। আবার অনেকে এই সিদ্ধান্তকে ভ্রান্ত ধারণা বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে এই যৌন-স্পৃহার মূলে বংশরক্ষার কোন কামনাই জাগে না—ইহা সম্পূর্ণ আত্মতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা মাত্র। সাধারণতঃ ইহাকে 'প্রেমে পড়া' বলা হয়। প্রেমে পড়িলে প্রেমাস্পদকে সকল গুণের আধার—আদর্শ সঙ্গী বা সঙ্গিনী বলিয়া মনে হয়। এই সকল গুণের আদর্শ প্রেমাস্পদে থাকুক আর নাই থাকুক, প্রেমিক বা প্রেমিকার চিত্তে থাকেই (যেমন, কথিত আছে, সৌন্দর্য্য থাকে দ্রষ্টার চক্ষে—দৃষ্ট পদার্থে নহে। সেই জন্য একই পদার্থকে কেহ সুন্দর দেখে, কেহ তাহাতে লেশ মাত্র সৌন্দর্য্য খুঁজিয়া পায় না)। প্রেমিকের দৃষ্টিতে সমগ্র বিশ্ব-জগতের সকল সৌন্দর্য্য প্রেমাস্পদে কেন্দ্রীভূত হয়।

ইহা হইল সাধারণ মনস্তাত্ত্বিকদিগের মত। ফ্রয়ড এবং তাঁহার শিষ্য-বৃন্দ কিন্তু মনে করেন, যৌবনোন্মেষের বহুকাল পূর্ব্ব হইতে—অতি শৈশব অবস্থা হইতে যৌন-স্পৃহা জাগ্রত হয়। তাঁহারা এই যৌন ক্ষুধার চারিটি অবস্থা কল্পনা করিয়াছেন—(১) অবৈধ অবস্থা (পিতা মাতা বা তাঁহাদের স্থলাভিষিক্ত ভ্রাতা, ভগিনী ইত্যাদি ; the Incestuous stage) ; (২) অহং অবস্থা (নিজে-নিজেই অভিসার ; The Narcissistic stage) ; (৩) সম শ্রেণীর সহচরঘটিত অবস্থা ; The Homo-sexual stage) ; আর বিপরীত শ্রেণীর অর্থাৎ স্ত্রীজাতির পক্ষে পুরুষ এবং পুং জাতির পক্ষে স্ত্রী-ঘটিত অবস্থা ; the Hetero-sexual stage)। ফ্রয়ড বলেন, হিষ্টিরিয়া রোগের লক্ষণ আর কিছু নয়—শৈশবে যাহা ছিল বাস্তব, এবং পরে যাহা চাপা ছিল, প্রকারান্তরে সেই ইন্দ্রিয় তৃপ্তির চেষ্টা মাত্র।

ফ্রয়ডের দেশে, অর্থাৎ, ইয়োরোপে, কামনা দমন করিতে বাধ্য হওয়ায় মেয়েদের স্নায়ুঘটিত রোগ জন্মে। লক্ষ লক্ষ নারী কামনা দমন করিতে বাধ্য হয় ; কারণ, তাহাদের যোগ্য, সমর্থ পতি মিলে না। স্বামীর অযোগ্যতার দরুণ অনেক নারী স্বামী সহবাসে অনুরাগ বিহীনা (frigid) হইয়া পড়ে। তাহাদের এই অনাগ্রহ (Frigidity) ক্রমশঃ অভ্যাসে রূপান্তরিত হইয়া প্রকারান্তরে কামনা দমনে সাহায্য করে। এই কারণে ইহারাই কথায় কথায় এত হিষ্টিরিয়া রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। তাহার উপর, সমাজ আছে। আমাদের দেশের ন্যায় এতটা কঠোর না হউক সমাজ-শাসন ইয়োরোপে একেবারে যে নাই তাহা নয়। আর, আমাদের এখানে যেমন, ইয়োরোপেও তেমনি, সমাজ-শাসনের চাপটা মেয়েদের উপর যতটা পড়ে, পুরুষদের উপর ততটা নহে। কাজেই পুরুষরা তাহাদের কামনা তৃপ্তির যতটা সুযোগ পায়, ভদ্রঘরের মেয়েরা তাহা পায় না।

এই জন্য হিষ্টিরিয়া রোগ মেয়েদের মধ্যেই বেশী দেখা যায়। ফ্রয়ডপন্থীরা স্থির করিয়াছেন, কাম দমন করিতে বাধ্য হওয়াই সম্ভবতঃ নারীদের স্নায়বিক বিকারের প্রধান কারণ।

নব্য মনোবৈজ্ঞানিকগণ মনো-বিশ্লেষণ প্রণালীর সাহায্যে কি ভাবে মানব-মনের তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন, অতি সংক্ষেপে তাহার সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা গেল। এইবার, তাঁহারা কোন্ পদ্ধতিতে স্বপ্নতত্ত্বের আলোচনা করিতেছেন, তাহার সন্ধান লইবার চেষ্টা করা যাউক।

আমাদের এই যে দেহযন্ত্রটি, এটি কোটী কোটী কোষাণুর সমষ্টি। তাই বলিয়া এই জীবকোষাণুগুলি পিণ্ডবৎ তাল পাকাইয়া অবস্থিত নহে। এগুলি কতকগুলি করিয়া এক একটী খণ্ডে বিভক্ত, এবং বেশ সুপ্রণালী-বদ্ধ ভাবে অবস্থিত। এক একটি খণ্ডের এক একটি বিশেষ কার্য্য আছে, এবং বেশ সুশৃঙ্খল ভাবে তাহারা নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকে।

মস্তিষ্ক এইরূপ একটি খণ্ড। ইহার আবার কয়েকটি অংশ আছে। সেইগুলিও অসংখ্য জীবকোষাণু দ্বারা গঠিত। এই এক একটি অংশের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য আছে। কোনটার দ্বারা অনুভূতি জন্মে, কোনটা স্মরণ-শক্তি, কোনটা চিন্তা, কোনটা ইচ্ছাশক্তির আশ্রয়।

প্রতীচ্য মনস্তাত্ত্বিক পণ্ডিতরা মন এবং আত্মাকে (mind or soul) একই বস্তু বলিয়া বিবেচনা করেন। বস্তুতঃ মন ও আত্মা একই বস্তু কি না তাহা বিচার্য্য বিষয় ; কিন্তু সে বিচার এখানে অপ্রাসঙ্গিক। আমরা তাঁহাদের মতই যখন ব্যক্ত করিতেছি, তখন ধরিয়া লইলাম, মন ও আত্মা একই বস্তু। মন এবং আত্মার কার্য্য মিশ্র। মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুমণ্ডলীর কার্য্য মন বা আত্মার আশ্রয়ে বা মধ্যবর্ত্তিতায় দেহের অবশিষ্ট অংশের সহিত সংশ্লিষ্ট।

যে সকল মাংসপেশী আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির সঞ্চালন নিয়ন্ত্রিত করে, আমরা যখন নিদ্রা যাই, তখন ঐ সকল মাংসপেশী বিশ্রাম উপভোগ করে। কিন্তু দেহের অন্যান্য জীবকোষাণুগুলি তখনও কার্য্যে বিরত হয় না। জাগ্রত অবস্থায় কর্ম্ম করিবার সময় যে সকল টিসু (তন্তু) ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, ঐ সকল জীবকোষাণু তাহাদের ক্ষয় সংশোধন করে। হৃদয়, ফুসফুস, পাকযন্ত্র প্রভৃতি নিদ্রিত অবস্থায়ও কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, তবে তখন তাহারা মৃদুভাবে কার্য্য করে। নিদ্রাকালে মস্তিষ্ক বিশ্রাম করে বটে, কিন্তু পূর্ণ বিশ্রাম লাভ তাহার অদৃষ্টে ঘটে না—তাহার কিয়দংশকে নিদ্রাবস্থাতেও নৈশ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হয়। অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়ের অবস্থা এইরূপ ; কিন্তু কি জাগ্রত, কি নিদ্রিত, অবস্থায়, মন কখনও সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হইতে পারে না। সুস্থদেহ ব্যক্তি যখন জাগ্রত থাকে, তখন দেহের অনেক কার্য্য তাহার অজ্ঞাতসারে নিষ্পন্ন হয়। মনের কার্য্য সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা বলা চলে।

মানুষের অজ্ঞাতসারে তাহার দেহের এবং মনের যে কার্য্য চলে, সে অবস্থাটা কি রকম? একটা দৃষ্টান্ত লইয়া কথাটা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

মেরু সন্নিহিত সমুদ্রে ভ্রমণ করিতে গেলে দেখা যায়, নানা আকারের ও বিভিন্ন আয়তনের হিমশিলা (ice berg) সকল রাজহংস, নৌকা কিম্বা জাহাজের ন্যায় সমুদ্র বক্ষে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। কোন কোন হিমশিলা পাহাড়ের ন্যায় উচ্চ এবং আয়তনেও অতি বৃহৎ। জলের উপরি-ভাগে হিমশিলাগুলির যতখানি জাগিয়া থাকে, তাহার আয়তন এত বৃহৎ যে দেখিলে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। কিন্তু যখন, তাহাদের কতখানি অংশ সমুদ্র-গর্ভে ডুবিয়া আছে, তাহা জানিতে পারা যায়, তখন বিস্ময়ের মাত্রা সীমা অতিক্রম করে। হিমশিলার যতখানি জলের উপর জাগিয়া থাকিয়া মনুষ্যের নয়ন-গোচর হয়, তাহার প্রায় দশ-বারো গুণ অধিক অংশ জলের ভিতর অদৃশ্য ভাবে অবস্থিতি করে।

মানুষের মনকে মানসিক সমুদ্র বলা যাইতে পারে। আমাদের জ্ঞাতসারে যে সকল ভাব, ধারণা ও স্মৃতি জাগিয়া থাকে, তাহাদের কথাই কেবল আমরা জানি। কিন্তু আমাদের মানস-চক্ষুর অগোচরে এমন অনেক ভাব, ধারণা ও স্মৃতি লুক্কায়িত থাকে, যাহাদের বিষয়ে আমরা প্রায় কিছুই জানিতে পারি না।

নূতন যে মনোবিজ্ঞান শাস্ত্র গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে মনের তিনটি অবস্থা কল্পিত হইয়াছে—(১) জাগ্রত, (২) অৰ্দ্ধ-জাগ্রত ও (৩) সুপ্ত অবস্থা। জাগ্রত (অর্থাৎ conscious) মনের কার্য্যগুলি আমাদের প্রায়ই জানা থাকে। অৰ্দ্ধ-জাগ্রত মনে অনতিকাল পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত ঘটনা সকলের চিত্র থাকে, যাহাদের কথা আমরা ইচ্ছা করিলেই জানিতে বা স্মরণ করিতে পারি, তবে উপস্থিত সেগুলা আমরা স্মরণ করিতেছি না। আর সুপ্ত অবস্থায় মনের ভিতর এমন সকল গুপ্ত স্মৃতি, বিস্মৃত অভিজ্ঞতা বা চাপিয়া রাখা কামনা সকল বিরাজ করে, যাহাদের সম্বন্ধে উপস্থিত আমাদের কোন জ্ঞান বা ধারণা নাই।

মনের এই অবস্থা ও ব্যবস্থা অনেকটা আমাদের ঘরকন্নার ব্যবস্থার মত। গৃহস্থালীতে সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য জিনিসগুলি হাতের কাছে মজুত থাকে। কতকগুলি জিনিস বাক্স, সিন্ধুক, তোরঙ্গ ইত্যাদির মধ্যে আবদ্ধ থাকে। এগুলি সর্ব্বদা দরকার না হইলেও, মধ্যে মধ্যে আবশ্যক হইয়া থাকে ; দরকার হইলে তাহা বাহির করিয়া লওয়া হয়। আর একটা ঘরে এমন কতকগুলা জিনিস বিশৃঙ্খল ভাবে রাখিয়া দেওয়া হয়, যেগুলা প্রায় দরকার হয় না। এবং তাহাদের কথা লোকে ভুলিয়া যায়। তার মধ্যে যদি কোনটা কালে-ভদ্রে আবশ্যক হয়, তবে ঘর খুলিয়া সেই জিনিসটা অনেক অনুসন্ধানের পর বাহির করা হয়। এবং সেই সঙ্গে অন্য অনেক জিনিস বাহির হয় যাহার কথা বাড়ীর লোকরা ভুলিয়াই গিয়াছিল। মনের এই বিস্মৃতি-কক্ষে আমাদের অনেক পুরাতন কথা, অনেক অতীত ঘটনা সঞ্চিত থাকে। কালে ভদ্রে যখন অতীত কোন প্রসঙ্গ আলোচনার বিষয় হয়, তখন বিস্মৃতি কক্ষ হইতে সেই প্রসঙ্গ টানিয়া বাহির করা হয়, এবং সেই সঙ্গে তৎসংশ্লিষ্ট আরও অনেক পুরাতন কথা মনে পড়ে। আমাদের বাল্য-লীলার ব্যাপার, জীবনের অতি আদিম কালের সংস্কার, শৈশবসুলভ ভাব, বালকোচিত বাসনা, লোভ, নিষ্ঠুরতা, অশ্লীল আচরণ—এই সব আমাদের সেই বিস্মৃতি কক্ষের সঞ্চয়। সামাজিক রীতি-নীতি, আচার ব্যবহার, আইন-কানুন এবং আমাদের

আত্মসম্মান-বোধ, লজ্জা, কুণ্ঠা প্রভৃতির প্রভাবে ঐ সকল ব্যাপার বিস্মৃতি-কক্ষে চাপা থাকে। নব্য মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে ইহাকেই বলা হয় "unconscious" বা অজ্ঞাত অবস্থা। এই বিস্মৃতি ভাণ্ডারের সঞ্চয়ের মধ্যে আছে আমাদের সুখ ভোগের লালসা, আমাদের অনেক অসম্ভব ও অসঙ্গত কামনা, বাস্তব জীবনে নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ অনেক কাজ করিবার ইচ্ছা, এমন কি, যে সকল কাজ করা সম্ভব, নীতিসঙ্গত এবং করিবার সম্পূর্ণ যোগ্য এরূপ অনেক কাজ করিবার অভিপ্রায়ও। কিন্তু অবস্থার গতিকে এই সমুদায় অভিপ্রায়কে চাপিয়া রাখিতে হইয়াছে। ইহার মধ্যে এমন সমস্ত বিষয়ও থাকিতে পারে, যাহার কথা মনে হইলে নিজের কাছেও লজ্জার সীমা থাকে না। সে সব কথা মনে পড়িলেও লজ্জা বোধ হয়। কাজেই সেগুলি যাহাতে মনে না পড়ে, যাহাতে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাওয়া যায়, তাহার ব্যবস্থাই করিতে হয়। কিন্তু ভুলিব মনে করিলেই ত ভোলা যায় না। সেগুলি চাপা থাকে মাত্র। আর যদি ভুলিয়াই যাওয়া যায়, তথাপি, তাহা মনের ভিতর বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া মনকে বিষাক্ত করিয়া তোলে। কারণ, এই অজ্ঞাত ইচ্ছাগুলি বাহিরে প্রকাশ করা অবাঞ্ছনীয় বলিয়া অস্বাভাবিক ও বিকৃতভাবে প্রকাশ পায়। কোন একটা বিষয়ে অসঙ্গত জেদ, ভূতাবেশ, ভ্রান্ত ধারণা, অস্তিত্বহীন বস্তুর অনুভূতি প্রভৃতি ইহার বাহ্য লক্ষণ। আবিষ্ট ব্যক্তিরা নিজেরাও মনে করে যে তাহারা কোন সর্ব্বশক্তিমান দেবযোনি, ভিন্ন জগৎ হইতে তাহারা মর্ত্ত্যে আসিয়াছে, তাহাদের মৃত্যু নাই, তাহারা এই মর জগতের জরা-মরণশীল জীবরাজ্যে অজ্ঞাতবাস করিতেছে। আমাদের দেশে সাধারণতঃ রোজা আনাইয়া মন্ত্র-তন্ত্রের সাহায্যে ঝাড় ফুক করাইয়া এই শ্রেণীর রোগীদের নিরাময় করিবার চেষ্টা করা হয়। প্রতীচ্য দেশে মনো-বৈজ্ঞানিকগণ রোগীর মনোবিশ্লেষণ করিয়া রোগের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিয়া রোগীকে নিরাময় করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। রোগীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, তোমার এই রোগ হইল কেন, তাহা হইলে সে তাহার একটা সঙ্গত কারণ দেখাইতে পারিবে; কিন্তু ইহা কাল্পনিক যুক্তি। প্রকৃত কারণ তাহার অজ্ঞাত। তাহার অজ্ঞতা দূর করা মনোবৈজ্ঞানিকের কার্য্য। তাঁহাকেই রোজা হইতে হইবে! মনোবিশ্লেষণের দ্বারা রোগীকে তাহার রোগের প্রকৃত কারণ জানাইতে হইবে; এবং তাঁহার ঘাড়ে যে "ভূত" (চাপিয়া রাখা কামনা) চাপিয়াছে, তাহাকে ঝাড়াইতে হইবে। রোগীর মনকে দূষনীয় কামনা ত্যাগ করাইয়া সৎপথে চালিত করিতে হইবে।

মনোবৈজ্ঞানিক যখন রোগীর মনের মণিকোঠার দ্বারোদ্ঘাটন পূর্ব্বক তাহার কুপ্রবৃত্তির কথা প্রকাশ করিবেন, তখন সে অবশ্য অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে তীব্র ভাষায় তাহার আত্ম-মর্য্যাদার পক্ষে অবমাননাকর এই সকল অভিযোগের প্রতিবাদ করিবেই। কিন্তু যতক্ষণ না সে তাহার কুপ্রবৃত্তির কথা স্বীকার করিবে, এবং মনোবিশ্লেষকের উপর আস্থা স্থাপন করিবে, ততক্ষণ তাহার আরোগ্য লাভের আশা নেই। ফ্রয়ডের মতে, মনো-বিশ্লেষণের দ্বারা রোগ নিরাময়ের মূল তত্ত্ব এই—রোগীর সকল অজ্ঞাত মনোভাব তাহার গোচর করিতে হইবে—স্মৃতির ধারার মাঝে মাঝে যে সকল বিস্মৃতির ব্যবধান ঘটিয়াছে, সেইগুলির পূরণ করিয়া চিন্তাধারা অবিচ্ছিন্ন, অক্ষুণ্ণ করিয়া দিতে হইবে।

মনের যে একটি গুপ্ত কক্ষ আছে, যেখানে অতীত ঘটনার স্মৃতি গুপ্ত ভাবে বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া রহিয়াছে, ইহা সকলেরই সহজ-বোধগম্য বিষয়। এই বিস্মৃত ঘটনাবলীর উপর নূতন নূতন ঘটনার স্তরের পর স্তর জমিয়া গিয়াছে। কোন একটা হারানো জিনিসের সন্ধান করিতে করিতে, বাড়ীর মধ্যে যে ঘরটা কম ব্যবহারে আসে, এবং যে ঘরে বাড়ীর লোকদের যাতায়াত কম, এমন একটা ঘরের কোণের একটা জানালার মাথায় তাকের এক কোণে ছোট একটি পুঁটুলী রহিয়াছে দেখা গেল। তাহার ভিতর কি আছে, তাহা সহসা মনে পড়িল না। কিন্তু পুঁটুলীটি খুলিতে দেখা গেল, তাহার ভিতর একটি কচি শিশুর কয়েকটি তুচ্ছ খেলনা রহিয়াছে। তখন মনে পড়িল, খেলনাগুলি বাড়ীরই একটি শিশুর, যে বাঁচিয়া থাকিলে আজ তাহার বয়স হইত কুড়ি বৎসর। অতি শৈশবেই তাহার মৃত্যু হয়। শিশুর শোকাতুরা জননী প্রিয় সন্তানের শেষ স্মৃতিচিহ্নগুলি সযত্নে ন্যাকড়ার পুঁটুলীতে বাঁধিয়া ওখানে তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। কালে সেই শিশুকেই বাড়ীর লোকেরা ভুলিয়া গেল—তা তাহার তুচ্ছ খেলনাগুলি! কিন্তু আজ কুড়ি বৎসর পরে সেই খেলনাগুলি সেই কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে উপরত, বাড়ীর কর্ত্তার সেই প্রিয়তম শিশু পুত্রের স্মৃতি পুনরায় জাগাইয়া তুলিল। এইভাবে এক একটা ঘটনার স্মৃতি মনের উপর যে দাগ কাটিয়া রাখিয়া যায়, পরবর্ত্তী ঘটনার পর ঘটনা তাহার উপর দাগের পর দাগ কাটিতে থাকে। এবং ক্রমে পুরাতন ঘটনার স্মৃতি অদৃশ্য হইতে থাকে, কিন্তু একেবারে মুছিয়া যায় না। অবশেষে বহু কাল পরে কোন সূত্রে, কিম্বা সমশ্রেণীর আর একটা ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় তাহার সহিত সাদৃশ্য বশতঃ সেই পুরাতন দাগটি আবার নূতন করিয়া ফুটিয়া উঠে।

সেইরূপ, পথে একজন লোকের সঙ্গে দেখা হইল। লোকটিকে চিনি-চিনি করি, তবু চিনিতে পারিতেছি না। মুখখানি যেন চেনা চেনা মনে হইতেছে—যেন অনেক দিন পূর্ব্বেকার পরিচিত কোন লোকের মুখাকৃতির সহিত তাহার মুখের যেন একটু একটু সাদৃশ্য রহিয়াছে—কিন্তু কে সেই লোকটি তাহা কিছুতেই মনে পড়িতেছে না। লোকটি চির-পরিচিতের মত সম্ভাষণ করিল—অথচ তাহাকে চিনিতে না পারিয়া আমাকে অপ্রস্তুত হইতে হইল। অবশেষে সে তাহার পরিচয় দিল; তখন—ও হরি! এ যে আমার সেই ইস্কুলের সহপাঠী হরিশ! কত বৎসর ধরিয়া আমরা উভয়ে একই শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়াছি। তাহার পর বন্ধুর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হইয়াছে—সেও আজ প্রায় বিশ-পঁচিশ বৎসরের কম নয়। বাল্য বন্ধুর মুখাকৃতির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তখন ত তাহার দাড়ি ছিল না—আজ তাহার এক হাত লম্বা দাড়ী! আজ এই দীর্ঘ শ্মশ্রুর অন্তরালে সেই শৈশব-বন্ধুর মুখখানি সহসা মনে পড়িল না—কিন্তু তাহার স্মৃতি ত বিলুপ্ত হয় নাই—মনের গুপ্ত কক্ষে বিস্মৃতভাবে সঞ্চিত ছিল।

বহু বৎসর পূর্ব্বে একখানি পুস্তক পড়িয়াছিলাম। অনেক কাল বাদে

ভিক্ষু

শিল্পী—শ্রীযুক্ত রসিকলাল পারিক

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

গ্রন্থ আবার সেই বইখানি হাতে আসিয়া পড়ায় আর একবার পড়িয়া ফেলিলাম। প্রথমবার পড়িবার সময় মনে অনেক ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল। কিছু দিন পরে তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আজ দ্বিতীয়বার পড়িবার সময় সেই বিস্মৃত ভাবের অনেকগুলিই পুনরায় মনে পড়িয়া গেল। জাগ্রত অবস্থায় যে সকল সমস্যার কোন সমাধান করা যায় না, নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নযোগে এরূপ অনেক সমস্যার অতি সহজ সমাধান হইতে দেখা যায়। সহজ অবস্থায় যে মানুষের ভদ্রতা-জ্ঞান সমাজের আদর্শ হইবার যোগ্য, মদ্যপানে উন্মত্ত হইলে বা অতিক্রোধ অথবা অত্যন্ত উত্তেজনার সময়ে তাহারাই আবার এমন ব্যবহার করে যাহা তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত অস্বাভাবিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, যেরূপ ব্যবহার দেখিয়া লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়। সহজ অবস্থায় সমাজ-শাসন-গুণে যে মানুষ স্বভাবতঃ ভদ্র, মদ্যপানে উন্মত্ত অবস্থায় তাহাদের সুপ্ত ক্রূর, হিংস্র, অভদ্র প্রকৃতি জাগ্রত হয়; এবং ঠিক ইহার উল্টা অবস্থাও দেখা যায়—সহজ অবস্থায় যে ব্যক্তি অতি দুর্দ্দান্ত, দুষ্ট প্রকৃতির, মদ্যপান করিলে, তাহাদের প্রকৃতির উদারতা ও অন্যান্য গুণ দেখিয়া চমৎকৃত না হইয়া থাকা যায় না। পাশ্চাত্য দেশে স্ত্রীজাতীয়া রোগিনীদের চিকিৎসার্থ ক্লোরোফর্ম্ম প্রয়োগ করা আবশ্যক হইলে, ক্লোরোফর্ম্ম দ্বারা মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় ভদ্র ও উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিতা, সভ্যা মহিলারাও এমন অশ্লীল ভাষা উচ্চারণ করে এবং অশ্লীল ভাবভঙ্গী দেখায় যাহা সহজ অবস্থায় নিতান্ত অস্বাভাবিক। হিপনটিজমের দ্বারা আবিষ্ট ব্যক্তিরা তাহাদের স্বাভাবিক জ্ঞানের অতীত অনেক বিষয় প্রকাশ করে; যাহাদের সঙ্গীতের বর্ণপরিচয় হয় নাই, তাহারা উচ্চাঙ্গের গীত বাদ্যের দ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীর বিস্ময় উৎপাদন করে; অপূর্ব্ব বক্তৃতা-শক্তির পরিচয় প্রদান করে; অথবা, কোন বিদেশীয় ভাষায় অনর্গল কথা কহিয়া যায়, যে ভাষা সে কস্মিন কালেও শিক্ষা করে নাই।

মনের প্রকৃত ভাব কিন্তু স্বপ্নাবস্থাতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ পায়। মনো-বিশ্লেষকের নিকটে স্বপ্নের অর্থ-নিষ্কাশনই রোগ নির্ণয়ের সর্ব্বপ্রধান উপায়। স্বপ্নই রোগীর মনের মণিকোঠার দ্বার চিকিৎসকের কাছে সম্পূর্ণ ভাবে উন্মুক্ত করিয়া দেয়।

প্রাচীন কালে স্বপ্ন মানব-জীবনে কিরূপ গুরুত্বসম্পন্ন ব্যাপার ছিল, শাস্ত্রাদিতে তাহার বিবরণ পাঠ করা যায়। রাজা-রাজড়া, ধনী, জমিদার প্রভৃতি শ্রেণীর লোকদের স্বপ্নের অর্থ-নিষ্কাশনের জন্য বেতনভোগী মন্ত্রী, জ্যোতির্ব্বিদ, মোসাহেব ও স্বপ্নবিশারদগণ নিযুক্ত থাকিত। সেকালে কেন, একালেও তেমনি অনেকে স্বপ্নে ঠাকুরের দৈব ঔষধ প্রাপ্ত হয়, দেবতার বাণী শুনিতে পায়। পাশ্চাত্য দেশে স্বপ্নে অপদেবতারা, ভূতপ্রেত, ভূতযোনি প্রভৃতি লোকের স্কন্ধে ভর করিত, এখনও কিছু কিছু করিয়া থাকে। অসভ্য, বন্য লোকেরা স্বপ্নকে বাস্তব ঘটনা বলিয়া মনে করিয়া থাকে। স্বপ্নে প্রত্যাদিষ্ট হইয়া বাস্তব জীবনে লোকে ব্যবহারে কার্য্য করিয়া থাকে। স্পিরিচুয়ালিষ্ট বা সম্মোহনবিদ্যাবিশারদ যে লোককে আবিষ্ট করিয়া থাকে তাহাও কৃত্রিম স্বপ্ন মাত্র।

প্রাচীনপন্থী মনোবৈজ্ঞানিকরা কি ভাবে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিতেন তাহা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। নব্য মনোবিজ্ঞান স্বপ্নের কিরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন, এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে। নব্য মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে স্বপ্নের অর্থ নিষ্কাশন করিবার সময় ভবিষ্যৎ অপেক্ষা অতীতের উপর এবং দেহের অপেক্ষা মনের উপর বেশী নির্ভর করা হয়। যে সকল বস্তুতান্ত্রিক ঘটনা বা বিষয় উপলক্ষ করিয়া স্বপ্ন উৎপন্ন হয় সেই ঘটনা বা উপলক্ষগুলিকে স্বপ্নের প্রকৃত কারণ বলিয়া স্বীকার করা হয় না। অনেক সময়ে স্বপ্নে মানসিক ব্যাধির মূল সূত্র প্রকাশ পাইয়া থাকে। সেই লক্ষণ দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়, স্বপ্নদ্রষ্টা ভবিষ্যতে মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইতে পারে। কোন কোন স্থলে এইরূপ লক্ষণ হইতে কঠিন শারীরিক পীড়া, এমন কি, মৃত্যুর পূর্ব্বাভাষ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। স্বপ্নতত্ত্বজ্ঞ একজন পণ্ডিত তাঁহার একখানি গ্রন্থে এক ব্যক্তির স্বপ্ন বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। একটি লোক দশ বারো বার একই রূপ স্বপ্ন দেখে যে, একটা বিড়াল তাহার গলায় এত জোরে থাবা মারিতেছে যে প্রত্যেকবার তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। লোকটি মনে করিত, তাহার ভাল হজম হয় না বলিয়া সে ঐরূপ স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। কিছু দিন পরে তাহার গলায় ঠাণ্ডা লাগায় সে ডাক্তারের নিকট গমন করে। ডাক্তারী পরীক্ষায় প্রকাশ পায় যে, তাহার গলায় একটা কিছু জন্মিয়াছে, এবং অস্ত্রপ্রয়োগ করিয়া সেইটা কাটিয়া ফেলিতে হইবে। ঠাণ্ডা লাগিবার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই সেই বস্তুটা তথায় উৎপন্ন হইয়াছিল। সে ঐ বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্বে কিছুই জানিতে পারে নাই। অস্ত্রপ্রয়োগ করিয়া বস্তুটা কাটিয়া বাদ দেওয়ার পর হইতে আর সে ঐ প্রকার দুঃস্বপ্ন দেখে নাই। আর একটি ঘটনায়, একটি লোক স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করে যে, তাহার পায়ের বুড়ো আঙ্গুল পাথর হইয়া গিয়াছে। কয়েক দিন পরে তাহার পদে পক্ষাঘাত রোগ জন্মিল। এই ধরণের স্বপ্নগুলি দৃশ্যতঃ বস্তুতান্ত্রিক হইলেও, নব্য মনো-বৈজ্ঞানিকরা বিবেচনা করেন, দেহমধ্যস্থ কোনরূপ যান্ত্রিক উত্তেজনার ফলে স্বয়ংক্রিয় (autonomous) স্নায়ুমণ্ডলীর উপর যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাহার জন্যই এইরূপ স্বপ্নের উৎপত্তি হয়। কিন্তু সজাগ চিত্ত এই সমুদয় উত্তেজনা ও প্রতিক্রিয়ার বিষয় জানিতে পারে না। এই কাজগুলা সুপ্ত চিত্তের উপর দিয়াই সম্পন্ন হয়।

সুপ্ত চিত্ত স্বপ্নে অনেক কঠিন কঠিন কার্য্য সুচারু ভাবে সম্পাদন করে, এরূপ বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তাহার কতক বিবরণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। জাগ্রত চিত্তের পক্ষে দুঃসাধ্য অনেক কার্য্য নিদ্রাবস্থায় সুপ্ত চিত্তের দ্বারা সাধিত হইয়াছে। স্বপ্নে অনেক হিসাবের ভুল ধরা পড়ে। একজন লোক বাবিলোনিয়ার একটি প্রাচীন মন্দির হইতে দুইখানি ভগ্ন 'এগেট' প্রস্তর কুড়াইয়া পাইয়াছিল। তাহাতে সাঙ্কেতিক ভাষায় কিছু লিখিত ছিল। সেই ব্যক্তি ঐ লিখনের মর্ম্ম জানিবার জন্য উহা অধ্যাপক হিলপ্রেটের (Professor Hilprecht) নিকট আনয়ন করে। তিনি অনেক মাথা খুঁড়িয়াও উহা বুঝিতে পারেন নাই। অবশেষে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, তিনি বাবিলোনিয়ার ঐ পুরাকালীন মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছেন। সেখানে মন্দিরের একজন পুরোহিতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। পুরোহিত তাঁহাকে মন্দির-সংলগ্ন

কোষাগারে লইয়া গেল। তার পর তাঁহাকে প্রস্তরখণ্ড দুইটি বিশেষ এক প্রকারে যোড়া দিতে বলিল। পূর্ব্বে, জাগ্রত অবস্থায় তিনি ঐ রত্নখণ্ড দুইটিকে একটি অঙ্গুরীয়কের অংশ মনে করিয়া সেই ভাবে যোড়া দিবার চেষ্টা করিয়া বিফল-প্রযত্ন হইয়াছিলেন। এক্ষণে স্বপ্নদৃষ্ট পুরোহিতের উপদেশে যোড়া দিয়া দেখিলেন, বেশ যোড় মিলিয়া গেল, এবং অঙ্গুরীয়কের পরিবর্ত্তে হইয়া দাঁড়াইল একযোড়া কর্ণভূষণ (ear-rings)। পরদিন সকালে জাগ্রত অবস্থায়, স্বপ্ন-বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া, পুরোহিতের উপদেশ অনুযায়ী যোড়া দিয়া যথার্থ-ই তিনি দেখিলেন, উহা একযোড়া বহুমূল্য ইয়ারিংই বটে। তখন, যে লেখা পূর্ব্বে প্রহেলিকামাত্র ছিল, তাহার অতি সরল অর্থ বাহির হইয়া পড়িল। জাগ্রত অবস্থায়, জাগ্রত চিত্তের জ্ঞাতসারে যে সকল ঘটনা ঘটে, তাহার কিয়দংশ সুপ্ত চিত্ত গ্রাস করিয়া লয়; সেইজন্য তাহা জাগ্রত চিত্তের অজ্ঞাতেই থাকিয়া যায়। আর স্বপ্নে কিম্বা মোহ-নিদ্রায় (hypnotic trance or mediumistic demonstration) সেই সকল ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়।

স্বপ্নের স্বরূপ কি? নব্য বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, স্বপ্ন আর কিছু নয়—অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার পরিপূরণ মাত্র। মনের জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, ইচ্ছার পরিপূরণকে ভিত্তি করিয়া নব্য মনোবিজ্ঞান-শাস্ত্র (Psychology) গড়িয়া উঠিতেছে। আর এই দিক দিয়াই কেবল স্বপ্নের সুসঙ্গত ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

স্বপ্নে মনের জ্ঞাতসারে যে সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ছেলে-মেয়েরা অনেক সময় খেলনা, খাবার জিনিস, সৌখিন জিনিস, এমন কি, আকাশের চাঁদ পর্য্যন্ত চাহিয়া না পাইলেও, স্বপ্নে তাহাদের এই সকল বস্তুই মিলিয়া থাকে। কচি ছেলে-মেয়েরা তাহাদের স্কুলের পড়া মনে রাখিতে না পারিলেও, স্বপ্নের কথা তাহাদের বেশ মনে থাকে, এবং তাহারা স্বপ্নের প্রায় সম্পূর্ণ ও নির্ভুল বিবরণ দিতে পারে।

কেবল শিশুদের কেন, বয়স্ক ব্যক্তিদেরও অনেক অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নযোগে পূর্ণ হয়। কোন ভ্রমণকারী লোকালয় হইতে সুদূর দেশে—যেমন আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে, উচ্চ পর্ব্বত শিখরে, মেরুপ্রদেশে, কিম্বা ঐ রকম কোন দুর্গম স্থানে ভ্রমণ করিতে কিম্বা অনুসন্ধান কার্য্যে গমন করিয়াছেন। তাঁহাদের খাদ্যদ্রব্য, তামাক, বিলাসোপকরণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ফুরাইয়া গিয়াছে; আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের সংবাদ অনেক দিন হইতে পাওয়া যাইতেছে না। এরূপ অবস্থায়, অনেক জিনিসের অভাব তাঁহাদিগকে পীড়িত করিতেছে—মনে নানা রকম সাধ উঠিতেছে। এরূপ স্থলে তাঁহারা প্রায় স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন যে তাঁহারা তাঁহাদের প্রয়োজনীয় জিনিস পাইয়া পরিপূর্ণ তৃপ্তির সহিত তাহা উপভোগ করিতেছেন। অনেক ভ্রমণকারী তাঁহাদের স্বপ্ন বিবরণ উজ্জ্বল ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন, এবং এই সকল আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইবার কথা প্রকাশ করিয়াছেন। এই কারণে, ক্রমণকারীদের দুর্দ্দশা যখন চরম অবস্থায় উপনীত হয়, তখন নিদ্রা তাঁহাদের প্রধান কামনার বিষয় হইয়া উঠে—শুধু স্বপ্নে তাঁহাদের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে পারিবে, এই লোভে।

ফ্রয়ড ও তাঁর শিষ্যেরা বলেন, মানুষের যে সকল দুরাকাঙ্ক্ষা, দুরাশা, অসঙ্গত ইচ্ছা, দুষ্ট অভিপ্রায় বা উচ্চাভিলাষ স্বাভাবিক অবস্থায় কোনক্রমেই পূর্ণ হইবার নয়, সেই সকল আশা আকাঙ্ক্ষা তাহাদের মনের গুপ্ত কোণে সুপ্তভাবে অবস্থিতি করে, এবং স্বপ্নে তাহাদেরই পরিপূরণের চেষ্টা হয়।

প্রচ্ছন্ন কামনার মধ্যে যেগুলা স্বপ্নে আবির্ভূত হয়, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলা অত্যন্ত বিরক্তিকর—ঘৃণা ও লজ্জাজনক। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কতকগুলা জাগ্রত অবস্থায় স্নায়বিক পীড়াগ্রস্ত বা বিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যক্তিগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়; সে জন্য তাহারা কিছুমাত্র লজ্জা অনুভব করে না। আর, শিশুদের ত কথাই নাই—তাহারা সভ্য-সমাজের শিষ্টাচারের ধার ততটা ধারে না বলিয়া, এই সকল অনুষ্ঠানে লজ্জা বোধ ত করেই না—বরং গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকে। যে সকল কাজ করিতে বয়স্ক ব্যক্তিরা লজ্জা বোধ করে, শিশুরা অনেক সময় আগ্রহের সহিত সেই সকল কাজ করে—বিশেষতঃ যৌন ব্যাপার সম্পর্কিত বিষয়। বয়োবৃদ্ধির সহিত, এই সকল কার্য্য যে লজ্জাজনক, এই শিক্ষা তাহারা লাভ করিয়া থাকে। শিক্ষা লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা সংযত চরিত্র হইতে বাধ্য হয়। কিন্তু তাহাদের মনের কোণে নিষিদ্ধ বিষয় সকল প্রচ্ছন্নভাবে সুপ্ত অবস্থায় অবস্থিতি করে। হিংসা, নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা, অশ্লীলতা প্রভৃতি শিশু-সুলভ প্রবৃত্তি বয়োধর্ম্মে জাগ্রত অবস্থায় সংযত থাকিলেও, নিদ্রাবস্থায় তাহারা সংযমের বন্ধন-মুক্ত হইয়া স্বপ্নের মধ্যে বা স্বপ্নের আকারে প্রকাশ পায়। কোন সহচর বা পিতা মাতার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া শিশুরা তাহাদের মৃত্যু কামনা করে। ইহা আদিম মানব-সুলভ প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির প্রকারভেদ মাত্র।

বয়স্ক ব্যক্তিরা সাধারণতঃ তাহাদের অতি শৈশব কালের—আট বৎসর বয়সের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা স্পষ্টরূপে স্মরণ করিতে পারে না। কিন্তু তথাপি, সে স্মৃতি একেবারে বিলুপ্তও হয় না—মনের গুপ্ত কক্ষে প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে। স্বপ্নে সেগুলা ছাড়া পাইয়া নানা রূপে, নানা ভাবে, স্ব-রূপে বা ছদ্মবেশে প্রকাশ পায়। বয়স কালে যাহা দুষ্প্রবৃত্তি বলিয়া নিন্দার্হ এমন অনেক বিষয় শিশুর পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং নির্দ্দোষ। শিষ্টাচার শিক্ষা করিবার পূর্ব্বে শিশুর পক্ষে যাহা স্বাভাবিক, বয়সকালে প্রকাশ্যে তাহা নিষিদ্ধ হইলেও, স্বপ্নে অনেক বিস্মৃত ঘটনার আকারে তাহার পুনরভিনয় হয়। এইরূপে স্বপ্নজগতে অনেক আশ্চর্য্য, অসাধারণ, অস্বাভাবিক ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। সেইজন্য নব্য বৈজ্ঞানিক বলেন, প্রাচীনদিগের ধারণা ভ্রান্ত—স্বপ্ন নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটায় না, বরং ঠিক বিপরীত কাজই করে—নিদ্রায় শ্রান্তি দূর করিবার সঙ্গে সঙ্গে অতৃপ্ত, বিস্মৃত কামনার তৃপ্তিসাধন করিয়া মনকে শান্ত, সমাহিত এবং ক্লান্ত দেহকে পুনরায় দিবসের কর্ম্মসম্পাদন-ক্ষম করিয়া তুলে। অবশ্য উদ্বেগজনক স্বপ্নগুলা এই ব্যবস্থার বহির্ভূত স্বতন্ত্র ব্যাপার। সেগুলা সংযমের বন্ধন ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ফলে দুষ্কর্ম্মজনিত অনুশোচনা, আত্ম

গ্লানি, উদ্বেগ প্রভৃতি মানসিক চাঞ্চল্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই জন্যই আমরা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া আতঙ্কিত হইয়া উঠি।

স্বপ্নের কোন সঙ্গত অর্থ নিষ্কাশন করা সম্ভবপর কি না? ফ্রয়ড বিবেচনা করেন—খুবই সম্ভব। তিনি বলেন, স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনার অন্তরালে স্বপ্নদ্রষ্টার ইচ্ছা কাজ করিয়া থাকে। আর, যে সকল স্বপ্ন স্পষ্ট, তাহাদের অপেক্ষা, অস্পষ্ট স্বপ্নগুলির অন্তরালস্থিত ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া অধিকতর প্রবল। দিবসে সামাজিক শিষ্টাচার মানব-মনের অসঙ্গত কামনাগুলাকে সংযত করিয়া রাখে, স্বপ্নে তাহা অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় থাকিয়া অসঙ্গত ইচ্ছাগুলাকে বাহিরে প্রকাশিত হইতে বাধা দেয়। তাহার ফলে সেগুলি প্রকৃত মূর্ত্তিতে প্রকাশিত না হইয়া ছদ্মবেশে প্রকাশ পায়। এই কারণেই আমরা বিকৃত ঘটনা, অস্বাভাবিক ঘটনা স্বপ্নে দেখি—ইহার পশ্চাতে যে ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া রহিয়াছে তাহাকে ঠিকমত ধরিতে পারি না—তাহার প্রকৃত পরিচয় পাই না। একটা ঘটনার অনেক অংশ বাদ পড়িয়া ঘটনাটা ভিন্ন আকারে প্রকাশ পায়; অনেক সময় বিভিন্ন এবং পরস্পরের সহিত সংশ্রব রহিত ঘটনাগুলা একসঙ্গে জড়াজড়ি করিয়া একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ সুসজ্জিত ঘটনার আকারেও দেখা দিয়া থাকে। কখনও কখনও কোন কোন ঘটনার মাত্র একটা অংশ- বিশেষ প্রকাশ পাইয়া থাকে। কখনও বা প্রকৃত ঘটনা যে ভাবে ঘটিয়া গিয়াছে, স্বপ্নে তাহার ধারাবাহিকতা বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়া বিভিন্ন ধারায় বিভিন্ন রূপে সজ্জিত হইয়া দেখা দেয়। অনেক সময় আসল ঘটনার প্রতীক স্বরূপ অন্য ঘটনাও দেখা যায়। কখনও কখনও একটা ঘটনা আর একটা ঘটনার প্রতিনিধি রূপে, আবার কখনও একটা ঘটনার স্থলে তাহার ঠিক বিপরীত একটা ঘটনা প্রকাশ পায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, কোন ব্যক্তি যদি স্বপ্নে তাহার প্রিয়জনের মৃত্যু সন্দর্শন করে, তবে ইহা হইতে এ কথা বুঝায় না যে, সে তাহার প্রিয়তমের মৃত্যু কামনা করে।—এ ক্ষেত্রে বুঝিতে হইবে, সে অন্য কোন লোকের মৃত্যু কামনা করে বটে, কিন্তু স্বপ্ন উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে আসিয়া চাপিয়া বসিয়াছে—শত্রুর মৃত্যুর পরিবর্ত্তে প্রিয়তমের মৃত্যু ঘটাইয়া দিয়াছে। আবার মৃত্যুর স্বপ্ন দেখিলেও অনেক ঘটনা মৃত্যু না হইয়া অন্য কোন ব্যাপারও হইতে পারে—যাহা স্বপ্নে মৃত্যুরূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

স্বপ্নে অনুকল্প বেশ চলে। মধু অভাবে গুড়ের ব্যবস্থা আমাদের শাস্ত্রেই রহিয়াছে—মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ। স্বপ্নেও এক বস্তুর স্থলে (প্রায়শঃ স্ত্রী-পুরুষের জননেন্দ্রিয়ের পরিবর্ত্তে) অন্য বস্তুর আবির্ভাব হয়। যেমন, পুং চিহ্নের পরিবর্ত্তে অথবা পৌরুষব্যঞ্জক যৌন ভাব জমাইবার জন্য উহার সহিত সাদৃশ্যযুক্ত বস্তু, যথা, লাঠি, পেনশিল, ছড়ি, কাগজ কাটিবার ছুরি, ছাতি 'টাওয়ার', এবং বিশেষ ভাবে, তরবারি, ছোরা, বল্লম প্রভৃতির ন্যায় অস্ত্র; কিম্বা পুরুষ জন্তু, যথা, বাঘ, সিংহ, ষণ্ড, ঊর্দ্ধশুণ্ড হস্তী, এবং আরও বিশেষ ভাবে সরীসৃপ। যোনি নারীর চিহ্নের অনুকল্প স্বরূপ বাক্স, সিন্ধুক, পকেট, বই, জুতা, গর্ত্ত, নদী, গির্জ্জা, কূপ প্রভৃতি। যৌন-ক্রিয়ার অনুকল্প; যথা, আঘাত, দংশন, আরোহণ, ভোজন, দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ, সন্তরণ, উড্ডয়ন প্রভৃতি। হস্তমৈথুনের (onanism) অনুকল্প বৃক্ষ হইতে একটি শাখার পতন। মুষ্কচ্ছেদন (Castration) এর অনুকল্প দন্তের স্খলন। জন্মের অনুকল্প—জল। দিগম্বর অবস্থার অনুকল্প—বস্ত্র। মৃত্যুর অনুকল্প—বিদেশযাত্রা।

বস্তুতান্ত্রিক অনুকল্প ত আছেই; তদ্ব্যতীত গুণবাচক অনুকল্প কিংবা রূপক অনুকল্পেরও অভাব নাই। কোন স্নায়ুবিকারগ্রস্তা রমণীর ধারণা জন্মে যে সে অপবিত্রা হইয়াছে। সেই অপবিত্রতা হইতে মুক্তিলাভের জন্য নিজের অজ্ঞাতসারে তাহার মনে একটা প্রবল ইচ্ছা জন্মে। সেই ইচ্ছার প্রেরণায় সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া তাহার বস্ত্র বা দেহ ধৌত করে। ইহা আমাদের দেশের শুচিবায়ুগ্রস্তা মেয়েদের স্বভাবের মতই যেন কতকটা। বিবাহের সময় স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত থাকিবে বলিয়া যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলে অর্থাৎ অপর নারী বা পুরুষের সহিত অবৈধ সংসর্গ ঘটিলে, স্বপ্নে তাহা ভগ্ন হস্তের আকারে প্রকাশ পায়।

ফ্রয়ডপন্থীদের এই সকল সিদ্ধান্ত, আমাদের মনে হয়, যুক্তি বা বিচারসহ নহে। প্রতীচ্যের বহু মনোবৈজ্ঞানিকেরও এই মত। বৈজ্ঞানিক এবং সম্ভবপর যুক্তির পরিবর্ত্তে যেন গায়ের জোরে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইতেছে বলিয়া মনে হয়। ফ্রয়ডপন্থীরা গোড়া হইতেই ধরিয়া লইয়াছেন যে, মানুষের সকল চিন্তা, সকল কার্য্য কাম-প্রবৃত্তির ভিত্তির উপর স্থাপিত। সেইজন্য তাঁহারা ঝোপে ঝোপে বাঘই দেখিয়া আসিতেছেন। কিন্তু যুক্তি ও বিচার দ্বারা তাঁহাদের সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করা কঠিন—স্থল বিশেষে অসম্ভব বলিলেও চলে। উড্ডয়ন, পতন প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর স্বপ্নের অনেক রকম ব্যাখ্যা তাঁহারা করিয়া থাকেন। কেহ বলেন, উড়িবার স্বপ্ন দেখা মানুষের ইচ্ছার পরিপূরণের একটা দৃষ্টান্ত; কেন না, বহুকাল পূর্ব্ব হইতে মানুষ পাখীদের মত উড়িবার ইচ্ছা করিয়া আসিতেছে। সেই ইচ্ছার পরিপূরণ স্বরূপ তাহারা উড়িবার স্বপ্ন দেখে। আবার কেহ কেহ বলেন, কোন একটা নির্দ্দিষ্ট অবস্থায় শয়ন করিয়া নিদ্রা গেলে বক্ষস্থলের ছন্দে বা তালে তালে উত্থান পতনের অনুকরণে লোকে উড়িবার স্বপ্ন দেখে। অপর এক দলের মতে, উড্ডয়নের স্বপ্ন দেখার অর্থ এই যে স্বপ্নদ্রষ্টা তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজিত করিয়া সকলের শীর্ষ স্থানে নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়।

স্বপ্নে পতনেরও অনেক অর্থ করা হয়। এক দল বলেন, এতদ্দ্বারা এই ইচ্ছা প্রকাশ পায় যে, মানুষ সভ্যতার বিধি নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া আদিম মানবের অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে চাহে। আর এক দলের মতে, আদিম কালের মানব বৃক্ষশাখায় বাস করিত; এবং সেইরূপ অবস্থায় প্রায় গাছ হইতে পড়িয়া যাইত। সেই অবস্থার স্মৃতির অনুসরণ করিয়া স্বপ্নে মানুষের পতন ঘটে। তৃতীয় এক দল বলেন, স্বপ্নে পতনের দ্বারা শৈশব কালের পুনরভিনয় করা হয়।

মনোবিশ্লেষণ দ্বারা সত্য নির্ণয়ের পদ্ধতিটি অতি সুন্দর। কিন্তু অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে যেমন নানা মুনির নানা মত, এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। মনোবিশ্লেষণ প্রণালীর গোঁড়া অনুরাগীদিগের মধ্যেও মতের

এমন বিভিন্নতা ঘটে যে, বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। একই পদ্ধতিতে স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিয়া বিভিন্ন স্বপ্নবিশ্লেষক বিভিন্ন প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে—একটি স্ত্রীলোক স্বপ্ন দেখিয়াছিল যে সে একটি শ্বেত কুক্কুরের গলা টিপিয়া শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা করিতে চাহিয়াছিল। ফ্রয়ডের শিষ্যেরা যে পদ্ধতিতে এই স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিয়া যে সিদ্ধান্ত করেন, জাংএর (Jung) শিষ্যেরা সেই পদ্ধতিতে স্বপ্নটি বিশ্লেষণ করিয়া কিন্তু বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় নহে কি? স্বপ্নটি এক, বিশ্লেষণ প্রণালীও এক। সিদ্ধান্তও একই হইবার কথা। অথচ হইল দুই রকম। ইহা কেমন করিয়া হইল? আমাদের মনে হয়, একই বিষয় লইয়া একই প্রণালীতে বিশ্লেষণ করা হইলেও, বিশ্লেষকের নিজের মনের একটা প্রবণতা আছে। যাঁহার যে বিষয়ে প্রবণতা অধিক, তিনি সেই দিক দিয়া বিষয়টির বিচার করিবেন। কাজেই ফলাফলও বিভিন্ন প্রকার হইতে বাধ্য। অর্থাৎ প্রবণতা অনুসারে একটা স্বপ্নের যে কোন রকম মানে করা যায়; এবং তাহার সমর্থনের উপযোগী যুক্তিরও অভাব হয় না। বিশ্লেষকের যদি কোন বিষয়ে বদ্ধমূল সংস্কার থাকে, তবে তিনি হাজার বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিশ্লেষণ করুন না কেন, তাঁহার সংস্কারেরও একটা প্রভাব আসিয়া পড়িবেই। এ প্রশ্ন যে ফ্রয়ডের মনেও উঠে নাই, তাহা নয়। তিনি "সন্দেহজনক বিষয়" বলিয়া এই প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছেন যে, সন্দেহজনক স্থলেও একটা সঙ্গত অর্থ বাহির করিতে বাধে না।

মোটের উপর এই কথা বলা যায় যে, সকল ক্ষেত্রে ঠিক সত্য সিদ্ধান্তটি বাহির করিতে না পারা গেলেও, স্বপ্ন বিশ্লেষণের ফলে, মনের অজ্ঞাত, গুপ্ত গহ্বর হইতে অনেক চাপা ইচ্ছা এবং মনোভাব টানিয়া আলোকে বাহির করা যায়। আর এইরূপ বিশ্লেষণের ফলে স্নায়বিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের লক্ষণ আলোচনা করিবার এবং রোগের প্রকৃত কারণ নির্দ্ধারণ করিবার কতকটা সুবিধা হয়।

কিন্তু আর একটি কথা বিবেচনা করিয়া দেখিবার আছে। স্বপ্ন বিশ্লেষণ দ্বারা সত্য নির্ণয় করা তখনই সম্ভব হইতে পারে, যদি স্বপ্নদ্রষ্টা তাহার মনের সকল চিন্তা হুবহু প্রকাশ করিয়া বলে।—কিছুমাত্র রাখিয়া ঢাকিয়া বলিলে চলিবে না—প্রত্যেক চিন্তাটি প্রকাশ করিয়া বলা চাই। তবে আসল সত্যটি ধরা পড়িবে। নচেৎ অপ-সিদ্ধান্ত হইতে বাধ্য।

কিন্তু মনের সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলা সম্ভবপর কি? কথায় বলে—"মনের অগোচর পাপ নাই।" মন জিনিসটা না কি চক্ষে দেখা যায় না, সেইজন্য মনে কত কুচিন্তা, কত কুমতলবই না উঠিয়া থাকে। মনের সকল সদসৎ চিন্তা প্রকাশ করা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। অথচ তাহা না হইলে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কাজও হইবে না—কেবল অন্ধকারে ঢিল মারা হইবে। "সেয়ান ঠকিলে বাপকে বলে না" বলিয়াও একটা কথা আছে। স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিয়া সত্য নির্ণয়ের সুবিধা হইবে বলিয়া লোকে সাধারণতঃ তাহাদের মূর্খতা, বুদ্ধিহীনতা, দুষ্প্রবৃত্তি প্রভৃতি অপরের কাছে প্রকাশ করিয়া বলিতে সম্মত হইবে, ইহা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। ফ্রয়ড নিজেও বলেন, তিনি তাঁহার নিজের অনেক স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিয়াছেন। সে সময়ে তাঁহার মনে যে সকল চিন্তার উদয় হইয়াছিল, সেই সকল কথাই তিনি সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে সাহস করেন না।

মানুষের পাপী মনে কত না পাপ চিন্তার উদয় হয়। বর্ত্তমান যুগের মহামনস্বী রোমা রোলাঁ এক স্থলে বলিয়াছেন—"If we are to tell a hundredth part of the dreams that come to an ordinary honest man, or of the desire which come into being in the body of a chaste woman, there would be a scandal and an outcry." অর্থাৎ সাধারণ একজন সৎ ভদ্রলোক যে সকল স্বপ্ন দেখেন, কিম্বা কোন সাধ্বী মহিলার অন্তরে যে সকল অভিলাষ জন্মে, তাহার শতাংশের একাংশও যদি সাধারণ্যে প্রকাশ করা যায়, তাহা হইলে কেলেঙ্কারীর সীমা থাকিবে না, এবং সমাজে মহা একটা বিক্ষোভ উপস্থিত হইবে।

Thought Reading বা "চিন্তা পাঠ" শাস্ত্রটা কতদূর সত্য তাহা বলিতে পারি না—কখনও কোনও চিন্তা পাঠকের সংস্রবে আসি নাই। যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কুচিন্তাপরায়ণ ব্যক্তিরা চিন্তা-পাঠকের সম্মুখীন হইলে নিজেদের বিপন্ন বোধ করিবে নিশ্চয়ই।

মানব-জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে, যাহার স্মৃতি মনকে অত্যন্ত পীড়া দেয়। অনেক লজ্জাজনক দুর্ঘটনার কথা মনে হইলে নিজের কাছেই লজ্জা, ঘৃণার সীমা থাকে না। জ্ঞাতসারে হউক আর অজ্ঞাতসারে হউক, ইচ্ছায় হউক আর বাধ্য হইয়াই হউক, মানুষ সময়ে সময়ে এমন সকল দুষ্কর্ম্ম করে বা করিতে বাধ্য হয়, যে জন্য তাহার অনুতাপের অবধি থাকে না, যে জন্য তাহাকে অশেষ মনস্তাপ ভোগ করিতে হয়। কর্ম্মদোষে লিপ্ত হইলে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে হয় ত সময়ে সময়ে লোক এই সকল কথা কিছুক্ষণের জন্য ভুলিয়া থাকিতে পরে; কিন্তু তাহার স্মৃতি বিলুপ্ত হয় না—সুপ্ত চৈতন্যের ভিতর তাহা গুপ্তভাবে সঞ্জীবিত থাকে। স্বপ্নে যখন তাহা প্রকাশ পায়, তখন স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্ন বিশ্লেষণকারীর কাছে তাহার মনের সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিবে, এরূপ আশা করা যায় কি? সে হয় ত কতক সত্য কথা বলিবে, আবার কতক মিথ্যা বা রচা কথা বলিবে—তাহার মনের আসল লজ্জার কথা, ঘৃণার কথা সম্ভবতঃ প্রকাশ করিবে না। তখন, তাহার স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিয়া নির্দ্ধারণের চেষ্টা সফল হইবে কি?

আবার, কেবল কুচিন্তার কথাই বা বলি কেন—সৎ চিন্তাই লোকে সকল সময়ে প্রকাশ করিতে পারে?

"হৃদয়ে বুদ্বুদ মত
উঠে শুভ্র চিন্তা কত,
মিশে যায় হৃদয়ের তলে—
পাছে লোকে কিছু বলে!"

—কামিনী সেন।

এই "পাছে লোকে কিছু বলে" এই ভয়ে দুর্ব্বল-চিত্ত ব্যক্তিরা তাহার

মনের সৎ চিন্তার কথা প্রকাশ করিতে পারে না—অনেক সৎ কাজ, নির্দ্দোষ কাজ করিতে পারে না। কোন কথা বলিতে বা কাজ করিতে উদ্যত হইয়া ইহারা ইতস্ততঃ করে—পাছে লোকে কিছু বলে। এইরূপ প্রকৃতির লোকই কি স্বপ্ন-বিশ্লেষকের কাছে তাহাদের মনের সকল কথা খুলিয়া বলিতে ভরসা করিবে?

শুনিতে পাই, ঈশ্বর-বিশ্বাসী নিষ্ঠাবান খৃষ্টানরা তাহাদের Father Confessorএর কাছে তাহাদের মনের মণিকোঠার গুপ্ত দ্বার উন্মোচন করিলে, নিজ মুখে জীবনের সকল পাপ কথা ও পাপ চিন্তা ব্যক্ত করিলে স্বর্গরাজ্য তাহাদের পক্ষে অবারিত-দ্বার হয়। এ কথা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য, পাঠকরা নিজ নিজ মন দিয়া তাহা বিচার করিয়া দেখুন।

এই সকল কারণে মনে হয়, স্বপ্ন-বিশ্লেষকের কাজ বড় সহজ হইবে না। আদালতে মামলা মোকদ্দমার বিচারের সময়—সাক্ষীরা পাছে মিথ্যা কথা বলিয়া সুবিচারের পথে বাধা জন্মায় এই কারণে—প্রকৃত সত্য নিষ্কাশনের জন্য সাক্ষীদের ধর্ম্মানুমোদিতভাবে শপথ গ্রহণ ও জেরা করিবার বিধান আছে। এই সমস্ত সত্য মিথ্যা কথার বিচার বিশ্লেষণ করিয়া বিচারককে প্রকৃত সত্য নির্দ্ধারণ করিতে হয়। তথাপি তিনি সকল সময়েই যে সত্যের সন্ধান পাইয়া সুবিচার করিতে পারেন, এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না। তাহার উপর তাঁহার নিজের একটা সংস্কার আছে, তাহারও প্রভাব অতিক্রম করা কঠিন।

স্বপ্ন-বিশ্লেষকের কাজও অনেকটা বিচারকেরই ন্যায়। তাঁহাকেও সত্য মিথ্যার বিচার করিতে হয়। কিন্তু বিচারকের যতটা সুবিধা আছে, স্বপ্ন-বিশ্লেষকের ততটা নাই। তিনি জেরা করিয়া সত্য কথা আদায় করিতে পারিবেন না। স্বপ্নদ্রষ্টা স্বেচ্ছায় যতটুকু তাঁহার নিকট প্রকাশ করিবে, তাহাই মাত্র তাঁহার সম্বল। এরূপ অবস্থায়, তাঁহার পক্ষে পদে পদে বিচার বিভ্রাট ঘটিবার সম্ভাবনা নাই কি?

ফ্রয়েড সাহেবের স্বপ্ন-বিশ্লেষণ-প্রণালী অতি সুন্দর, বিচক্ষণতা পূর্ণ, এবং যথার্থই সম্পূর্ণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে স্থাপিত। কিন্তু এই বিজ্ঞানানুমোদিত পদ্ধতিতে যে সকল উপাদান লইয়া স্বপ্ন-বিশ্লেষণ করিতে হইবে, সেই সমুদয় উপাদানের বিশুদ্ধতার সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ বিদ্যমান। ঐ সমুদয় উপাদানের মধ্যে কতকটা সত্য থাকিলেও কতকটা হইবে অসম্পূর্ণ, বিকৃত এবং মিথ্যার ভেজাল। ভেজাল-মিশ্রিত উপাদান লইয়া বিজ্ঞানের কার্য্য কতদূর সফলতা লাভ করিতে পারিবে, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। কতকটা এই কারণে,—এবং বিশেষ ভাবে এই জন্য যে নব্য বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনোবৈজ্ঞানিক ফ্রয়ড সাহেবের পদ্ধতিক্রমে স্বপ্নবিশ্লেষণ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন—এবং কতকটা আমার আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত বলিয়া—আমি এখানে স্বপ্নবিশ্লেষণ পদ্ধতির বিশেষ ভাবে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনা করি। সেই জন্য সেদিকে আর আমি অগ্রসর হইলাম না।

মনোবিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতবর্গ নানা দিক দিয়া মানব মনের সকল স্বাভাবিক ও বিকৃত অবস্থার আলোচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে মাত্র কয়েকটির আমি সংক্ষেপে উল্লেখ মাত্র করিলাম। স্বপ্নরহস্য (স্বপ্নবিশ্লেষণ নহে) আমার প্রধান আলোচ্য বিষয়। তাহার সহিত প্রসঙ্গ ক্রমে স্বপ্ন-বিশ্লেষণের কথা যা যৎকিঞ্চিৎ আসিয়া পড়িয়াছে, যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। মানব-মনের অপরাপর অবস্থা আমার আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত বলিয়া সে সকলের উল্লেখ না করিয়া এই খানেই আমার বক্তব্যের ইতি করা গেল।

সমাপ্ত

আহার-বিধি

কবিরাজ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়, কবিশেখর, এম্-এস্‌সি

আজকাল খাদ্য এবং স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা হইতেছে। সাধারণেও এ বিষয়ে জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। ইহা খুবই শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। আমাদের দেশে অতি পুরাকালেই আহার এবং আচার সম্বন্ধে নানাবিধ তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের কি দ্রব্য খাওয়া উচিত, কি খাওয়া উচিত নয়, কিরূপভাবে থাকা উচিত, ইত্যাদি স্বাস্থ্য-বিষয়ক নানা বিচার চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি ঋষিগণ করিয়া গিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদ "স্বস্থাতুরপরায়ণ" অর্থাৎ ইহা রোগী ও অরোগী উভয়েরই প্রধান আশ্রয় স্বরূপ। কেবলমাত্র রোগীকে নিরাময় করাই আয়ুর্ব্বেদের উদ্দেশ্য নহে, সুস্থ ব্যক্তির স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার উপায় নির্দ্দেশ করাও ইহার একটি প্রধান কর্ত্তব্য। আয়ুর্ব্বেদোক্ত আহার বিহারের বিধি সকল ভাল করিয়া পালন করিলে আমরা বহু রোগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারি। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে আহার-বিধি সম্বন্ধে কিরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহাই আমি অতি সংক্ষেপে এখানে বলিব।

"মাত্রাশী স্যাৎ"—উপযুক্ত মাত্রায় আহার করিবে, চরকের এই মহাবাক্য অনুসরণ করিলে আজ আমাদিগকে এইরূপ হীনবল হইতে হইত না। বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে লোকের অগ্নির বলও বিভিন্ন হয়। কেহ তীক্ষ্ণাগ্নি-সম্পন্ন, সে গুরু আহারও সহজে জীর্ণ করিতে পারে; কেহ বা মন্দাগ্নি-সম্পন্ন, তাহার লঘু আহারও সহজে জীর্ণ হয় না; আবার কাহারও অগ্নি বিষম, সে কখনও বা ভাল হজম করিতে পারে, কখন পারে না। সেইজন্য সকলের পক্ষে আহার-মাত্রা একরূপ নহে। আহারের মাত্রা মনুষ্যের অগ্নিবলকে অপেক্ষা করে। যে ব্যক্তির যে পরিমিত আহার বিনাক্লেশে, যথাসময়ে পরিপাক হয়,তাহাই তাহার আহার-মাত্রা জানিবেন। আহারই প্রাণীদিগের মূল। আমাদের শরীরে যে অগ্নি রহিয়াছে আহার সেই অগ্নির ইন্ধনস্বরূপ। মানুষ সমাহিত হইয়া মাত্রা ও কাল বিচার পূর্ব্বক হিতকর অন্নপানরূপ সমিধকাষ্ঠ দ্বারা নিত্য অন্তরগ্নিকে আহুতি প্রদান করিবে। অন্তরগ্নি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে দেহের নাশ হয়; অতএব অন্নপানরূপ ইন্ধন দ্বারা সেই অগ্নিকে উদ্দীপিত করিয়া রাখিবে। দ্রব্য লঘুই হউক, আর গুরুই হউক, উপযুক্ত মাত্রায় ভোজন করিবে। মাত্রাযুক্ত

ভোজন প্রকৃতিকে উপহত করে না, সুতরাং ইহা দ্বারা বল, বর্ণ, সুখ ও আয়ুঃ অবশ্য বর্দ্ধিত হয়।

খাদ্যদ্রব্য সম্যক্‌রূপে পাক না হইলে শরীর পোষণের উপযোগী হয় না। এই পাক দুই প্রকারে সম্পাধা হয়; এক বাহিরে রন্ধনশালায় স্থূলপাক, অপর শরীরের ভিতরে সূক্ষ্মপাক। সুশ্রুত আহারবিধির প্রথম বিধি বলিয়াছেন যে, রন্ধনশালা বিস্তৃত ও পবিত্র হওয়া আবশ্যক, তথায় কেবল বিশ্বস্ত লোক থাকিবে, অর্থাৎ রান্নাঘরকে ঠাকুরঘরের ন্যায় দেখিতে হইবে।

স্নান না করিয়া, বস্ত্র-পরিবর্ত্তন না করিয়া, হস্ত পদ ও মুখ প্রক্ষালন না করিয়া এবং প্রসন্নমনা না হইয়া ভোজন করিতে বসিবে না। ভোজন-পাত্র অপবিত্র, ভোজন স্থান অপ্রশস্ত ও অপরিষ্কার এবং ভোজনকাল অনুপযুক্ত হইলে ভোজন করিবে না। পরিচারকগণ অশিষ্ট ও অশুচি হইলে ভোজন করিবে না। বক্রদেহ হইয়া ভোজন করিবে না।

বাসি অন্ন ভোজন করিবে না। উষ্ণ অথচ স্নিগ্ধ অন্ন ভোজন করিবে। কারণ উষ্ণ এবং স্নিগ্ধ অন্ন খাইতে ভাল লাগে, জঠরাগ্নিকে উদ্দীপ্ত ও বর্দ্ধিত করে, শীঘ্র জীর্ণ হয়, বায়ুর অনুলোম (বায়ু সরল) করে এবং বলের বৃদ্ধি করে।

অজীর্ণে কদাচ ভোজন করিবে না, পূর্ব্বের আহার জীর্ণ হইলে তবে পুনরায় আহার করিবে; বিরুদ্ধ ভোজন, যে দ্রব্য খাইতে অভ্যাস নাই তাহা ভোজন, অনিয়মিত ভোজন (আজ এক সময়ে খাইলাম, কাল অন্য সময়ে খাইলাম), এইগুলি স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। বিষমাশনের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার রোগ জন্মাইতে পারে, এমন কি রাজযক্ষ্মা পর্য্যন্ত হইতে পারে। পূর্ব্বাহার জীর্ণ হইলে বাতাদি দোষসকল স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত হয়, অগ্নি উদ্দীপ্ত হয়, ভোজনের ইচ্ছা জন্মে, স্রোতঃ সমূহের মুখ পরিষ্কৃত থাকে, উদ্গার বিশুদ্ধ হয়, বায়ু সরল থাকে এবং বাত-মূত্র ও পুরীষের বেগ থাকে না; এইরূপ অবস্থায় হিতভোজন করিলে সেই ভুক্ত আহার সমস্ত শরীর-ধাতুকে অদুষ্ট রাখিয়া কেবল আয়ুকেই বর্দ্ধিত করে; অতএব পূর্ব্বাহার জীর্ণ হইলে ভোজন করিবে।

পূর্ব্বাহার জীর্ণ হইলে পবিত্র স্থানে বসিয়া অনন্যচিত্তে ভোজন করিবে। ভোজনকালে কথা কহিবে না, হাসিবে না, অতিদ্রুত বা অতিবিলম্বিতভাবে খাইবে না। অতিদ্রুত খাইলে ভুক্তদ্রব্য শরীরের ভিতর পাচকরসের সহিত যথাবৎ মিশ্রিত হইতে পারে না, দ্রব্যের স্বাদও গ্রহণ করা যায় না এবং তাহা কোষ্ঠেও যথাবৎ অবস্থিত হয় না, ভোজ্যদ্রব্যের দোষগুণেরও নিয়ত উপলব্ধি হয় না। অতিবিলম্বিত ভোজন করিলে তৃপ্তি পাওয়া যায় না, অধিক ভোজন করা হয়, আহার দ্রব্য সকল শীতল হইয়া যায় এবং ভুক্তদ্রব্যের পাক সমানভাবে হয় না।

কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট রাখিয়া খাইবে, কারণ কুক্ষি তিন অংশে বিভক্ত কল্পনা করিতে হয়,—এক অংশ বায়ু, পিত্ত ও কফের সঞ্চারণের জন্য রাখিয়া দিবে।

আহার্য্যের মধ্যে শালিধান, মুগ, সৈন্ধব, আমলকী, যব, নির্ম্মল জল, দুগ্ধ, ঘৃত, জাঙ্গল পশুর মাংস ও মধু এই সকল দ্রব্য নিত্য সেব্য।

শরীর-স্থিতিকারক দ্রব্যের মধ্যে অন্ন, সান্ত্বনাজনক দ্রব্যের মধ্যে জল, শ্রমহর বস্তুর মধ্যে সুরা, জীবনীয় বস্তুর মধ্যে দুগ্ধ, বৃংহনীয় অর্থাৎ পুষ্টিকারক বস্তুর মধ্যে মাংস, তৃপ্তিকারক বস্তুর মধ্যে মাংসরস, অন্নদ্রব্য, রুচিকারক দ্রব্যের মধ্যে লবণ, হৃদ্য দ্রব্যের মধ্যে অম্ল, বলকারক বস্তুর মধ্যে কুক্কুট মাংস, বৃষ্য পদার্থের মধ্যে কুম্ভীরশুক্র, শরীরস্থিরত্বকারক বিষয়ের মধ্যে ব্যায়াম, শরীরের কৃশতাকারক বিষয়ের মধ্যে মৈথুন, মূত্রজনক দ্রব্যের মধ্যে ইক্ষু, পুরীষজনক দ্রব্যের মধ্যে যব এবং যৌবন স্থিতিকারক পদার্থের মধ্যে আমলকী শ্রেষ্ঠতম।

চাউলের মধ্যে রক্তশালি, ডাইলের মধ্যে মুগ, লবণের মধ্যে সৈন্ধব-লবণ, মৎস্যের মধ্যে রোহিত মৎস্য, মাংসের মধ্যে মৃগ মাংস, শাকের মধ্যে জাবন্তীশাক, ঘৃতের মধ্যে গব্যঘৃত, দুগ্ধের মধ্যে গব্য দুগ্ধ, কন্দের মধ্যে আদা, ফলের মধ্যে দ্রাক্ষা ও ইক্ষুবিকারের মধ্যে শর্করা পথ্যতমত্বে শ্রেষ্ঠতম।

কতকগুলি দ্রব্য স্বভাবতই গুরু, আবার কতকগুলি স্বভাবতই লঘু। সংস্কার বশতঃ গুরুদ্রব্যেরও লঘুত্ব হয় এবং লঘুদ্রব্যেরও গুরুত্ব হইয়া থাকে। গুরু-ব্রীহি ধান্য সংস্কারদ্বারা লঘু খই হয়। গুরুদ্রব্যও অল্পমাত্রায় খাইলে লঘু হয় এবং লঘুদ্রব্যও অতিমাত্রায় ভক্ষণ করিলে গুরু হইয়া থাকে।

দুগ্ধের সহিত মৎস্য ভোজন করিবে না। মধু, তিল, গুড়, দুগ্ধ, মাষকলাই, মূলা ইহাদের কাহারও সহিত ছাগ বা মেষ প্রভৃতি গ্রাম্য মাংস একত্র ভোজন করিবে না। সর্ষপ তৈল দ্বারা ভর্জ্জিত কপোত মাংস খাইবে না। মূলা, রসুন, শজিনা শাক ও তুলসী খাইয়া দুগ্ধ পান করিবে না; যেহেতু তাহাতে কুষ্ঠ হইতে পারে। আম্র, আমড়া, কুল, চালতা, জাম, কয়েতবেল, তেঁতুল, কাঁটাল, নারিকেল, দাড়িম, আমলকী ও কোন-রূপ অম্ল দুগ্ধের সহিত একত্র ভোজন করিবে না। দধি ও মৎস্য একত্র ভোজন বিরুদ্ধ হয়। মধু উষ্ণ করিয়া অথবা উষ্ণার্ত্ত হইয়া মধুপান করিলে মরণ পর্য্যন্ত হইতে পারে। সমপরিমিত মধু ও ঘৃত অথবা সমপরিমিত ঘৃত ও বৃষ্টির জল বিষতুল্য। রাত্রিকালে দধিভোজন করিবে না; অন্য সময়েও ঘৃত, চিনি, মধু, মুদ্গযুষ বা আমলকীর রস, ইহাদের কোন একটির সহিত মিশ্রিত না করিয়া কেবলমাত্র দধি খাইবে না।

আমাদের দেশে আম বা কাঁঠালের সহিত একত্র দুগ্ধপান প্রচলিত। ইহাতে স্বাস্থ্যের বিশেষ কোনও ক্ষতি দেখা যায় না। দেশের আচার অনুসারে আমরা অনেক সময়ে বাল্যকাল হইতেই কতকগুলি বিরুদ্ধ ভোজনে অভ্যস্ত হই। এইরূপে সেইগুলি আমাদের সাত্ম্য হইয়া যায় বলিয়া উহা দ্বারা স্বাস্থ্যের কোনও অনিষ্ট হয় না। তবে যতদূর সম্ভব বিরুদ্ধ ভোজন সাত্ম্য করা উচিত নহে। কারণ কি জন্য স্বাস্থ্য খারাপ হয় তাহা সকল সময়ে নির্দ্ধারণ করা যায় না।

গ্রীষ্মকালে চিনি ও ছাতুর সরবৎ খাইবে, এবং ঘৃত, দুগ্ধ ও শালি তণ্ডুলের অন্ন সেবন করিবে। বর্ষাকালে বিশুদ্ধ পানীয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। এই সময়ে নদীর জল পান করিবে না, কূপের বা সরোবরের বা বৃষ্টির জল উত্তপ্ত করিয়া সেই জল শীতল হইলে পান করিবে। শরৎকালে তিক্ত ও মধুর অন্নপান সকল উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে। যে জল সমস্ত দিন সূর্য্যাতপে সন্তপ্ত এবং রাত্রিকালে চন্দ্র কিরণে সুশীতল সেই জলকে হংসোদক বলে। শরৎকালে এইরূপ বিশুদ্ধ হংসোদক স্নানে ও পানে ব্যবহার করিবে; ইহা অমৃততুল্য। হেমন্ত ও শীতকালে গব্যরস, গুড়াদি ইক্ষুবিকার, তৈল ও উষ্ণজল পান করিবে। বসন্তকালে যব ও গোধূম ভোজন করিবে।

ভোজনের পর যাহা পান করা যায় তাহাকে অনুপান বলে। অনুপান ভুক্ত দ্রব্যের সঙ্ঘাত ভাঙ্গিয়া দেয়, ভুক্ত দ্রব্যকে কোমল করে, জীর্ণ করে এবং ভুক্ত দ্রব্যের সুখপরিণাম জন্মাইয়া দেয়। শীতল জল, উষ্ণ জল, মদ্য, কাঞ্জী ও মাংসরস এই সকল দ্রব্য অনুপানার্থ ব্যবহৃত হয়। অনুপানের মধ্যে জলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

জীবাত্মা কি দেহাতিরিক্ত পদার্থ?

শ্রীধনকৃষ্ণ দেব বিশ্বাস বি-এল

ভারতবর্ষের ২য় খণ্ডের ৪র্থ সংখ্যায় দেখিলাম শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম-এ, বি-এল মহাশয় লিখিয়াছেন "আমরা এখন সকলেই দেহাতিরিক্ত একটী জীবাত্মা স্বীকার করিয়া থাকি।" এইটী দেখিয়াই আমার ঐ প্রবন্ধটি পড়িতে বিশেষ আগ্রহ হইল। কারণ দর্শন শাস্ত্রের আলোচনাই আমাদের প্রকৃত উন্নতির সোপান। এই জগতে আসিয়া আমরা যাহা শিখি বা ভোগ করি, তাহার মধ্যে যাহা নিত্য বা যাহা আমাদের চিরস্থায়ী, তাহাই আদরের বস্তু, ও তাহারই আলোচনা করা উচিত বলিয়া জ্ঞান করি। কারণ, যাহা অনিত্য, বা দুই চার বৎসর বাদে, বা এই দেহের সহিত যাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে, তাহার জন্য অধিক প্রয়াস ব্যর্থ বলিয়াই মনে করি।

সকলেই নিত্য সুখ, নিত্য বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করে। এই নিত্য শব্দের অর্থ ব্যক্তি বিশেষে নানা ভাবে গৃহীত হয়। কেহ নিত্য মানে "বহুদিন স্থায়ী", কেহ নিত্য অর্থে "আজীবন স্থায়ী", আবার কেহ নিত্য মানে "জন্ম-জন্মান্তর স্থায়ী" জ্ঞান করেন। এই নিত্য শব্দ মনুষ্যের বিশ্বাস অনুসারে অল্প বা দীর্ঘ কাল বা আজীবন বা জীবনান্তর স্থায়ী বলিয়া গৃহীত হয়।

যাহার যেরূপ জ্ঞান হউক না কেন, সকলেই যে নিজের মতে নিত্য সুখের আকাঙ্ক্ষী, তাহার কোন সন্দেহ নাই। আমি দর্শন শাস্ত্রের আলোচনাকে নিত্য বলিয়াছি, তাহার কারণ, ঐ শাস্ত্রের আলোচনার সুখ যে কেবল ঐ শাস্ত্র আলোচনার সময়েই থাকে তাহা নয়, ঐ আলোচনার পরও উহার স্মৃতি ও উহার সিদ্ধান্তীকৃত সত্য সকল আমাদের জীবনের অনেক সময়, এমন কি জীবনব্যাপী রূপেই আমাদের সুখ ও শান্তির পথ মুক্ত করে। এবং আর্য্য শাস্ত্র মতে উহা ইহজীবনের পর পরজন্মেও আমাদের গতি বা গণ নির্দ্দেশ করে। কারণ আমরা যাহাকে মানুষের গুণ বলিয়া জানি, যথা, দেবগণ, নরগণ ও রাক্ষসগণ তাহা আমাদের পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল জনিত উর্দ্ধগতি, স্থিতি বা অধঃগতির সঙ্কেত-চিহ্নমাত্র।

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ষষ্ঠাধ্যায়ে ৪০-৪৫ শ্লোকে এই নিত্য সুখময় বিষয় বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। উহার মধ্যে আমি কেবল দুইটী শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাংগেহে যোগভ্রষ্টোভিজায়তে ॥৬।৪১

অর্থাৎ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা অর্জ্জিত শোক অনেক দিন ভোগ করিয়া পরে শুচী ও শ্রীমান লোকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন।

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদৈহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌকুরুনন্দন ॥৬।৪৩

জীব ঐ শুচী ও শ্রীমানের ঘরে জন্মিয়া পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বুদ্ধিযোগ প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সিদ্ধির জন্য চেষ্টা করেন—অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মে যতটুকু অবধি সাধনা হইয়া তাহার জীবন শেষ হইয়াছিল তাহার পর হইতেই আবার অগ্রসর হন।

ইহার দ্বারা প্রমাণ হইতেছে আর্য্য শাস্ত্র মতে মানুষের পূর্ব্বজন্মকৃত চেষ্টা বিফল হয় না—মৃত্যুর পর তাহার পূর্ব্ব বিদ্যা সঞ্চিতভাবে সূক্ষ্মাবস্থায় থাকে এবং যখন তিনি পুনরায় স্থূল দেহ গ্রহণ করিয়া এই জগতে কার্য্য করিবার জন্য অবতীর্ণ হন তখনই তাহার পূর্ব্ব সঞ্চিত বুদ্ধিবৃত্তি সকল তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। এই কারণ আমাদের প্রবাদ আছে:—

পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং ধনং পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতা বিদ্যা

অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মে অর্জ্জিত ধন ও পূর্ব্বজন্ম অর্জ্জিতা বিদ্যা মানুষে পরজন্মে পায়।

পূর্ব্বজন্মের বিদ্যার প্রাপ্তি আমরা মানুষের জন্মের পর বুদ্ধির তারতম্যানুসারেই অনুমান করিয়া লই। কিন্তু পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ধন কিরূপে আমাদের নিকট আসে, এবং সে ধন কিরূপেই বা অর্জ্জিত হইয়া থাকে—এ বিষয়ে অনেকের মনে একটু উৎকণ্ঠা হইবে বলিয়া আমি লিখিতে বাধ্য হইতেছি যে পূর্ব্বজন্মের অর্জ্জিত যে ধন জীবের নিকট আসে তাহা "সিন্দুকে ভরা ধন নয়"—সিন্দুকে ভরা কৃপণের ধন সঞ্চিত ধন নয়—যে ধন সৎ বা উপযুক্ত পাত্রে দত্ত হয় যাহার দ্বারা দরিদ্র ভগবানের সেবা হয় সেই ধনই জীবের সঞ্চিত ধন। উহা পরজন্মে আবার দরিদ্র নারায়ণের সেবার জন্য উপযুক্ত পাত্রের নিকট আসে। কিন্তু যে ধন পরজন্মে পাইব আকাঙ্ক্ষা করিয়া কল্পিত দেবদেবীর নিকট গচ্ছিত রাখা হয়, তাহা কখনও পরজন্মে আসে না; কারণ, কল্পিত দেবদেবীর অস্তিত্ব বা শক্তি উহাদের পূজকের শক্তির উপর নির্ভর করে। পূজক যদি দেবদেবীর প্রতিষ্ঠার সময় তাহাতে প্রকৃত ভাষা শ্রবণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, তাহা হইলেই ঐ দেবদেবী শক্তিশালী হন; নতুবা তাঁহারা কেবল পূজকের ভরণ-পোষণকারী হন—অনেক স্থানে তাহাও হন না। অর্থাৎ দেবদেবী পূজার দ্বারা পেট ভরে না।

অতঃপর যে শাস্ত্রের অনুশীলন দ্বারা আমাদের ফল নিত্য হয় এবং জন্মজন্মান্তরেও তাহার ফল ভোগ হয় আমি তাহাকেই প্রকৃত দর্শন বা পথপ্রদর্শক শাস্ত্র বলিয়া জ্ঞান করি।

এখন দেখা যাক "জীবাত্মা দেহাতিরিক্ত" বস্তু কি না ?

এই বিষয় মীমাংসা করিতে গেলে আমাদের আর্য্য দর্শন শাস্ত্রোক্ত সৃষ্টিতত্ত্বের অনুশীলন করিতে হয়, নতুবা আমরা "জীবাত্মা"র প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারিব না।

আর্য্যগণের সৃষ্টি খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের মত ঈশ্বর হইতে কোন পৃথক বস্তু নয়। অর্থাৎ ঈশ্বর ও তাঁহার সৃষ্ট জগৎ ভিন্ন, অন্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত নয়। এবং আর্য্যগণের সৃষ্ট পদার্থও ঈশ্বরের দৈহিক পদার্থ হইতে পৃথক নয়।

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিতে গেলে ব্রহ্ম ছাড়া কিছুই নাই।

তবে কি পশু পক্ষী, মলবিষ্ঠাদিও কি ব্রহ্ম ?

হাঁ! তা নয় ত কি ? যখন ব্রহ্ম ছাড়া কিছুই নাই, তখন অবশ্য মলবিষ্ঠাদিকেও ব্রহ্ম বলিয়া ধরিতে হইবে—বিশ্বাস করিতে পারি বা না পারি উহা করিতে হইবে।

কিন্তু উহার বিশ্বাসসাধন কি প্রকারে হয় ?

শাস্ত্র জ্ঞান ও শাস্ত্র বিচারই প্রকৃত সাত্ত্বিক বিশ্বাসের কারণ। শাস্ত্রে কি বলিতেছেন ? এই বিষয়ের উত্তরে আমি বেদাদি শাস্ত্রের প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিব না—কারণ বেদাদিতে আমার জ্ঞান নাই, বেদ অনেক দুর্ব্বোধ্য এবং আমরা বেদ বুঝি আচার্য্যগণের ব্যাখ্যার দ্বারা—কিন্তু আচার্য্যগণই যে নির্ভুল তাহার প্রমাণ নাই। যথা সায়নাচার্য্য বেদের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আর্য্যকে "ত্রৈবর্ণিক" অর্থাৎ কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন দ্বিজ জাতি হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন। ইহা কি ঠিক ? অতএব আমি বেদাদির প্রমাণ না দিয়া সাধারণের হস্তগত ও সাধারণের বুদ্ধিগ্রাহ্য গীতা—যাহা উপনিষদের সার তাহা হইতেই আমার প্রমাণ সকল গ্রহণ করিয়া আমার পাঠকবর্গের তুষ্টিসাধন করিতে চেষ্টা করিব।

গীতার সপ্তম অধ্যায়ের শেষে ভগবান যখন বলিলেন

"জরামরণ মোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্মতদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্ ॥৭।২৯
সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞং চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেহ পি চ মাং তে বিদুর্যুক্ত চেতসঃ ॥৭।৩০

শ্রীকৃষ্ণ উপরিউক্ত শ্লোক দ্বয় দ্বারা আপনার কয়টী ভাব প্রকাশ করিলেন ; যথা—

১। ব্রহ্ম। ২। অধ্যাত্ম। ৩। কর্ম্ম। ৪। অধিভূত। ৫। অধিদৈব। ৬। অধিযজ্ঞ। এই ছয় ভাব দ্বারা নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিলেন। এই ছয়টি স্বরূপ বুঝিলেই আমাদের জন্ম ও মরণের শেষ হয়। অর্থাৎ আমরা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ দ্বারা "ব্রহ্মভূত" হই।

এই জন্য অর্জ্জুন ভগবানকে ঐ সকল প্রকাশ করিয়া বলিতে অনুরোধ করিলেন। অষ্টম অধ্যায় প্রথম শ্লোক দ্বারা ঐ প্রশ্ন করা হইল।

উহার উত্তর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দুই শ্লোক দ্বারা দেওয়া হইয়াছে।

অক্ষরং পরমং ব্রহ্মং স্বভাবোহধ্যাত্ম মুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকারো বিসর্গঃ কর্ম্ম সজ্ঞিতঃ ॥৮।৩
অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতং।
অধিযজ্ঞোহহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাংবর ॥৮।৪

ব্রহ্মের বিষয় জানিতে গেলে নিজেদের ব্রহ্মের ভিতরে থাকিয়া তাহাকে দেখিতে হয়। নতুবা ব্রহ্মের বাহিরে আসিয়া ব্রহ্মকে দেখিতে গেলে ব্রহ্ম দেখা হইবে না,—জগৎ দেখা হইবে মাত্র। কারণ জগৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক নয়। যাঁহারা জগৎকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক ভাবেন তাঁহারা নিজেদের ব্রহ্ম হইতে আগেই পৃথক করার জন্য তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান হয় না, জগতেরই জ্ঞান হয়। জগতের কোন জ্ঞানই নিত্য নয়—কারণ "জগৎ" অর্থে যাহা পরিবর্ত্তনশীল অতএব অনিত্য। কিন্তু ব্রহ্ম নিত্য।

ব্রহ্ম যদি নিত্য হয় তবে তাহার মধ্যে জগৎ থাকে কি প্রকারে ? নিত্য ও অনিত্যের অস্তিত্ব একাধারে কি প্রকারে হয় ?

এখানে সমস্যা অতি কঠিন ; কিন্তু অতি কঠিন হইলেও দুর্ব্বোধ্য নয়। এইখানে ব্রহ্মের ধারণা করিতে গেলে অগ্রে নিত্য ও অনিত্যের ধারণা করিতে হইবে।

নিত্য কি ? যাহা অক্ষর তাহাই নিত্য, তাহাই ব্রহ্ম। অক্ষর কি ? যাহার হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না, যাহার মধ্যে সমস্তের অস্তিত্ব সম্ভব, যাহার মধ্যে অবস্থা পরিবর্ত্তনের সুযোগ আছে কিন্তু ঐ অবস্থা পরিবর্ত্তন দ্বারা তাহার স্বভাবের কোন প্রত্যবায় হয় না, তাহাকেই অক্ষর বা নিত্য বা ব্রহ্ম বলা যায়। এই কারণ সূক্ষ্ম ও স্থূল বিষ্ঠা ও চন্দন সকলই ব্রহ্মান্তর্গত হয়।

এই ব্রহ্মের ধারণা করিতে গেলে আমাদের ভাবিতে হইবে—

অখণ্ডং মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।

অর্থাৎ অখণ্ড অর্থাৎ বিভাগশূন্য যে গোলাকার, যাহার দ্বারা চর গতিশীল, অচর—স্থাবর সমস্ত বস্তুই ব্যাপ্ত তাহাই ব্রহ্ম।

এই অক্ষর ব্রহ্ম ভাবিতে গেলে আমাদের সামনে একটা খুব বড় গোলাকার বস্তু আনিতে হইবে—ঐ গোলাকার বস্তু কোন Globeএর প্রতিকৃতি দ্বারা হইবে না। ঐ গোলক আমা হইতে পৃথক, আমি উহা হইতে ভিন্ন। অতএব এমন একটী গোল পদার্থ সামনে আনিতে হইবে যাহার মধ্যে আমিও আছি—তুমিও আছ—সকলেই আছেন।

এ গোল পদার্থ কি ? ইহা কি পৃথিবী ?

তাহাও নয় ; কারণ—আমরা পৃথিবী বলিলে যাহা বুঝি আমরা তাহার উপরে থাকি এবং তাহা হইতে আমাদের পৃথক জ্ঞান করি—অতএব পৃথিবী দ্বারা আমাদের কার্য্য সিদ্ধ হইবে না। অতএব এ গোল কি ?—এই গোল পদার্থ ভাবিতে গেলে এই নভোমণ্ডল সমন্বিত ত্রিলোক ভাবিতে হইবে—এই ত্রিলোক ভিন্ন বড় বস্তুর ধারণা করিবার আমাদের এখন ক্ষমতা নাই।

অতএব এই নভোমণ্ডল সমন্বিত এই পৃথিবীকে ও পৃথিবী মধ্যস্থিত সমস্ত জীব জন্তুকে যদি একটী অভিন্ন পদার্থ জ্ঞান করিতে পারি তাহা হইলে আমরা ব্রহ্মের কথঞ্চিৎ আভাস পাইতে পারি।

এই "অখণ্ড মণ্ডলাকারে"র মধ্যে যাহা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতীয়মান হইতেছে তাহাদের অভিন্ন ভাবিতে হইবে। Parallel lines never meet জানিলেও যেমন রেলের দুইটী সমান্তরাল রেলকে দূরে মিশিতে

দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত সত্যকে যেমন মিথ্যা বলিয়া জ্ঞান হয়, সেইরূপ এই অখণ্ড গোল আকাশ মধ্যে সমস্ত জীব ও পদার্থকে ভিন্ন ভিন্ন দেখিলেও তাহাদের অভিন্ন জ্ঞান করিতে হইবে ও আমার ভেদজ্ঞানকে মিথ্যা বলিয় বিশ্বাস করিতে হইবে। যদি আমরা এই অসাধ্য সাধন করিতে পারি তবেই এই অক্ষর ব্রহ্মের ধারণা হইবে নতুবা নয়।

উহার জন্য আমায় একটু উপমার আশ্রয় লইতে হইবে। এই অখণ্ড আকাশ মধ্যে বায়ু আছে ও বায়ুর ভিতরে বাষ্পকণা আছে ইহা সকলেই বিশ্বাস করিতে পারেন। ঐ আকাশস্থিত বায়ু কখন এক ভাবে থাকে না ; অর্থাৎ ঐ বায়ু কখন মৃদুমন্দ বাতাস, কখন প্রবল বাতাস, কখন ঝড়, কখন সাইক্লোন, কখন বা টরনেডো ভাবে লক্ষিত হয়। কিন্তু ঐ বায়ুর ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ জন্য বায়ুর মধ্যে কোন নিত্য ব্যবচ্ছেদ স্থাপিত হয় কি ? না!

সেইরূপ বায়ুর মধ্যে জলকণা সকল সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র, কিঞ্চিৎ দূর অবধি রহিয়াছে। কখনও তাহারা মেঘভাবে দৃষ্টিপথে আসে, আবার কখনও অদৃশ্য হয়। কখন তাহারা লাল রং, কখন সাদা রং, কখন বা ভিন্ন ভিন্ন রংয়ে প্রতীয়মান হয়। আবার তৎক্ষণাৎ রং পরিবর্ত্তন করে। কখন মেঘে বাঘের আকার, কখন হস্তীর আকার, কখন মানুষের আকার আদি দৃশ্য হয়, আবার পরক্ষণেই তাহারা অদৃশ্য হয়।

বায়ুর ভিন্ন ভিন্ন গতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন আকার, এবং জলকণার ভিন্ন ভিন্ন রংএ ও ভিন্ন ভিন্ন আকারে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ দ্বারা যেমন বায়ুর ও জলকণার স্থায়ী বা নিত্য বিচ্ছেদ হয় না, সেইরূপ "অখণ্ড মণ্ডলাকার" ব্রহ্মের ভিতর যে সকল দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তু আছে, তাহাদের আকার বা অবস্থা পরিবর্ত্তনের দ্বারা ব্রহ্মের কোনও ক্ষয় বা বৃদ্ধি হয় না। ইহাই ব্রহ্মের অক্ষর ভাব। অতএব ব্রহ্ম বলিতে গেলে খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের ঈশ্বর ও ঈশ্বর অতিরিক্ত জগৎ বুঝিলে হইবে না।

আর্য্যগণের ব্রহ্ম ও জগৎ এক। তবে যেমন আকাশের মধ্যে বায়ু অল্পব্যাপী, যেমন বায়ুর মধ্যে মেঘ অল্পব্যাপী, সেইরূপ ব্রহ্মের মধ্যে জগৎ অল্পব্যাপী হইলেও ব্রহ্মের অঙ্গভুক্ত 'একাংশেন স্থিতো জগৎ' এবং ব্রহ্ম হইতে পৃথক নয়।

এই কারণ উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

পূর্ণ মদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদুচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাব শিষ্যতে ॥

ব্রহ্মও পূর্ণ, জগৎও পূর্ণ, পূর্ণ বস্তু হইতে যাহা উৎপন্ন হয় (অর্থাৎ পৃথকভাবে প্রতীয়মান হয়) তাহাও পূর্ণ—(কারণ ঐ প্রতীয়মান পৃথক নিত্য নয় উহা ক্ষণিক) এবং উহাতেও পূর্ণের সমস্ত গুণ বর্ত্তমান আছে যদিও তাহা সর্ব্বদা প্রকাশ পায় না) ইহাই জীবভাব। পূর্ণ হইতে পূর্ণ গ্রহণ করিলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে—(কারণ পূর্ণ হইতে কোন অংশ লইয়া কোথায় রাখিবে ও ঐ পূর্ণের বিভাগ কোন বস্তুর দ্বারা হইবে ? জলের বিভাগ কি জল দ্বারা সম্ভব, জলে উর্ম্মিমালার দ্বারা যেমন জলের বিচ্ছেদ হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ দ্বারা ব্রহ্মের ভেদ হয় না। অতএব, ব্রহ্ম, জীব ও জীবের শরীর পরস্পর পৃথক নয়।

উপরিউক্ত প্রমাণ দ্বারা আমি ব্রহ্মতত্ত্ব ও জীবতত্ত্বের সন্নিকটে আসিলাম। অর্থাৎ ব্রহ্ম ও জীব পৃথক উপাদানে গঠিত নয়, উভয়েরই উপাদান এক, তবে উভয়ের ভাবের একটু পার্থক্য আছে। ব্রহ্ম সকলকে নিজের অন্তর্ভুক্ত জানেন, এক জীব নিজেকে অন্য জীব হইতে পৃথকভাবে দেখেন। জীবের এই পৃথক দৃষ্টিই ভাগবত জগৎ সৃষ্টির মায়া কৌশলের অবিদ্যা অংশ। যখন জীবের এই অবিদ্যাংশ দূর হইয়া জীব আপনার ব্রহ্মস্বরূপ জানিবে তখনই উহার জীবভাব নষ্ট হইয়া ব্রহ্মভাব আসিবে। জীবের এই স্বরূপ জ্ঞানই মায়ার অন্তর্গত বিদ্যার বিষয়। এই অবিদ্যা ও বিদ্যা লইয়াই মায়ার দ্বারা জগতের লীলা। এই মায়ার বিষয় আমি পরে বলিব। এখন জীব ও ব্রহ্ম যে এক তাহার প্রমাণ—মেঘ আকাশের মধ্যে যেরূপ, জীবও ব্রহ্ম মধ্যে সেইরূপ পৃথক ও অপৃথক, অনিত্য ও নিত্য, স্থূল ও সূক্ষ্মাবস্থা মাত্র।

ব্রহ্মের এই সূক্ষ্ম ও স্থূল অবস্থার প্রভেদ ও তাহার ক্ষর পুরুষ, অক্ষর পুরুষ ও পুরুষোত্তম ভাবে স্থিতি এবং তাহার অধিভূত, অধিদৈব ও অধি-যজ্ঞ ভাবে অস্তিত্বের ভাব পরে প্রকাশ করিব এবং তখনই জীব সমস্যার সার্থকরূপে সমাধান হইবে।

এখন এইমাত্র বলিতে চাই "জীবাত্মা" "দেহাতিরিক্ত নয়" ; কারণ, আত্মা ও দেহে প্রকৃত পার্থক্য নাই। দেহ ছাড়া দেহী থাকিতে পারে না, আধার ও আধেয়ের নিত্য সম্বন্ধ। এইজন্য "প্রকৃতি পুরুষচৈব বিদ্ধোনাদি উভৌরপি" অর্থাৎ প্রকৃতি বা দেহ আর পুরুষ বা জীব চৈতন্য উভয়েই অনাদি। উভয়েই যদি অনাদি হয় তবে উভয়েই অনাদি ব্রহ্মের অন্তর্ভুক্ত ; অতএব "দেহ অতিরিক্ত জীব" হইতে পারে না। কিন্তু এই দেহ স্থূল ও সূক্ষ্মভাবে পৃথক হইলেও দেহবাচ্য। আবার ঐ দেহ জন্ম ও মরণে পৃথক পৃথক হইলেও দেহবাচ্য। এবং এক জন্মেও ঐ দেহ, শৈশবে, যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে ভিন্ন ভিন্ন হইলেও এবং আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে ঐ দেহের পরমাণু সকল নূতন নূতন হইলেও ঐ দেহ এক পদবাচ্য। এই জন্য গীতায় ঐ দেহকে "বাসাংসি" বলা হইয়াছে। এই দেহ পরিবর্ত্তন দেহীর ইচ্ছাধীন। অতএব দেহ দেহীর ইচ্ছাধীন, কিন্তু দেহী দেহের অধীন নয়।

তবে ব্রহ্মের অবস্থা অচিন্ত্য "একোহহং বহুস্যাম" বলিয়া যখন ব্রহ্মের মধ্যে নানা উর্ম্মিমালার উদয় হইল তখনই "ব্রহ্ম, প্রকৃতি ও পুরুষে" বিভক্ত রূপে প্রতীয়মান হইলেন—উহাই পৌরাণিকগণের অর্দ্ধনারীশ্বর "হরগৌরী" মূর্ত্তি, উহাই "লক্ষ্মী নারায়ণ মূর্ত্তি"। ইহাই খৃষ্টানদের আদামের বাম কুক্ষিস্থ এক পঞ্জর হইতে ইভের সৃষ্টির কল্পনা। ইভ আদাম হইতে উৎপন্ন। সেইরূপ প্রকৃতি ও পুরুষ এক ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন বা প্রকাশিত, উহাতেই স্থিত ও উহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়। অতএব প্রভেদ অনিত্য। ব্রহ্মই সত্য ও নিত্য। ব্রহ্মই "সদসৎ" উভয়।

অহল্যা ও দ্রৌপদী

শ্রীবীরেশ্বর সেন

চৈত্রের 'ভারতবর্ষে' রায় সাহেব শ্রীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য লিখিত ভারতের পঞ্চ কন্যা শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দুই একটা কথা মনে হইল।

সকল বস্তুরই কারণ জানিবার ইচ্ছা মানুষের প্রকৃতিসিদ্ধ। লোকে যেখানে কোন কিছুর প্রকৃত কারণ আবিষ্কার করিতে পারে না অথবা ভুলিয়া গিয়াছে, সেখানে অনেক সময়ে একটা কারণ কল্পনা করিয়া লইয়াই তৃপ্তি লাভ করে। শব্দের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে আমরা এই মনোবৃত্তির পরিচয় অনেক সময়েই পাইয়া থাকি। ইহার কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

১। পোর্ত্তুগীজেরা আমেরিকা হইতে আনানস নামক ফল এ দেশে আনিয়াছিল। আমরা ইহাকে আনারস বলি। আনারস যে আনানসের অপভ্রংস তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু জনসাধারণ ইহা জানিত না। দাশু রায় বলিলেন, ইহার পোনর আনা ফেলিয়া দিয়া খাওয়ার উপযুক্ত এক আনা মাত্র থাকে বলিয়াই আনারস নাম হইয়াছে। ঈশ্বর গুপ্ত বলেন যে এই সুরস ফল স্বর্গ হইতে আনা হইয়াছে বলিয়াই আনারস নাম হইয়াছে।

২। ভাষাবিদেরা জানেন যে যবন শব্দ Ionia শব্দেরই রূপান্তর, কিন্তু আমাদের পৌরাণিকেরা যবন শব্দটার এক অদ্ভুত ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন বশিষ্ঠের গাভীর প্রস্রাব হইতে উৎপন্ন একদল মানুষের নামই যবন।

৩। আমাদের পৌরাণিকেরা বলেন যাহারা সুর বিরোধী তাহারদিগের নামই অসুর। কিন্তু ভাষাতত্ত্ববিদেরা উত্তমরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে অসুর শব্দটা আদিম—উহা অ এবং সুর এই দুই শব্দের মিল নহে। বেদে ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি দেবতাকে অসুর বলা হইয়াছে। অসুর হইতেই সুর হইয়াছে—সুর হইতে অসুর হয় নাই।

এইরূপে পুরাণকারেরা অতি অদ্ভুত এবং জঘন্য ভাবে অহল্যা-জার শব্দের ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন। বৌদ্ধেরা যখন পূর্ব্বকালের হিন্দুদিগকে দুশ্চরিত্র দেবগণের উপাসক বলিয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতেন, তখন মহা পণ্ডিত কুমারিল ভট্ট বৈদিক ধর্ম্মের সমর্থন করিয়া ইন্দ্র ও অহল্যাজার শব্দের যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহা এই। ইদ্ ধাতু ঐশ্বর্য্যে—যাঁহার পরম ঐশ্বর্য্য বা তেজ আছে তিনি ইন্দ্র। ইন্দ্র, সূর্য্য, আদিত্য প্রজাপতি এক ঈশ্বরেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম। অহল্যা শব্দ অ+হল্যা নহে। ইহা অহন্ পূর্ব্বক লী ধাতু। অহল্যার অর্থ রাত্রি। জৄ ধাতু হইতে জার শব্দ হইয়াছে। ইহার অর্থ যিনি জীর্ণ অর্থাৎ ক্ষয় করেন তিনি জার। সূর্য্য বা ইন্দ্র রাত্রিকে ক্ষয় করেন বলিয়া তিনি অহল্যাজার সংজ্ঞেয় অর্থাৎ তিনি তমোনাশক।

কুমারিল ভট্টের নিজের ভাষা উদ্ধৃত করিতেছি—প্রজাপতি স্তাবৎ প্রজাপালনাধিকারাদাদিত্য এবোচ্যতে। সমস্ত তেজাঃ পরমেশ্বরত্ব নিমিত্তেন্দ্র শব্দবাচ্যঃ সবিতৈব্যহনি লীনমানতয়া রাত্রে রহল্যাশব্দ বাচ্যায়াঃ ক্ষয়াত্মক জরণ হেতুত্বাজ্ জীর্য্যত্যস্মা দনেন বোদিতেন বা হল্যাজার ইত্যুচ্যতে ন পরস্ত্রী ব্যভিচারাৎ।

এই বিখ্যাত বচনটীর অবশিষ্ট অংশের মর্ম্ম এই যে সূর্য্য হইতে উষার উৎপত্তি হয় বলিয়া কেহ কেহ উষাকে সূর্য্যের কন্যা বলেন। আবার সূর্য্য ও উষা একত্র অবস্থান করেন বলিয়া কোন কবি তাঁহাদিগকে স্ত্রী পুরুষ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

এই দুইটী কবি ব্যাখ্যার সমন্বয় করিতে গিয়া পৌরাণিকেরা কি কুকাণ্ড করিয়াছেন তাহা সকলেই জানেন; সুতরাং উল্লেখের প্রয়োজন নাই। তাহা পৌরাণিক অহল্যাজার কাহিনী অপেক্ষা বড় অল্প কুৎসিত ও ন্যক্কারজনক নহে।

দ্রৌপদীর বিবাহ

পাণ্ডবেরা পাঁচ ভ্রাতায় মিলিয়া দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়াছিলেন ইহার ঐতিহাসিক কারণ ভুলিয়া গিয়াও পৌরাণিকেরা কম কুকাণ্ড করেন নাই। মহাভারত যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই জানেন যে পাণ্ডবদের জন্ম হইয়াছিল হিমালয়প্রস্থে, যে দেশে অদ্যাপি সকল ভ্রাতায় মিলিয়া একটী মাত্র নারীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত পাণ্ডবেরা সেই দেশেই ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা যে সেই দেশের প্রথা অনুসরণ করিয়া সকলে মিলিয়া এক নারীকে বিবাহ করিবেন তাহা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। তাহার কত শত বৎসর পরে যখন মহাভারতকার তাঁহাদের ইতিহাস লিখিতে বসিলেন, তাহার পূর্ব্বেই পাঞ্চাল প্রভৃতি দেশ হইতে সেই অসভ্য প্রথা লুপ্ত হইয়াছিল। রাজকুলের এত বড় একটা সত্য ঘটনা মহাভারতকার উড়াইয়া দিতে পারিলেন না; সুতরাং দ্রৌপদীর বিবাহের কারণ সম্বন্ধে যতগুলি বানরোচিত গল্প প্রচলিত ছিল তাহা স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিলেন। অথবা কোন ধর্ম্মজ্ঞানহীন ব্যক্তি এই সকল গল্প সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আমি এই গল্পগুলিকে বানরোচিত বলিলাম; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রে সেই সকল গল্পের রচয়িতাকে গর্দ্দভ বলিয়াছেন।

বাঙ্গলা বানান *

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য বি-এ (U. S. A.)

এইবার প্রবন্ধ "বাঙ্গলা বানান" সম্বন্ধে আমারও কিছু বক্তব্য জানাবার জান বোধ হয়, আমি Phonetic-ধ্বনি সম্বন্ধে কিছু interested, শিখ্‌তে চাই—সুযোগ পেলে চর্চ্চা করি ও যাঁর কাছে যেটুকু নিতে পারি তা চেয়ে বা কেড়ে নি। তাই তোমার কাছে কিছু ভিক্ষা করছি। সেন মহাশয় ও রায় মহাশয়ের প্রবন্ধ না পড়েই শুধু তোমার প্রবন্ধের মধ্যে আমার যা অবোধ্য ও শিক্ষনীয় তাই জানতে চাই। এর মধ্যে অনেক জায়গায় না বুঝিতে পারা বা একমত না হতে পারার জন্যই এটা তোমাকে লেখা বিশেষভাবে।

* চৈত্র মাসের 'ভারতবর্ষে' বাঙ্গলা বানানসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যে প্রতিবাদ লিখিয়াছিলেন, হীরেন্দ্র বাবুর নিকট লিখিত এই পত্রাংশে সেই সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে; আমরা পত্রখানি যথাযথ প্রকাশ করিলাম।—ভারতবর্ষ সম্পাদক।

ধ্বনি ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন, সেটা অনুভবনীয়। যে কোন ধ্বনি শুনে যতটা তার সম্বন্ধে বোঝা যায় সে সম্বন্ধে ভাষায় পড়ে তা হয় ত আরও জটিল হয়ে পড়ে। হয় ত এখানে আমারও ঠিক হয়ে আসবে তাই। যা'হোক, আমার অমিল ও মতামত বিস্তৃত ভাবে জানাচ্ছি—ভাষা, ব্যাকরণ বা সাহিত্যের দিক হতে আমি মোটেই আমার বক্তব্য জানাচ্ছি না, সেটা পূর্ব্বেই বলে রাখলাম।

(১) ঙ্গ ঙ ং—বাঙ্গ্‌লা, বাঙ্‌লা, বাংলা—এই তিনটীতেই আমরা একই ধ্বনিতে 'ঙ্গ্' 'ঙ্' 'ং' উচ্চারণ করি বলিয়া মনে হয়। যদিও 'ঙ্গ' ধ্বনিতে 'গ' উচ্চারিত হওয়া উচিত। "বাঙ্গলা" "বাঙ্গালী" বানানে তোমার মতই সমর্থন করি। "বঙ্গ" শব্দে 'গ' উচ্চারণ করা হয়।

(২) "আমরা সর্ব্বত্র অনুস্বারকে "ঙ" রূপে উচ্চারণ করি তাহা মনে হয় না।" এইস্থানে আমার মনে হয় "ং" is the contracted form of "ঙ"—কেন না এক সংস্কৃত ছাড়া—বাংলায় "ং" ও "ঙ" উচ্চারণ একই—কোন পার্থক্য নাই। সংস্কৃতে 'ং" ম হয় বটে। কিন্তু বাংলায় তা'ং দেখিতে পাই না।—ব্যাং, ব্যাঙ; বাংলা, বাঙলা—ইত্যাদি।"

(৩) রাঢ়ে বোধ হয় "বাঙ্গ্‌লা" বানান লিখিত ভাবে ব্যবহার হয়—"বাঙলা" ও "বাংলা" হয় না তোমার লেখার এইরূপ ভাব মনে হইতেছে। যদি উচ্চারণ অন্যরূপ বল—তাহা হইলে কি রাঢ়ে বাংগলা (বাঙ্গলা) উচ্চারিত হয়?

(৪) "বাঙ্গ্‌লার মধ্যস্থ যুক্ত ও স্থূল ধ্বনি"—'স্থূল' ধ্বনি মানে কি? Short & longএর Long—যদি Long হয় তাহা হইলেও বুঝিলাম না; কেন না Vowe এর ধ্বনিই কেবল short ও long হয়; Consonantএর soft, hard or aspirated vocalized ও non-vocalised ইত্যাদি হয়। যা'হোক, স্থূল মানে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিও।

(৫) "'ঙ' 'ং' ও 'ঞ' ইহাদের কোনটীর স্বাধীন ধ্বনি আমরা ব্যক্ত করিতে পারি না" কেন? প্রত্যেক element বা শব্দেরই স্বাধীন ধ্বনি আছে—প্রত্যেকেই পরস্পরের (স্বর বা ব্যঞ্জন) সাহায্য ব্যতীত উচ্চারিত হইতে পারে যদিও মানে হয় না। যেমন—টক্ (স্বাদ), লাট্ (লাটসাহেব)—ক্ ও ট্ যেভাবে এই স্থানে স্বাধীন ভাবে উচ্চারিত হইয়াছে, বাংলা, ব্যাঙ, পঞ্চ (পঞ্‌চ=পন্‌চ)—এখানেও "ং" "ঙ" ও "ঞ" সেইভাবেই উচ্চারিত হইতেছে। "তোমার "স্বাধীন ভাব" এর মানে কি? ঙ, ং, ঞ initial ভাবে হয় ত ব্যবহার হয় না। এছাড়া অন্য সব elements যেমত প্, ত্, ট্, ন্—প্, ত্, ট, ন ইত্যাদি যে ভাবে উচ্চারিত হয়,—ঙ, ং ও ঞও সেইভাবে হয়। এ ছাড়া ঙ ও ঞ স্বরবর্ণ সংযোগ হইয়াও ব্যবহার হয়—কাঙালী, বাঙালী+মিঞা, ং এর সঙ্গে স্বরবর্ণ সংযোগ হইয়া কোন শব্দ আছে কি না জানি না—থাকে ত জানাইও।

"অনুধ্বনি"?

"স্বরের মৃদু সাহায্য না লইয়া ইহাদিগকে উচ্চারণ করা যায় না"—ইংরাজীতে—ম, ল, ন, ঙ, ং, ঞ এইরূপ nasal consonantগুলিকে ও "ল" কে Semi-Vowel বলা হয়। Because the voice is passed unobstructed through the nasal passage though the mouth passage is closed. In case of "ল" both, the sides of the tongue is opened to have a passage of the voice and in case of ঞ (in মিঞা) through both mouth & nose.—তুমি হয় ত এইভাবেই "স্বরের মৃদু ধ্বনি" কথাটি উল্লেখ করিয়া থাকিবে। নচেৎ ইহা অন্য কোন সাধারণ স্বর (অ, আ, ই ইত্যাদি) যোগে উচ্চারিত হয় না।

"উচ্চারণ অনুসারে ঙ, ঞ, ং এই তিনটাকে 'অৰ্দ্ধধ্বনিও বলা চলে" অৰ্দ্ধধ্বনি মানে কি? পাপ্—প্ কি অৰ্দ্ধধ্বনি? ব্যাং—'ং' কি অৰ্দ্ধধ্বনি? পাপ্এর "প্" যদি অৰ্দ্ধধ্বনি হয় তাহা হইলে ব্যাংএর ংও অৰ্দ্ধধ্বনি বটে। কিন্তু অৰ্দ্ধধ্বনি কেন?

(৬) "'ঙ' 'ং, ও 'ঞ' এই তিনের ধ্বনির মধ্যে একটা মিল আছে বটে, কিন্তু তিনটীর মধ্যে কোনটীই কাহারো সহিত সম্পূর্ণ সমধ্বনি নহে। তিনটী ধ্বনির গতি বিভিন্নমুখী।"

মিল আছে—তিনটীই অনুনাসিক (nasal)। 'ঙ' ও 'ং' সমধ্বনি। ধ্বনির বিভিন্নমুখী গতি মানে কি?

"'ঙ'র ধ্বনি আত্মমুখী, 'ং'র বহির্মুখী, এবং 'ঞ'র ধ্বনি অধোমুখী"

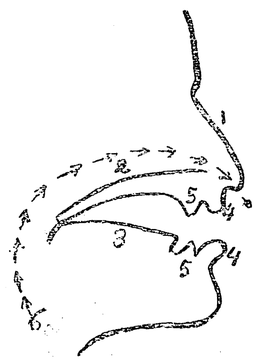

ডায়াগ্রাম নং ১

আত্মমুখী, বহিমুখী ও অধোমুখী—মানে কি?

ঙ ও ং ধ্বনি একই (সংস্কৃতে ং—ম ভাবেও ব্যবহার হয়—নচেৎ বাঙ্গলায় এক) আমি Diagram দিয়া নিজের বক্তব্য বলিব—কেন না তোমার ও তিনটী কথার মানে বুঝিলাম না।

1—নাক, 2—তালু, 3—জিব, 4—ঠোঁট, 5—দাঁত, 6—vocal chord

The formation in this diagram is:—the back of the tongue is raised & shut against the soft palate, while in that position voice is given from the vocal chords being passed through the nose, which gives sound of ঙ and ং as in বাংলা or ব্যাং; অঙক or in বাঙলা or ব্যাঙ। নিজে এইভাবে ধ্বনি দিলে এইরূপ formation ছাড়া অন্য কিছু

হয় না অথবা ঐরূপ formation ঠিক করিয়া লইয়া ধ্বনি দিলে ‘ঙ’ ও ‘ং’ ছাড়া কিছু হয় না।

তার পর “ঞ”র ধ্বনি। আমার মতে দুই প্রকার—যেরূপ ভাষাতে পাই। তুমি এর মধ্যে “ঁ”কে আন নি কেন বুঝতে পারলাম না। “ঁ” ঞর contracted form, আমার মতে। ‘ঞ’র দুই প্রকার ধ্বনিও diagram দিয়া দেখাইব।

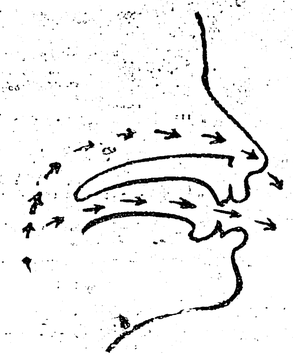

ডায়াগ্রাম নং ২

সিঞা = সিঁআ চাঁদ = চঁাদ্
জ্ঞাম = গঞ্যান = গঁ্যান

‘চাঁদ’ এর চ—non-vocal—ঁ—nasal with mouth & nasal passage opened, followed by vowel আ & finally stopped by vocalized দ্ (phonetic) without vowel.

ডায়াগ্রাম নং ৩

পঞ্চ = প ঞ চ = প ন্ চ
চঞ্চল = চঞ্ চল্ = চ ন্ চ ল্। এখানে “ঞ”র ধ্বনি “ন” হয়।

“ন” তিন প্রকার ও বিভিন্ন স্থানে উচ্চারিত হয়। দন্ত, কান্ত = দন্ত ও কান্ত—এই ন “দন্ত্য ন” কণ্ঠ = কন্ঠ ; পান = পাণ। এই “ন” ট বর্গের ন বা ণ।

আর “ঞ”র ন (পঞ্চ = পন্চ) হইতেছে “চ” বর্গের ‘ন’। এই “ঞ” অথবা চ বর্গের “ন” এবং “ত” বর্গের ন— ‘চ’ বর্গ ও “ত” বর্গের কোন element এর সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া ও “ঞ বা চ বর্গের ন” এবং “ত বর্গের ন” চ ও ত বর্গের কোন elementকে পরে সঙ্গে লইয়া ব্যবহৃত বাংলা ভাষায় হয়। এ ছাড়া ইহার কোন ব্যবহার ঐরূপ ধ্বনিতে হয় না।—

পঞ্চ = পঞ্ চ = পন্চ।

(1) কাঞ্চন = কাঞ্ চন্ = কান্চন্।
ঝঞ্ঝা = ঝ ঞ ঝা = ঝন্ঝা—
জঞ্জাল = জ ঞ জাল্ = জন্জাল।

(2) অন্ত = অন্ত
আনন্দ = আনন্দ ইত্যাদি।

(৭) “যাহা হউক ‘ঙ’ র ধ্বনি উঁ কি !” কেন ?
কুন্থনধ্বনিবৎ মানে কি ?

“অন্য ধ্বনির সহিত যোগ না করিয়া “ঙ” উচ্চারণ করিতে হইলে উঁ, ও, বা অ প্রাকৃতধ্বনিরূপে ব্যবহার করি—” মোটেই না। “ঙ” ধ্বনির নাম উঁ (অ)। কিন্তু ধ্বনি “ঙ” in ব্যাঙ যেরূপ “ক” (ক্ + অ) ধ্বনির নাম কিন্তু প্রকৃত ধ্বনি “ক্” in বাক্।

তোমাকে আর বিরক্ত করব না। পড়ে ত হাঁসবে। যদি চিঠির উত্তর দিতে হয় তবে একটু বিপদ তোমার হবে। উত্তর দিও—নইলে মনে করব আমার চেষ্টা বাচালতায় পরিণত। ভবিষ্যতে তোমার এই ভাবের প্রবন্ধ দেখ্‌লে বিশেষ আনন্দিত হব জেনো। একটু খাটলে তোমার কাছ হতে বাঙলা দেশ ক্রমশঃ কিছু পাবে জেনো! মাথা ও গতর খাটিয়ে একটু খ্যাতি ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন কর না কেন! অনুরোধ।

বেশ দিন কেটে যাচ্ছে। আশা করি ভাল আছ।

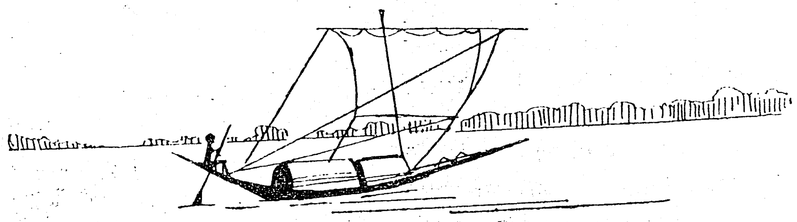

ভারতীয় কুস্তি ও তাহার শিক্ষা

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

“রুম”

অপরে যদি পিছনে যাইয়া কোমরটী জড়াইয়া ধরে তখন তাহার পাঁয়তারা দেখিয়া, যদি তাহার ডান পাঁয়তারা থাকে, বাঁ-হাত দিয়া তাহার ডান কব্জীটী ধরিয়া,

“রুম” ১ম

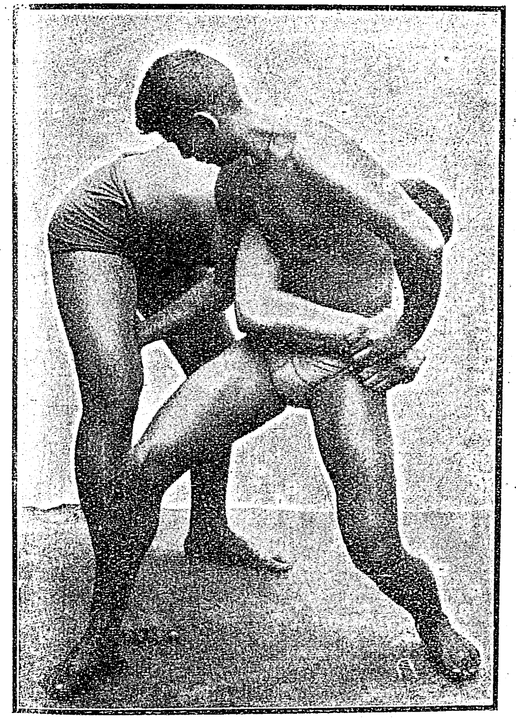

ডান পা টী একটু ডান দিকে ও বাঁ পা-টী সাম্‌নে আগাইয়া, ডান দিকে (একটু) ঘুরিয়া, নিজের ডান হাতটী তাহার সম্মুখ হইতে দুই পায়ের মধ্য দিয়া চালাইয়া দিয়া, নিজে ডান দিকে ঘুরিয়া তাহার পিছনে যাওয়া বা ঝোঁক দিয়া তাহাকে নীচে লইয়া আসাকে “রুম” বলে। পিছনে যাইয়া সঙ্গে সঙ্গে নিজের ডান পা টী পিছাইয়া লইতে হইবে।

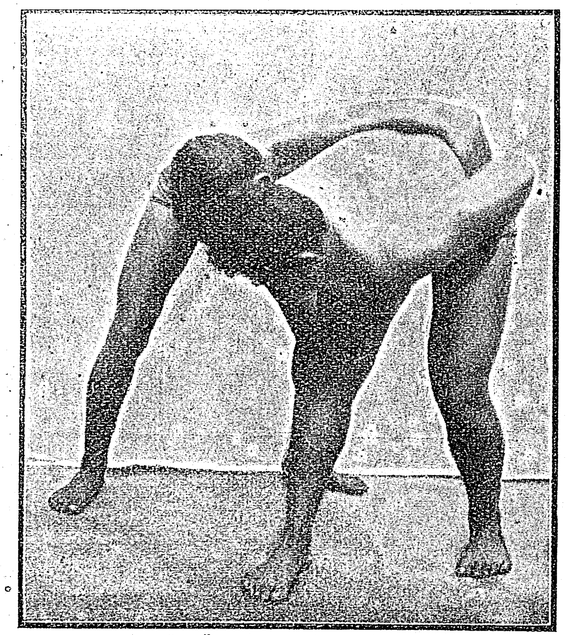

“রুম” ২য়

“উখাড় বা পুট্টি”

অপরের পিছনে যাইয়া কোমরটী দুই হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া, হাতের জোরে তাহার শরীরটী একটু কাৎ করিয়া উর্দ্ধে তুলিয়া নীচে ফেলাকে “উখাড় বা পুট্টি” বলে।

"উখাড়"

"মতিচুর"

অপরের পিছনে যাইয়া পাঁয়তারা করিয়া দাঁড়াইয়া ("উখাড়" প্যাঁচের ন্যায়) কোমরটী দুই হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া, নিজের হাতের জোরে তাহার শরীরটী একটু কাৎ করিয়া ঊর্দ্ধে তুলিয়া নীচে ফেলিবার সময় নিজে এক হাঁটু মাটিতে ও অপর হাঁটু তুলিয়া বসিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার শরীরটী উপর হইতে উলটাইয়া যে পা তোলা আছে সেই ঊরতের উপর চিৎ করিয়া ফেলাকে "মতিচুর" বলে।

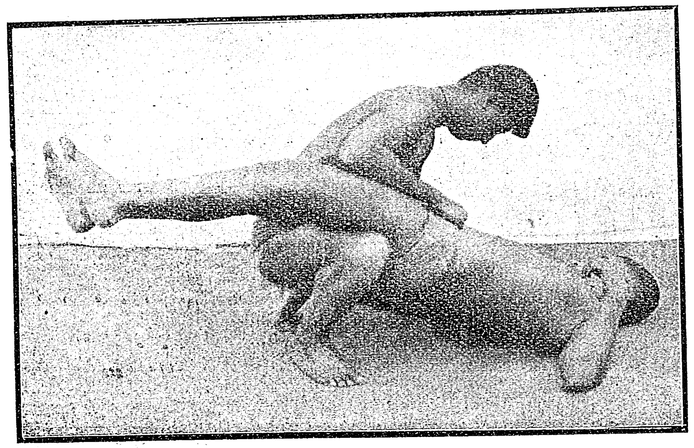

"মতিচুর"

"ঘোর পালংয়ে টাং"

অপরে যখন পট করিবার জন্য দুই হাত দিয়া পা দুইটী ধরিতে আসে, তখন যদি তাহার মাথা নিজের বাঁ দিকে থাকে তবে বাঁ হাত দিয়া তাহার মাথাটী চাপিয়া ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে

নিজের ডান পা-টী তাহার বাঁ বগলের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া ঘুরাইয়া পিঠের উপর চাপাইয়া দিয়া তাহার

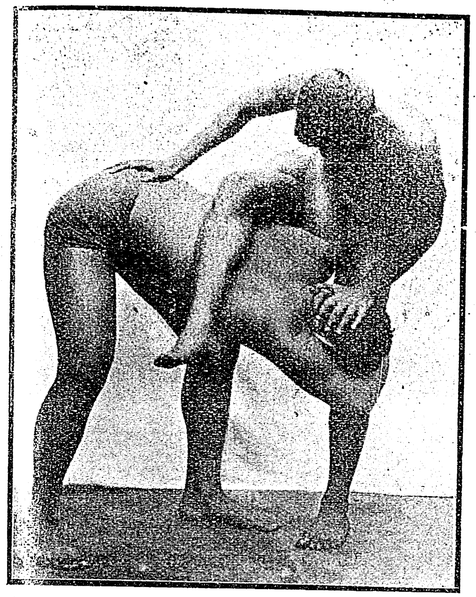

"ঘোর পালংয়ে টাং"—১ম

"ঘুটনা"

অপরকে নীচে লইয়া আসিবার পর যখন সে হাত ও পা ছোট করিয়া মাটীতে বসে ও উপরে যে আছে সে

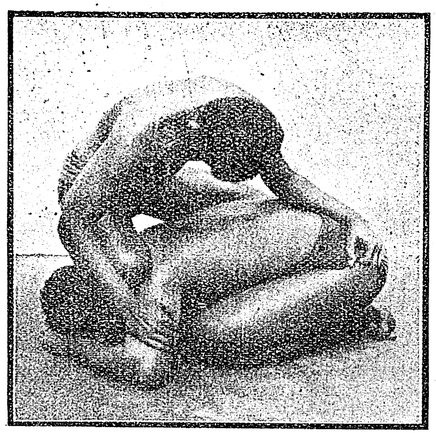

"ঘুটনা"—১ম

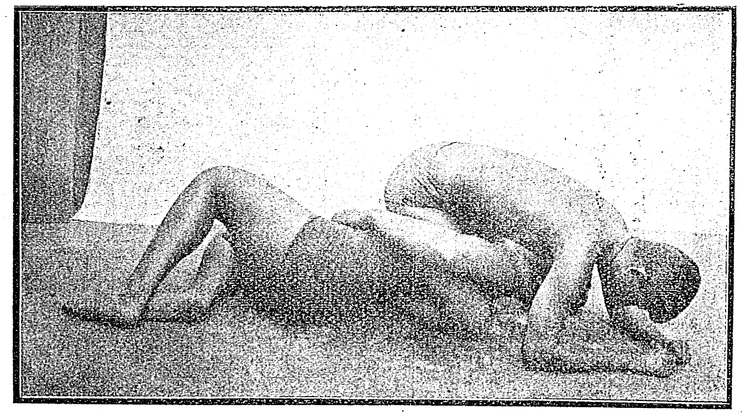

"ঘোর পালংয়ে টাং"—২য়

শরীরটী বাঁ দিকে ঘুরাইয়া চিৎ করাকে "ঘোরপালংয়ে টাং" বলে।

যদি তাহার ডান দিকে থাকে, তবে ডান হাঁটু তাহার ঘাড়ে রাখিয়া, বাঁ হাত দিয়া তাহার লেঙ্গটটী ধরিয়া জোরের

"উখাড়"

"মতিচুর"

অপরের পিছনে যাইয়া পাঁয়তারা করিয়া দাঁড়াইয়া ("উখাড়" প্যাঁচের ন্যায়) কোমরটী দুই হাত দিয়া জড়াইয়া

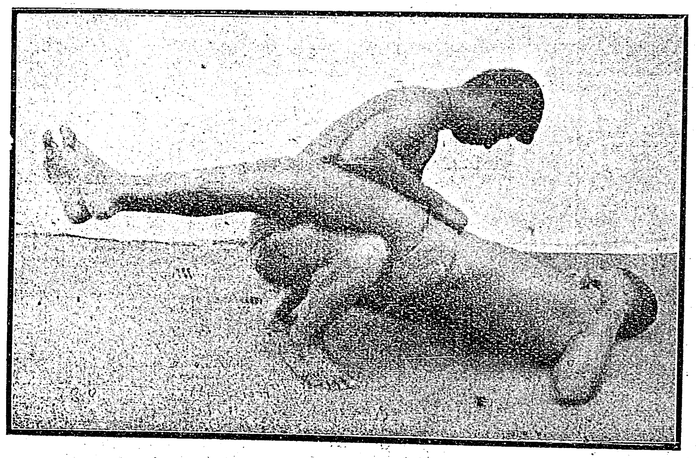

"মতিচুর"

"উখাড়"

ধরিয়া, নিজের হাতের জোরে তাহার শরীরটী একটু কাৎ করিয়া ঊর্দ্ধে তুলিয়া নীচে ফেলিবার সময় নিজে এক হাঁটু মাটিতে ও অপর হাঁটু তুলিয়া বসিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার শরীরটী উপর হইতে উলটাইয়া যে পা তোলা আছে সেই ঊরতের উপর চিৎ করিয়া ফেলাকে "মতিচুর" বলে।

"ঘোর পালংয়ে টাং"

অপরে যখন পট করিবার জন্য দুই হাত দিয়া পা দুইটী ধরিতে আসে, তখন যদি তাহার মাথা নিজের বাঁ দিকে থাকে তবে বাঁ হাত দিয়া তাহার মাথাটী চাপিয়া ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে

নিজের ডান পা-টী তাহার বাঁ বগলের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া ঘুরাইয়া পিঠের উপর চাপাইয়া দিয়া তাহার

"ঘোর পালংয়ে টাং"—১ম

"ঘুটনা"

অপরকে নীচে লইয়া আসিবার পর যখন সে হাত ও পা ছোট করিয়া মাটীতে বসে ও উপরে যে আছে সে

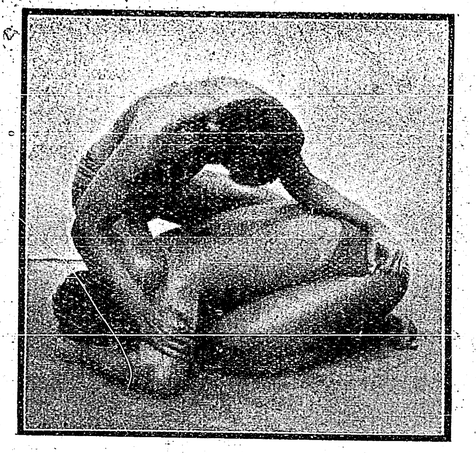

"ঘুটনা"—১ম

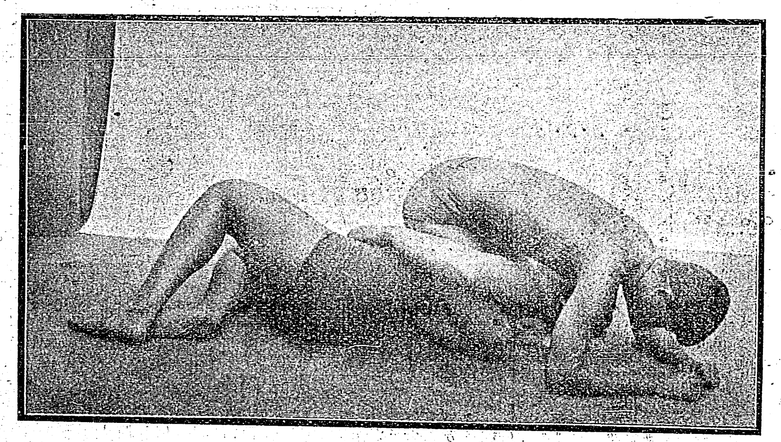

"ঘোর পালংয়ে টাং"—২য়

শরীরটী বাঁ দিকে ঘুরাইয়া চিৎ করাকে "ঘোরপালংয়ে টাং" বলে।

যদি তাহার ডান দিকে থাকে, তবে ডান হাঁটু তাহার ঘাড়ে রাখিয়া, বাঁ হাত দিয়া তাহার লেঙ্গটী ধরিয়া জোরের

সহিত ঘাড়টী চাপিয়া রাখাকে "ঘুটনা" দেওয়া বলে। এইরূপে "ঘুটনা" দিবার সময় দুই হাত দিয়া তাহার

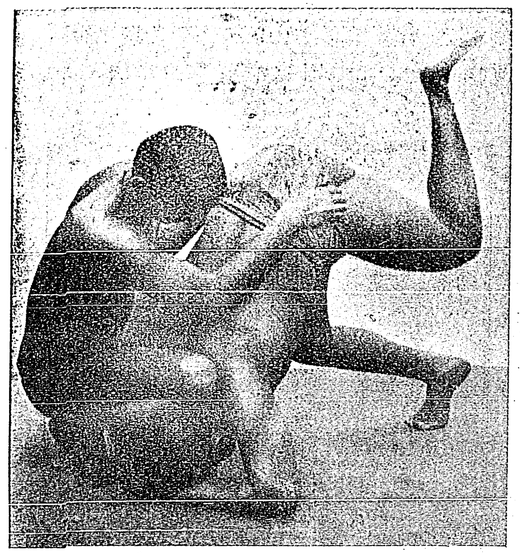

"ঘুটনা"—২য়

লেঙ্গটের দুই ধার ধরিয়া শরীরটী উল্‌টাইয়া দিয়া চিৎ করিতেও পারা যায়।

"ছট্টু পট্টু"

অপরকে নীচে লইয়া আসিবার পর যখন সে হাত ও পা ছোট করিয়া মাটীতে বসে, ও উপরে যে আছে সে যদি তাহার ডান দিকে থাকে তবে বাঁ হাত দিয়া তাহার পাছার কাছে লেঙ্গটীটী চাপিয়া ধরিয়া, ডান হাঁটু তুলিয়া ও বাঁ হাঁটু তাহার ডান উরতের উপর রাখিয়া জোরের সহিত বসিয়া পরে বাঁ হাতটী তাহার পাছার মধ্য দিয়া ভিতরে চালাইয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে অপর হাতটী তাহার ডান কাঁধের উপর দিয়া ভিতরে

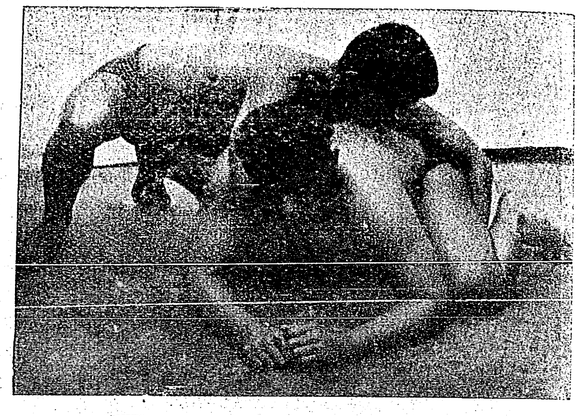

"ছট্টু পট্টু—১ম"

চালাইয়া দিয়া, নিজের দুই হাত জোরে ধরিয়া কোলের উপর উল্‌টাইয়া চিৎ করাকে "ছট্টু পট্টু" বলে।

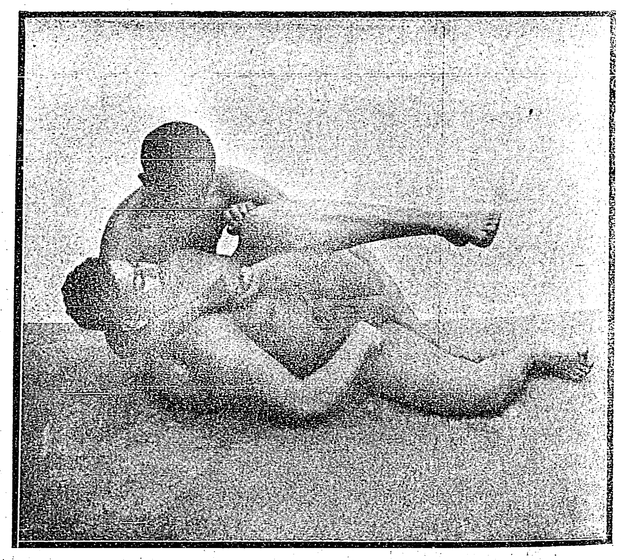

"ছট্টু পট্টু—২য়"

"ধড়"

নিজে নীচে আসিয়া যখন হাত ও পা ছোট করিয়া সহিত তাহার শরীরটী টানিয়া নিজে বাঁ দিকে কাৎ মাটীতে বসা যায় ও উপরে যে আছে সে যদি ডান দিকে হইবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের শরীরটী তাহার শরীরের উপর

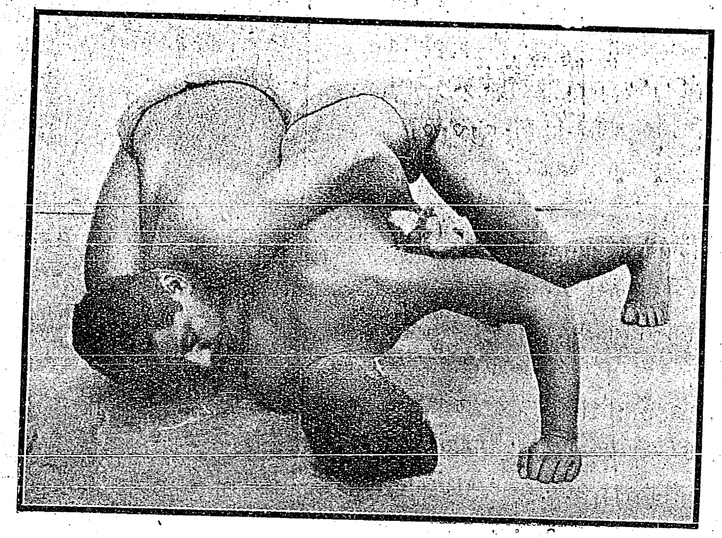

"ধড়—১ম"

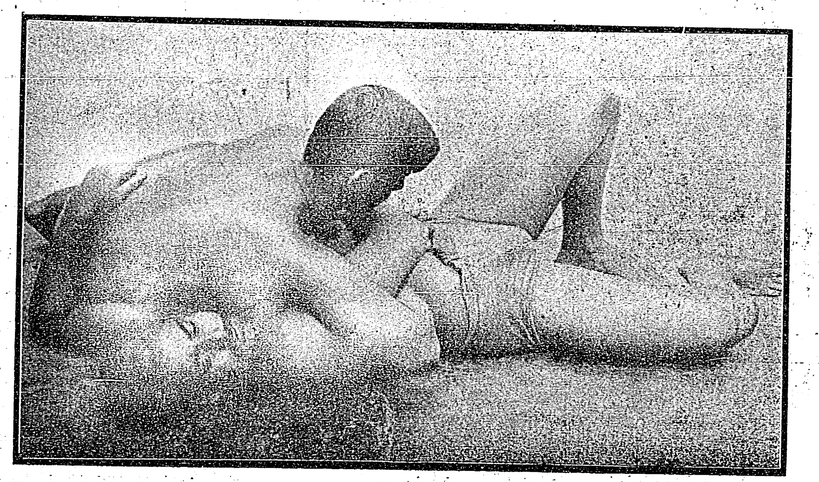

"ধড়—২য়"

থাকে এবং পাঁয়তারা ঠিক না রাখে, তখন তাহার ডান দিয়া বাঁ দিকে ঘুরাইয়া লইয়া চিৎ করাকে "ধড়" বলে।

"গাধালেট"

নিজে নীচে আসিয়া যখন হাত ও পা ছোট করিয়া মাটীতে বসা যায় ও উপরে যে আছে সে যদি ডান দিকে থাকে এবং পাঁয়তারা ঠিক না রাখে, তখন তাহার বাঁ হাতটী নিজের বাঁ বগল দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া জোরের সহিত তাহার শরীরটী টানিয়া, নিজে ডান দিকে কাৎ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ("ধড়" প্যাঁচের ন্যায়) নিজের শরীরটী তাহার শরীরের উপর দিয়া ডান দিকে ঘুরাইয়া লইয়া চিৎ করাকে "গাধালেট" বলে।

প্যাঁচগুলি এক ধার দিয়াই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। প্রত্যেক প্যাঁচটী উপরে ও নীচে এবং ডান ধার ও বাঁ ধার দুই ধার দিয়াই করিতে পারা যায়। তবে হাতের ও পায়ের কাজ বদলাইয়া করিতে হইবে। প্যাঁচগুলি অভ্যাস করিবার সময় একাগ্রমনে ও ক্ষিপ্রকারিতার সহিত করিতে হইবে। কাহাকেও প্যাঁচ মারিতে যাইবার সময় নিজের ও অপরের ধরার অবস্থা, পাঁয়তারা ও "মওকা" (timing) অনুযায়ী প্যাঁচ মারিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহা

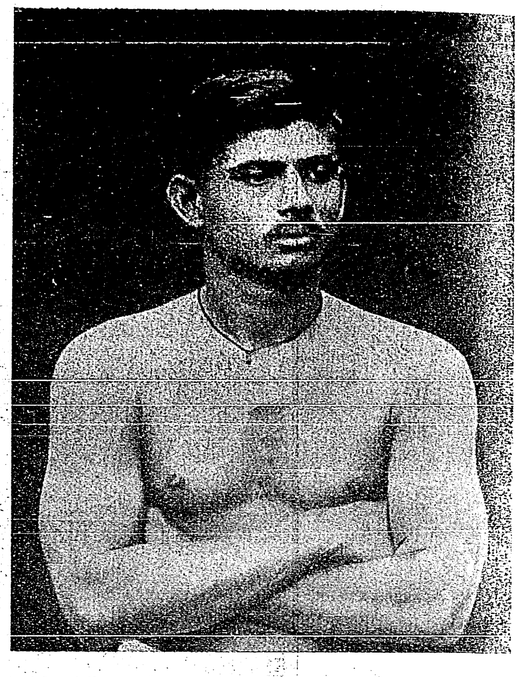

লেখক

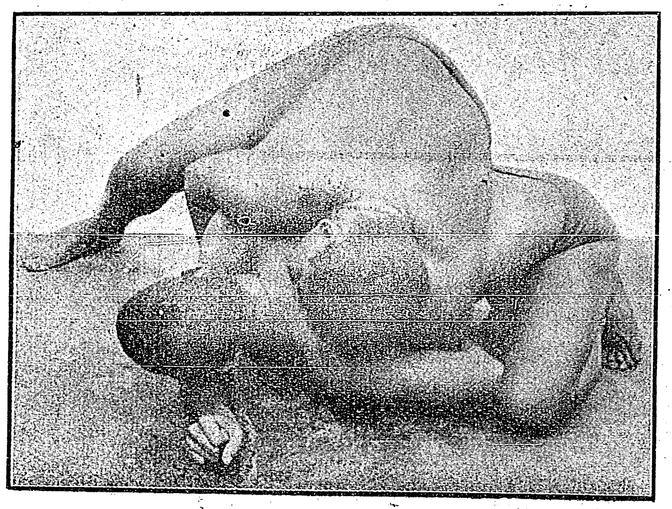

"গাধালেট"

গুরুমুখী বিদ্যা। উপযুক্ত শিক্ষকের সাহায্য পাইলে ইহা ঠিকভাবে ও শীঘ্র আয়ত্তে আসিবে। প্রবন্ধের বিষয় যদি কাহারও কিছু বলিবার ও জানিবার থাকে এই ঠিকানায় (৩২।২এ মহেন্দ্র গোস্বামী লেন) আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে বাধিত হইব। আর বাকি প্যাঁচগুলি ও প্যাঁচের তোড়গুলি বই ছাপাইতে মনস্থ করিয়া বাকি রাখিলাম। প্যাঁচগুলি অল্প ছবির দ্বারা পরিষ্কাররূপে বোঝান কষ্টকর, সেই জন্য ছবি তুলাইবার কিছু ত্রুটী রহিয়া গিয়াছে। বই বাহির করিবার সময় সংশোধন করিতে চেষ্টা করিব।

উপস্থিত সমাপ্ত

ভ্রম সংশোধন *

বিগত চৈত্র-মাসে এই প্রবন্ধের যে অংশ বাহির হইয়াছিল তাহাতে ছাপার কতকগুলি ভুল রহিয়া গিয়াছে। নিম্নে ভুলগুলি সংশোধন করিয়া দেওয়া হইল। আশা করি পাঠকগণ সংশোধন করিয়া পড়িবেন।

"মুচ্ছীফোটা"র স্থানে "মুচ্ছীকোটা" হইবে, "বিম্বা"র স্থানে "ঘিম্বা" হইবে। ৫৩৯ পৃষ্ঠায় "হপ্তা" প্যাঁচের মধ্যে ৩য় লাইনে "ডান বগলের মধ্য দিয়া ডান হাত কিম্বা বাঁ বগলের মধ্য দিয়া বাঁ হাত চালাইয়া দিয়া" এইরূপ হইবে।

রাজেন্দ্র দত্ত

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, এম্-এ, এফ্-এস্-এস্, এফ্-আর-ই-এস্

বিদ্যায়,—বুদ্ধিতে, সামাজিক প্রতিপত্তিতে, নীরব জনহিতৈষণায় ও উদার বিশ্বপ্রেমে যিনি অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের দেশে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন, সমৃদ্ধির ক্রোড়ে লালিত হইয়াও যিনি বিলাসের পুষ্পাস্তৃত পন্থা পরিহার পূর্ব্বক দীনের পর্ণকুটীরে মরণাহত রোগীর শয্যাপার্শ্বে দেবদূতের ন্যায় কত বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিয়া চিকিৎসা, সেবা ও পথ্য-প্রদান করিয়া অসহায় পরিবারবর্গের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, এ দেশে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক, জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রাজেন্দ্র দত্ত বা 'রাজাবাবু'র পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে আজ 'ভারতবর্ষ' তাহার শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছে।

পলাসীর যুদ্ধের পরে যে সকল ভাগ্যান্বেষী বাঙ্গালী কলিকাতায় আগমন করিয়া স্বাবলম্বন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের প্রভাবে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বহুবাজারের দত্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা অক্রুর দত্ত অন্যতম। হুগলী জেলায় মগ্‌রা ষ্টেশনের সন্নিহিত সোনাটিকুরি নামক গ্রামে অক্রুর দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, ইনি কৈশোর কাল আলস্যে ও আমোদ-প্রমোদে অতিবাহিত করিতেন এবং অত্যধিক স্নেহপরায়ণা জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়ার আদরে তিনি বিষয়কর্ম্মে মনোযোগ দিতে আদৌ উৎসুক ছিলেন না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা একদিন এই ব্যাপার লইয়া স্ত্রীকে অত্যন্ত অনুযোগ করায় তিনি দেবরকে যথোচিত তিরস্কার করিয়া প্রতিবেশীদিগের গৃহে অলস আমোদ-প্রমোদে কালাতিপাত করিতে নিষেধ করিলেন এবং স্বভাব পরিবর্ত্তন না করিলে ভাতের পরিবর্ত্তে ছাই খাইতে দিবেন বলিয়া শাসাইলেন। কিন্তু মানুষের স্বভাব একদিনেই পরিবর্ত্তিত হয় না। অক্রুর দত্তের একদিন বাটী ফিরিতে অনেক বিলম্ব হইল। তাঁহার ভ্রাতৃজায়াও তাঁহাকে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার ভাতের থালায় অন্ন-ব্যঞ্জনের সঙ্গে একটু ছাই রাখিয়া দিলেন। অক্রুর দত্তের ইহাতে মনে বড় কষ্ট হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ বাটী ত্যাগ করিয়া ভাগ্যান্বেষণে যাত্রা করিলেন। রাত্রিতে একটি গ্রামে একজন ধনীর অট্টালিকার বারাণ্ডায় অতিবাহিত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। সেই অট্টালিকাটি একজন সম্পত্তিশালিনী ভূম্যধিকারিণীর সম্পত্তি; বর্গীরা সেই রাত্রে সেই বাটী লুণ্ঠন করিবে সংবাদ দিয়াছিল। বিধবা জমিদার-গৃহিণী অক্রুর দত্তের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব গুণে স্বীয় ধর্ম্ম ও বহুমূল্য সম্পত্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হন এবং প্রীত হইয়া তাঁহাকে রাজরাজেশ্বর শালগ্রামশিলা, আকবরী মোহর, পঞ্চমুখী শঙ্খ, একমুখী রুদ্রাক্ষ ও কয়েকখানি সোণার ইট প্রদান করেন। অক্রুর দত্ত উহা লইয়া কলিকাতা আসেন এবং বহুবাজারে একজন সদ্গোপের বাটীতে আশ্রয় লন। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে পুণ্যশীলা রাণী রাসমণির শ্বশুর তাঁহারই ন্যায় একজন ভাগ্যান্বেষী পীরিতরাম দাসের সহিত আলাপ হইল এবং উভয়ে মিলিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করেন। অক্রুর দত্ত প্রথমে জাহাজে মাল বিক্রয় করিতেন, পরে সৈন্য-বিভাগে ঠিকাদারের কার্য্য করিতেন এবং অবশেষে জাহাজের কারবার করিয়া প্রভূত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে আলিপুর জজ কোর্টে একটি মোকদ্দমার সাক্ষ্যে রাজেন্দ্র দত্ত বলেন যে অক্রুর দত্ত বাণিজ্য-ব্যবসায় করিতেন। ডায়মণ্ডহারবার হইতে কলিকাতায় এবং কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ডহারবারে পণ্যদ্রব্য প্রেরণের জন্য তাঁহার কতকগুলি জাহাজ ছিল। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যুকালে ইনি কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ ধনী ছিলেন। ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার বংশধরগণ ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার ব্যবসায় চালাইয়াছিলেন।

অক্রুর দত্তের চারি পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রামমোহনের পাঁচ পুত্র হয়, যথা,—দুর্গাচরণ, পার্ব্বতীচরণ, উমাচরণ, কালিদাস, শিবদাস। রাজেন্দ্র দত্ত পার্ব্বতীচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে রাজেন্দ্র জন্মগ্রহণ

করেন। রাজেন্দ্রের জননী রাজা স্যার রাধাকান্ত দেবের ভাগিনেয়ী ছিলেন।

শৈশবেই রাজেন্দ্রের পিতৃবিয়োগ হয়। কিন্তু তাঁহার স্নেহময় জ্যেষ্ঠতাত দুর্গাচরণ ও তদীয় পত্নী বিমলা দাসী তাঁহাদের নিজের সন্তানদিগের অপেক্ষা রাজেন্দ্র দত্তকে ভাল বাসিতেন এবং তাঁহাকে পিতার অভাব জানিতে দেন নাই। পিতামহ রামমোহনও তাঁহার পৌত্রের সকল আবদার প্রসন্ন বদনে রক্ষা করিতেন। তখন করেন্সী নোটের প্রচলন হয় নাই, এবং আদান-প্রদান সচরাচর রৌপ্যমুদ্রার দ্বারাই হইত। পিতামহ ও জ্যেষ্ঠতাতের দেওয়ানখানায় স্তূপাকার রৌপ্যমুদ্রার উপর শিশু রাজেন্দ্র ক্রীড়া করিতেন, মুঠা মুঠা মুদ্রা লইয়া গিয়া দাস দাসী দীন দরিদ্রকে বিলাইতেন। কেহ কেহ গৃহকর্ত্তাকে ফিরাইয়া দিত, কেহ কেহ দিত না। পিতামহ ও জ্যেষ্ঠতাত শিশুর সহাস্য আনন দেখিয়া ক্ষতির কথা বিস্মৃত হইতেন। এইরূপে শৈশব হইতে রাজেন্দ্র শিখিয়াছিলেন যে, অর্থের মূল্য সঞ্চয়ে নহে, দীন-দরিদ্রের মুখে হাসি ফুটাইয়া তোলায়। তিনি ভবিষ্যতে যখন ব্যবসায়ের দ্বারা লক্ষ লক্ষ মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তখনও যেরূপ অর্থের মায়ায় আকৃষ্ট হন নাই, যখন তাঁহার ঋদ্ধি প্রতিহত হইয়াছে, তিনি অপেক্ষাকৃত দারিদ্র্যদশায় পতিত হইয়াছিলেন, তখনও তিনি অর্থের মায়া করেন নাই, মুক্ত হস্তে দীনের সেবা করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মতলায় ডেভিড ড্রমণ্ড নামক একজন স্কট্‌ল্যাণ্ড্‌বাসী 'ড্রমণ্ড একাডেমী' নামে একটি বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেন। ইনি একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। ২৮ বৎসর বয়সে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে স্কটল্যাণ্ড পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই তিনি সুকবি রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন এবং ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় মৃত্যুমুখে পতিত হইবার বহু বৎসর পরেও তাঁহার স্বদেশে তাঁহার রচিত সুমধুর গীতগুলি গীত হইত। রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র দেব, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি বঙ্গগৌরব মহাত্মগণের গুরু হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও এই ডেভিড ড্রমণ্ডের বিদ্যালয়েই তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন এবং ড্রমণ্ডের যত্নবারি সেচনেই ডিরোজিওর প্রতিভামুকুল প্রস্ফুটিত হইয়া দিগদিগন্তে অপূর্ব্ব সৌরভ বিস্তার করিয়াছিল। ড্রমণ্ড একাধারে কবি, দার্শনিক ও গণিতবিৎ ছিলেন। তাঁহার শেষজীবন দারিদ্র্যে অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার রচনাবলী স্কট্‌ল্যাণ্ডে প্রকাশিত করিবার জন্য তাঁহার প্রতিভামুগ্ধ বন্ধু সুপ্রসিদ্ধ কাপ্তেন ডেভিড লেষ্টার রিচার্ডসনের হস্তে দিয়া ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ইহলোক হইতে অবসৃত হন। কেহ কেহ বলেন এগুলি প্রকাশিত হইলে তিনি রবার্ট বার্ণিসের ন্যায় বিখ্যাত হইতে পারিতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে যে জাহাজে রচনাগুলি স্কট্‌ল্যাণ্ডে প্রেরিত হয়, তাহা জলমগ্ন হওয়ায় মৃত্যুর পরেও ডেভিড ড্রমণ্ড তাঁহার প্রতিভার পুরস্কার পাইলেন না! তিনি যে সকল ইঙ্গবঙ্গীয় সাময়িক-পত্রে সম্পাদক বা লেখকরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাহা হইতে এখনও তাঁহার কিছু কিছু রচনা উদ্ধার করা অসম্ভব নহে।

রাজেন্দ্র দত্ত বাল্যকালে এই ডেভিড ড্রমণ্ডের বিদ্যালয়েই য়ুরোপীয় ও য়ুরেশীয় সহপাঠিগণের সঙ্গে ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, ল্যাটিন ও গ্রীক সাহিত্য অধ্যয়ন করেন এবং ডেভিড ড্রমণ্ডের উপদেশে ডিরোজিওর ন্যায় স্বাধীন চিন্তা করিতে শিক্ষা করেন।

হিন্দু কলেজ এই সময়ে অপূর্ব্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং রাজেন্দ্রকে উক্ত কলেজে প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ল্যাটিন, গ্রীক প্রভৃতি ভাষা শিক্ষার সুযোগ না পাইয়া তিনি উক্ত বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় ড্রমণ্ডের স্কুলে ফিরিয়া আসেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত হয়। ইহার পূর্ব্বেই ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে তিনি হুগলী জেলার অন্তর্গত সুগন্ধা গ্রাম নিবাসী রামচাঁদ মিত্রের কন্যা কৈলাস-কামিনীর পাণিগ্রহণ করেন। ইনি ক্রোরপতি রামদুলাল সরকারের দৌহিত্রী ও দয়াল মিত্রের ভগিনী ছিলেন।

শিক্ষা সমাপ্তির পর রাজেন্দ্রকে পারিবারিক বিষয়াদি পরিদর্শনের ভার প্রদত্ত হয়। দত্তমহাশয়দিগের তেজারতি কারবার ছিল। রাজেন্দ্র কতকগুলি দলিল পাঠে দেখিলেন যে, অনেকের নিকট বিস্তর সুদ প্রাপ্য হইয়াছে, সুদের হারও অত্যধিক। অধমর্ণগণ দায়ে পড়িয়া ঋণ গ্রহণ করিয়াছে, কখনও শোধ করিতে পারিবে কি না সন্দেহ। দয়ার্দ্রচিত্ত যুবক এই সকল অধমর্ণদিগের দুর্দ্দশা চিন্তা করিতেন। তাহাদের নিরুপায় অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া

তাহাদিগকে অব্যাহতি প্রদানের জন্য কয়েকখানি দলিল ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। পরে একজন অধমর্ণ টাকা ফেরত দিতে আসিলে, দলিল কিছুতেই পাওয়া গেল না। উপর্য্যুপরি কয়েক দিন সেই অধমর্ণ ব্যর্থ চেষ্টা পাইয়া অবশেষে কর্ত্তাদের নিকট জানাইল, রাজাবাবু দলিল ফেরত দিতেছেন না, এদিকে সুদ বাড়িয়া যাইতেছে। রাজেন্দ্রের ডাক পড়িল এবং অবশেষে প্রকাশ পাইল যে রাজেন্দ্র যে কয়েকখানি দলিল নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন প্রার্থিত দলিল-খানি তাহাদেরই অন্যতম। কোমলহৃদয় রাজেন্দ্র দ্বারা এ সকল বিষয়-কার্য্য সম্পন্ন করা সম্ভব নহে বলিয়া তাঁহাকে উক্ত কার্য্য হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হইল এবং রাজেন্দ্র স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

অতঃপর রাজেন্দ্র দত্ত কিছুকাল মেডিক্যাল কলেজে অতিরিক্ত ছাত্ররূপে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এইখানে স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব সংঘটিত হয়। দরিদ্রগণের বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবার জন্য রাজেন্দ্র একটি এলোপ্যাথিক চিকিৎসালয় স্থাপন করতঃ দুর্গাচরণকে উহার চিকিৎসক নিযুক্ত করেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে স্বয়ংও রোগীদিগকে দেখিতেন। এইরূপে ভারতবর্ষে হোমিওপ্যাথির প্রবর্ত্তক রাজেন্দ্র দত্ত প্রথম জীবনে এলোপ্যাথির বিস্তারের জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়াছিলেন।

জ্ঞানচর্চ্চায় রাজেন্দ্রের অনন্যসাধারণ অধ্যবসায় ছিল। তিনি প্রভূত অর্থব্যয়ে যে গার্হস্থ্য পুস্তকাগার করিয়াছিলেন তাহার অনুরূপ কলিকাতায় আর ছিল কি না সন্দেহ। কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীতে যে সকল গ্রন্থ পাওয়া যাইত না, রাজেন্দ্রের পুস্তকাগারে তাহা মিলিত। বহু য়ুরোপীয় ও আমেরিক্যান পণ্ডিত তাঁহার পাঠাগারে আসিয়া গবেষণা করিতেন। একজন আমেরিক্যান পণ্ডিত ডাক্তার ফিট্‌জ্ এডওয়ার্ড হল ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আসিয়া রাজেন্দ্রের সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি সন্দর্শনে এতদূর মোহিত হইয়াছিলেন যে, ৪৩ বৎসর পরে রাজেন্দ্রের মৃত্যুর পর 'নিউ ইয়র্ক নেশন' পত্রে তাঁহার উচ্চ সুখ্যাতিপূর্ণ শ্রদ্ধাসূচক একটি প্রস্তাব প্রকাশিত করেন। ডাক্তার হলকে রাজেন্দ্র তদানীন্তন লর্ড বিশপের সঙ্গে পরিচিত করাইয়া দেন এবং বারাণসী কলেজের অধ্যক্ষ পদ প্রাপ্তির সুযোগ করিয়া দেন। ডাক্তার হল ভারতবর্ষ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া অক্সফোর্ডে প্রাচ্যবিদ্যার অধ্যাপক ও সিবিল সার্ভিস পরীক্ষার পরীক্ষক হন এবং অবশেষে ইণ্ডিয়া অফিসের গ্রন্থাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ডাক্তার হল রাজেন্দ্রের অপূর্ব্ব পুস্তক-সংগ্রহ ও পাঠানুরাগ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"রাজেন্দ্র দত্তের সমসাময়িকগণের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অতি অল্প বাঙ্গালীই শৈশব হইতে তাঁহার ন্যায় যত্নসহকারে আমাদের ভাষায় শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ইংরাজী সাহিত্য ও বিজ্ঞানে প্রবল অনুরাগের ফলে একপ্রকার প্রাচ্যভাববিবর্জ্জিত হইয়াছিলেন। ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে জন্ম গ্রহণ করায় ও যথেচ্ছ অবসর থাকায় তিনি যৌবনের প্রারম্ভ হইতে প্রভূত অধ্যবসায় সহকারে বিদ্যার্জ্জন এবং সকল প্রকারের গ্রন্থসংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার গ্রন্থাগার কলিকাতার গার্হস্থ্য অন্যান্য গ্রন্থাগার অপেক্ষা বৃহৎ ও মূল্যবান্ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত এই গ্রন্থাগার বৃদ্ধিই পাইয়াছিল। তিনি কেবল গৃহশোভার জন্য এই পুস্তকরাশি সংগ্রহ করেন নাই; তাঁহার ক্রীত প্রত্যেক গ্রন্থ তিনি অন্ততঃ এক ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টা না দেখিয়া শেলফে তুলিতে দিতেন না, এবং অভিধান বা পঞ্জিকাশ্রেণীর গ্রন্থ না হইলে শীঘ্রই পুনরায় সূক্ষ্মভাবে অধ্যয়ন করিতেন। এবং তাঁহার সেই পাঠ রীতিমত মনোযোগ ও সমালোচকের দৃষ্টিতে পঠিত হইত।

"উদাহরণ স্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। ল্যাণ্ডরের প্রথম প্রকাশিত সমগ্র গ্রন্থাবলী তিনি প্রতিভামুগ্ধ পাঠকোচিত উৎসাহ ও আনন্দের সহিত প্রাপ্ত হইবার ছয় মাস পরে আমরা উহার সম্বন্ধে আলোচনা করিব স্থির করি। বলা বাহুল্য ইতোমধ্যে আমরা উভয়েই উহা পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম। আমি অত্যুক্তি করিতেছি না, আমার বোধ হইয়াছিল সমুদায় তাঁহার কণ্ঠস্থ। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া বহুবার আমরা আলোচনা করিতে বসিয়াছিলাম এবং জীবনচরিত ও ইতিহাসে তাঁহার অধিকার সন্দর্শন করিবার আমি যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছি। তাঁহার জ্ঞানের প্রসার ও অভ্রান্ততা আমার নিকট বিস্ময়কর বোধ হইয়াছিল।"

এই সময়ে তিনি ব্যবসায়েও যথেষ্ট উন্নতি করিয়া-

ছিলেন। বহু ইংরাজী, আমেরিকান ও গ্রীক হৌসের সহিত তিনি বৈনিয়ানরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ডাইরেক্টরী দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ও তাঁহার খুল্লতাত কালিদাস দত্ত এই সময়ে নিম্নলিখিত য়ুরোপীয় ও ও আমেরিকান হৌসের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন—

(১) জর্জ্জ অক্‌ল্যাণ্ড (২) এটকিন্সন টিণ্টন এণ্ড কোং (৩) রিচার্ড লিউইস (৪) নরম্যান ব্রাদার্স (৫) বি আর হুইলরাইট (৬) শিলিজি এণ্ড কোং।

বহু ইংরাজ ও আমেরিকান তাঁহার সাধুতা, অমায়িকতা ও শিষ্টাচারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত প্রগাঢ় বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং আজীবন এই বন্ধুত্বের স্মৃতি হৃদয়পটে উজ্জ্বল রাখিয়াছিলেন। থিওডোর, এ, নীল নামক একজন ধনী আমেরিক্যান বণিকের ২৮শে জুন ১৮৬৭ তারিখ সম্বলিত একখানি পত্র রাজেন্দ্র দত্তের কাগজ-পত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। তাহাতে তিনি অতীতের বহু স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং তাঁহার আমেরিক্যান বন্ধুগণ রাজেন্দ্র দত্তের স্মৃতি তখনও কিরূপ উজ্জ্বলভাবে হৃদয়ে পোষণ করিতেন তাহার পরিচয় দিয়াছেন। মিষ্টার নীল রাজেন্দ্রর এক কন্যার নামানুসারে স্বীয় কন্যার নাম 'মাতঙ্গিনী' নীল রাখিয়াছিলেন এবং পত্র লিখিবার সময়ও তাঁহার সেই বিংশতিবর্ষীয় কন্যা মাতঙ্গিনী নীল রাজেন্দ্র কর্ত্তৃক প্রদত্ত কাশ্মীরী শালখানি কিরূপ যত্নে রাখিয়াছেন ও তাঁহার কথা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া থাকেন, তাহা জানাইয়াছেন। পত্রখানি দীর্ঘ বলিয়া তাহা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে হইল।

এই সময়ে রাজেন্দ্র আর একটি প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে যখন দেশীয় ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত হিন্দু কলেজের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছানুরূপভাবে পরিচালিত করিতে লাগিলেন, তখন রাজেন্দ্র দত্ত কতিপয় হিন্দু নেতার সহিত মিলিত হইয়া একটি জাতীয় মহাবিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন। ইংরাজী কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত গুরুচরণ দত্ত মহাশয়ের চিৎপুর রোডে একটি স্কুল ছিল। মতিলাল শীলের ফ্রী-স্কুলের সহিত সম্মিলিত করিয়া রাজেন্দ্র দত্ত একটি উচ্চশ্রেণীর কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব করিলেন এবং মতিলাল শীলকে এই প্রস্তাবে সম্মত করাইলেন। কলেজটির নাম হইল 'হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ'। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ২রা মে তারিখে ৭৭ নং চিৎপুর রোডে এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। মতিলাল শীল এই কলেজের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মাসিক চারি শত টাকা অর্থসাহায্য করিতেন। অতিরিক্ত ব্যয় রাজেন্দ্র দত্ত স্বয়ং বহন করিতেন।

কলেজ প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পূর্ব্বে শিক্ষাপরিষদের সভাপতি মহাত্মা ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন চরিত্রদোষের জন্য হিন্দু কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ কাপ্তেন ডেভিড লেষ্টার রিচার্ডসনকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছিলেন। রিচার্ডসনের ন্যায় প্রতিভাশালী ব্যক্তি এ দেশে অতি অল্পই আসিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় সুপণ্ডিত, সুলেখক, সুকবি, সদ্বক্তা ও সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক তখন ভারতবর্ষে আর ছিল কি না সন্দেহ। রাজেন্দ্র দত্ত চারি শত টাকা মাসিক বেতনে তাঁহাকে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করেন। বিখ্যাত ব্যবসায়ী জন পামারের এক পুত্র কাপ্তেন এফ পামার ৩৫০৲ বেতনে ইংরাজীর অধ্যাপক, উইলিয়ম কার্কপ্যাট্রিক নামক একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি ৩০০৲ বেতনে দর্শন ও অর্থনীতির অধ্যাপক, উইলিয়ম মাষ্টার্স নামক আর একজন বিচক্ষণ য়ুরোপীয় শিক্ষক ৩৫০৲ বেতনে গণিত ও বিজ্ঞানের শিক্ষক, এবং পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রধান পণ্ডিতের নিযুক্ত হন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই এই কলেজ গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত কলেজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিল। স্যর জন পিটার গ্রাণ্ট, স্যর লরেন্স পীল, মেজর জেনারেল ল, চার্লস এলেন, গর্ডন ইয়ং, ডাক্তার মৌএট প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আসিয়া কলেজের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়া গিয়াছিলেন। এই কলেজের কয়েকজন বিশিষ্ট ছাত্রের নাম হইতে কলেজের গৌরব উপলব্ধ হইবে—

যদুনাথ ঘোষ	ইংরাজীতে সুপণ্ডিত ও সদ্বক্তা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বহুদিন শীলস্ ফ্রী স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন।
নীলমণি দে	অত্যুৎকৃষ্ট ইংরাজী প্রবন্ধ লিখিয়া কলেজ হইতে স্যর লরেন্স পীল প্রদত্ত পদক প্রাপ্ত হন। (লেখকের মাতামহ ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে সি-আই-ই প্রভৃতির পিতা।)
জয়গোবিন্দ লাহা	কলিকাতার বিখ্যাত লাহা-বংশীয়। শারীরিক বলের জন্য বিখ্যাত ছিলেন।
দ্বারকানাথ সিংহ	রেভারেণ্ড সি এইচ এ ডলের স্কুলের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন।
কাশীনাথ মিত্র	স্যর রমেশচন্দ্র মিত্রের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও গণিতে পারদর্শী ছিলেন।
কেশবচন্দ্র সেন	বিখ্যাত বাগ্মী ও ধর্ম্মসংস্কারক।
শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	'রেইস এণ্ড রায়তে'র সুপণ্ডিত সম্পাদক
কৃষ্ণদাস পাল	'হিন্দু পেট্রিয়টে'র বিখ্যাত সম্পাদক।
রমেশচন্দ্র মিত্র	হাইকোর্টের প্রথম বাঙ্গালী প্রধান বিচারপতি।
গণেশচন্দ্র চন্দ্র	এটর্ণীরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।
নরেন্দ্রনাথ সেন	'ইণ্ডিয়ান মিরর' সম্পাদক।

এই বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য পাঁচ ছয় বৎসর রাজেন্দ্র দত্ত অহোরাত্র পরিশ্রম করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্যালয় উঠিয়া যায়। এই সময়ে রাজেন্দ্র এসিয়াটিক সোসাইটী, কলিকাতা পাব্লিক লাইব্রেরী, ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটী প্রভৃতি নানা প্রতিষ্ঠানের উৎসাহশীল সভ্যরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বেথুন স্কুল পরিদর্শন সমিতির সভ্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে "ভারতের ডিমস্থিনীস" রামগোপাল ঘোষের মৃত্যুর পর তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপনার্থ যে সমিতি গঠিত হয়, রাজেন্দ্র দত্ত তাহার সম্পাদক ছিলেন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্র দত্ত,—দত্ত, লিণ্টজী এণ্ড কোং নামক একটি কোম্পানী স্থাপন করিয়া আমেরিকার সহিত স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন। ব্যবসায়ে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন; কিন্তু ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রেরিত মাল নষ্ট হওয়ায় ফেরত আসে এবং তিনি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ব্যবসায় উঠাইয়া দিতে বাধ্য হন।

দত্ত লিণ্টজী এণ্ড কোং ব্যতীত রাজেন্দ্র দত্ত নিম্নলিখিত ব্যবসায়গুলিই স্থাপিত করিয়াছিলেন—

গ্যাঞ্জেস পাইলট কোং, হুগলী টাগ কোং, শ্রীরামপুর স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং, খষড়া ইয়ার্ণ কোং।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে রাজেন্দ্র এ দেশে এলোপ্যাথি চিকিৎসা-পদ্ধতি প্রচারিত করিবার জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয়

করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা হইল যে, হোমিওপ্যাথিক শ্রেষ্ঠতর। তিনি ডাক্তার সি, এফ, টনেয়ার নামক একজন য়ুরোপীয় হোমিওপ্যাথকে নিজব্যয়ে কলিকাতায় আনয়ন করেন এবং বাঙ্গালার তদানীন্তন ডেপুটীগবর্ণর স্যার জন লিট্‌লারকে পৃষ্ঠপোষক করিয়া এ দেশে প্রথম হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাগার ও দাতব্য ঔষধালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। এ দেশে হোমিওপ্যাথির বিস্তারের জন্য রাজেন্দ্র প্রাণপণ চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহারই চেষ্টায় ডাক্তার টনেয়ার কলিকাতার প্রথম হেল্‌থ্ অফিসার নিযুক্ত হইবার পর হোমিওপ্যাথির প্রচার কিছু ক্ষুণ্ণ হয়। দত্ত লিণ্টজী কোং উঠিয়া যাইবার পর ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্র কিছুদিন চন্দননগরে ভগ্ন-স্বাস্থ্য উদ্ধার মানসে গমন করেন। এখানে তখন ভীষণ ম্যালেরিয়ার প্রকোপ। লোকে উহার একমাত্র এলোপ্যাথিক ঔষধ কুইনাইন খাইয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা আর কুইনাইন খাইতে চাহে না। রাজেন্দ্র কয়েকটি স্থলে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ 'আর্সেনিকম' প্রয়োগ করিয়া পুরাতন রোগীদিগকে সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর তাঁহার বাসভবনে শত শত রোগী ঔষধ লইতে আসিতে আরম্ভ করিল। রাজেন্দ্রও বিশেষ মনোযোগের সহিত হোমিওপ্যাথি গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া দিলেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণের বহুদিনের পুরাতন রোগ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা সারাইয়া দিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় রাজেন্দ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া হোমিওপ্যাথির ভক্ত হইলেন।

শত শত রোগীকে রোগমুক্ত করিয়া রাজেন্দ্র ধন্বন্তরী বলিয়া জনসমাজে পূজিত হইতে লাগিলেন। এই সময়ে বৃদ্ধ রাজা রাধাকান্ত দেবের পায়ে ভীষণ গ্যাংগ্রীন হয়। বড় বড় ডাক্তারেরা জবাব দিয়া গেলেন। অবশেষে রাজেন্দ্র দত্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দ্বারা তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়া দিলেন। চারি দিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। রাজা রাধাকান্ত রাজেন্দ্রকে পঁচিশ হাজার টাকা পারিশ্রমিক দিতে চাহিলেন; কিন্তু রাজেন্দ্র উহা লইতে অস্বীকার করিলেন।

তিনি হোমিওপ্যাথি প্রচার করিবার জন্য অজস্র অর্থব্যয় করিয়াছিলেন; কিন্তু কখনও কাহারও নিকট হইতে এক পয়সা গ্রহণ করেন নাই, অথচ দীন দরিদ্রদিগের পথ্য পর্য্যন্ত নিজ-গৃহে প্রস্তুত করিয়া লইয়া যাইতেন। তিনি অনেকগুলি পকেট-বিশিষ্ট একটী আলখাল্লার মত জামা পরিতেন এবং পকেটগুলিতে ডালিম, বেদানা, আঙ্গুর প্রভৃতি রোগীর পথ্য ও ঔষধাদি থাকিত। পরোপকার-ব্রত তিনি জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ডাক্তার টি, বেরিণি কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি প্যারী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডাক্তারের উপাধি লাভ করিয়া আমেরিকায় হোমিওপ্যাথি শিক্ষা করেন। রাজেন্দ্র দত্ত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় করিয়া এবং তাহাতে ডাঃ বেরিণিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রাণপণে এ দেশে হোমিওপ্যাথি বিস্তারের চেষ্টা করেন। ডাঃ বেরিণির যদি খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি বিরাগ এবং আধ্যাত্মিকতা-বাদের প্রতি বিশেষ পক্ষপাত না থাকিত, তাহা হইলে হয় ত তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল ও তাঁহার ব্যবস্থাসচিব এ দেশে হোমিওপ্যাথির পৃষ্ঠ-পোষকতা করিতেন।

রাজা রাধাকান্ত দেবের আরোগ্যলাভের পর জনসাধারণ সহস্রকণ্ঠে রাজেন্দ্র দত্তের সুখ্যাতি করিলেও, তাঁহার বিপক্ষও বড় মন্দ ছিল না। একজন তরুণ চিকিৎসক—মহেন্দ্রলাল সরকার—তাঁহাকে হাতুড়ে চিকিৎসক বলিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। তিনি বলিলেন, রাজার আরোগ্য-লাভের কারণ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ নহে, অত্যধিক মাত্রায় এলোপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগ বন্ধ করিবার ফলেই রাজা সুস্থ হইয়াছেন। রাজেন্দ্র বিশেষ চেষ্টা করিয়াও মহেন্দ্রলালকে হোমিওপ্যাথির শ্রেষ্ঠতা বুঝাইতে পারিলেন না। এই সময়ে মহেন্দ্রলাল মনীষী কিশোরীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ডে'র জন্য মর্গানের 'ফিলজফি অব হোমিওপ্যাথি' নামক একখানি গ্রন্থ সমালোচনা করিতে অনুরুদ্ধ হন। মহেন্দ্র-লাল এই উপলক্ষে হোমিওপ্যাথিক প্রণালীর নিন্দা করিয়া রাজেন্দ্র দত্তের উপর এক হাত লইবেন সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু গ্রন্থখানি পড়িয়া তাঁহার মনে হইল উহাতে যে সকল সত্য নিহিত আছে তাহা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। এ বিষয়ে কিছু অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়া গ্রন্থ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করাও যায় না। তখন তিনি রাজেন্দ্রবাবুর শরণাপন্ন হইলেন এবং তাঁহার সহিত তাঁহার রোগের চিকিৎসা দেখিতে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। রাজেন্দ্র সানন্দে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া কতকগুলি কঠিন রোগের চিকিৎসা দেখাইলেন। কয়েকটি রোগ আরোগ্য হইতে দেখিয়াও মহেন্দ্রলাল সন্তুষ্ট হইলেন না;—তিনি বলিলেন বোধ হয় পথ্যের ব্যবস্থার জন্য রোগী রোগমুক্ত হইতেছে—হোমিওপ্যাথিক ঔষধের গুণে নহে। কিন্তু যখন দেখা গেল যথোচিত পথ্য দিয়াও ঔষধ বন্ধ করিলে রোগ বাড়িতে লাগিল, তখন তাঁহাকে হোমিও-প্যাথির গুণ স্বীকার করিতে হইল। তখন সত্যপ্রিয় মহেন্দ্রলালের সম্মুখে এক নূতন জগৎ দেখা দিল এবং ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ১৬ই ফেব্রুয়ারি বৃটিশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের বঙ্গীয় শাখায় বহু য়ুরোপীয় ও দেশীয় ডাক্তারদিগের সমক্ষে মহেন্দ্রলাল "চিকিৎসা শাস্ত্রের অনিশ্চিততা" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এলোপ্যাথির কতকগুলি দোষ প্রদর্শন করিলেন। এই নির্ভীক বক্তৃতা শেষ হইতে না হইতে য়ুরোপীয় এলোপ্যাথিক ডাক্তারেরা মহা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, এবং যে সভায় মহেন্দ্রলাল অন্যতম সহকারী সভাপতি ছিলেন, তাহা হইতে তিনি বিতাড়িত এবং চিকিৎসক-সমাজ হইতে বর্জ্জিত হইলেন।

কিন্তু রাজেন্দ্র দত্তের পৃষ্ঠপোষকতায় শীঘ্রই মহেন্দ্রলাল অদ্বিতীয় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকরূপে কলিকাতায় অপূর্ব্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। মহেন্দ্রলাল আজীবন রাজেন্দ্রকে তাঁহার গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন। মহেন্দ্রলালের বিজ্ঞান-সভা প্রতিষ্ঠার সময়েও রাজেন্দ্র দত্ত তাঁহাকে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রের আরও অনেক শিষ্য ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে হোমিওপ্যাথির প্রচার করেন। বস্তুতঃ রাজেন্দ্র দত্ত এ দেশে হোমিওপ্যাথির প্রবর্ত্তক।

য়ুরোপ ও আমেরিকার সহিত বাণিজ্য দ্বারা দেশবাসীকে ব্যবসায়ের দিকে আকৃষ্ট করা, প্রথম শ্রেণীর বিদ্যানিকেতন প্রতিষ্ঠিত করিয়া কেশব সেন, রমেশ মিত্র, শম্ভু মুখোপাধ্যায় বা কৃষ্ণদাসের ন্যায় মানুষ তৈয়ারী করা, কিম্বা হোমিও-প্যাথির প্রচারের জন্য মহেন্দ্রলাল সরকারের ন্যায় ব্যক্তির সৃষ্টি করাই রাজেন্দ্রের প্রধান গৌরব নহে। ডাক্তার ফিট্‌জ এডওয়ার্ড জনের ভাষায় বলিতে গেলে "তাঁহার

আত্মা বিশ্বপ্রেমে অনুপ্রাণিত ছিল। কেহ কষ্ট পাইতেছে শুনিলেই তিনি তাঁহার অর্থ ও সেবা দ্বারা তাহার দুঃখ দূর করিতে অগ্রসর হইতেন। বাস্তবিক তিনি পরার্থপরতার অবতার ছিলেন।" আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, "দিনে নিশীথে রোগশয্যার পার্শ্বে যাইবার জন্য কেহ ডাকিলেই তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইতেন; এবং দিনের পর দিন বিনা ভিজিটে, অনেক সময় নিজ ব্যয়ে গিয়া রোগীর চিকিৎসা করিতেন। আমি অনেকবার তাঁহার গাড়ীতে, তাঁহার সঙ্গে রোগী দেখিতে গিয়াছি ও তিনি কিরূপ একাগ্রতার সহিত চিকিৎসা করিতেন তাহা দেখিয়াছি। রোগীকে বাঁচাইবার জন্য সে ব্যগ্রতা, পরিবার পরিজনের সঙ্গে সেই সমদুঃখসুখতা আর দেখিব না।"

দেশের সর্ব্ববিধ মঙ্গলকর কার্য্যে তাঁহার সহানুভূতি ও সহযোগিতা ছিল। শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রতি তাঁহার বিশেষ বাৎসল্যভাব ছিল এবং তৎসম্পাদিত 'মুখার্জীর ম্যাগেজিন' ও 'রেইস এণ্ড রায়ত' তাঁহার উৎসাহে প্রবর্ত্তিত হয়। 'স্বদেশরক্ষায় ভীম' রামগোপাল ঘোষের মৃত্যুর পর রাজেন্দ্র তাঁহার স্মৃতিরক্ষিণী সভার অন্যতম সম্পাদকরূপে তাঁহার প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার সহায়তা করেন।

সমাজ-সংস্কারের দিকেও তাঁহার যথেষ্ট চেষ্টা ছিল। তাঁহারই চেষ্টায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পিতার নিকট হইতে বিলাত যাইবার অনুমতি প্রাপ্ত হন এবং বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিলে সুরেন্দ্রনাথ, মন্মথ মল্লিক, নগেন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি সমাজে গৃহীত হন।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ৫ই জুন ৭৮ বৎসর বয়সে রাজেন্দ্র সন্ন্যাস রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। রাজেন্দ্রের দীর্ঘ জীবনে তাঁহাকে কয়েকটি গভীর পারিবারিক দুঃখ পাইতে হইয়াছিল। মধ্যবয়সে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয়। তাঁহার দুই পুত্র দেবেন্দ্র ও উপেন্দ্রের মধ্যে কনিষ্ঠ উপেন্দ্র (৺ বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের জামাতা) ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ২৭শে সেপ্টেম্বর সকালে স্বর্গারোহণ করেন। রাজেন্দ্রের তিন কন্যা ছিলেন। জ্যেষ্ঠা নবীনমণি স্যর রমেশচন্দ্র মিত্রের অগ্রজ উমেশচন্দ্র মিত্রের সহিত পরিণীতা হন। এই উমেশচন্দ্রের বিধবা বিবাহ নাটক ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় অভিনীত হইয়াছিল। দ্বিতীয়া কন্যা মাতঙ্গিনী অল্প বয়সে বিধবা হন। তৃতীয়া কন্যা ভিক্টোরিয়া স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতির হেয়ার স্কুলে শিক্ষাগুরু উমাচরণ মিত্রের পুত্র অন্নদাপ্রসাদ মিত্রের সহিত বিবাহিতা হন। এই কন্যাটিও পিতার জীবিতকালেই অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেও রাজেন্দ্র দত্ত বিলাসিতা কাহাকে বলে জানিতেন না। তিনি সাদাসিধা পোষাক পরিচ্ছদ ভালবাসিতেন। তাঁহার একমাত্র সখ ছিল—গড়গড়ায় ধূমপান। তাঁহার গাড়ীতে একটি গড়গড়া লইয়া তিনি নানা স্থানে ঘুরিতেন। শুনিয়াছি যখন প্রিন্স অব ওয়েলস্ (পরে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড) বেলগাছিয়ার উদ্যানে দেশবাসিগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন, তখন রাজেন্দ্র দত্ত প্রিন্সকে গড়গড়ায় ধূমপান করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। প্রিন্স স্বহস্তে তাঁহাকে ও রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণকে পান দিয়াছিলেন।

রাজেন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার জন্য বিশেষ কোনও চেষ্টা হয় নাই। তাঁহার বাটীর নিকট একটি অপরিসর গলির নাম রাজেন্দ্র দত্ত লেন রাখিয়া এবং তাঁহার আবাস-ভবনের সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র প্রস্তর-ফলক রাখিয়া আমরা আমাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছি! দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও কলিকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মিঃ জে, ডোনাল্ডের সভাপতিত্বে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে দুই তিনবার তাঁহার সাম্বৎসরিক সভা আহূত হইয়াছিল; কিন্তু এখন আর ঐরূপ সভার কথা শুনিতে পাই না। যিনি আজীবন নীরবে নিঃস্বার্থ-ভাবে পরোপকার করিয়া গিয়াছেন,—কখনও যশের আকাঙ্ক্ষা করেন নাই, তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের ইতিহাসে তাঁহার নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকিবে, সন্দেহ নাই।

মুখের কথা

অধ্যাপক শ্রীসত্যরঞ্জন সেন এম্‌-এ, বি-এল

(১)

কুসুমপুরের জমীদার রায় মহাশয়দের একান্নবর্ত্তী সংসার যখন একদিনের একটা অসংযত মুখের কথায় ভাঙ্গিয়া গেল, এবং তিন পুরুষের এজমালি বিষয়-সম্পত্তি বিভাগের জন্য জেলা আদালতে তুমুল মকর্দ্দমা চলিতে লাগিল, তখন সারা গ্রামখানিতে এক নূতন উৎসাহ জাগিয়া উঠিয়াছিল।

আঘাত লাগিয়াছিল কেবল দুটী ক্ষুদ্র কোমল প্রাণে। দুই তরফের দুই বংশধর সতীশ এবং জ্যোতিষ,—সমবয়সী, মাত্র এক মাসের ছোট বড়,—এবং একসঙ্গে, একই ভাবে পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছিল। লোকে বলিত, এক মায়ের পেটেই যমজ-সন্তান হইয়া থাকে, কিন্তু এমনটী কখনও দেখা যায় না। সহসা যখন এই বিবাদের বিরাট প্রাচীর উঠিয়া নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে তাহাদের পৃথক করিয়া দিল,—এমন কি, বিদ্যালয়ের একই ক্লাসে রহিয়াও কর্ত্তাদের আদেশে এ উহার পানে চোখ তুলিয়া চাহিবার স্বাধীনতা পর্য্যন্ত হারাইল, তখন তাহাদের ক্ষুদ্র চক্ষু দুটী রুদ্ধ শোকের আবেগ আর সহ্য করিতে পারিল না। এই যন্ত্রণা হইতে উভয়েই একটু মুক্তিলাভ করিল, যখন সতীশের পিতা বিপক্ষের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিবার অভিপ্রায়ে, তাহাকে স্কুল হইতে সরাইয়া লইলেন।

তাহার পর এই যে ত্রিশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, তাহাতে ঘটনা-বাহুল্য না থাকিলেও ঘটনা-বৈচিত্র্য যথেষ্ট ছিল। সাত বৎসর মকর্দ্দমা চলিবার পর যখন তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইল, তখন উভয় পক্ষের দুরবস্থারও চূড়ান্ত হইয়াছে। আদালত হইতে আমিন আসিয়া যখন তাঁহাদের যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তি দুই সমান অংশে বিভাগ করিয়া গেল, তাহার বহু পূর্ব্বেই ভাগ্যদেবতার অদৃশ্য মাপকাঠিতে ছোটবড় দুই শত অংশে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহারা আদালত-নির্দ্দিষ্ট নিজ-নিজ অংশে দখল [২।] রর হিসাব খতাইয়া এবং দেনা-পাওনা মিটাইয়া দেখিলেন যে, পৈতৃক বাস-ভবনের অংশ ছাড়া যেটুকু অবশিষ্ট রহিল, তাহাতে সাবেক চাল বজায় রাখা আর চলে না।

কিন্তু নূতন কোন ব্যবস্থা করিবার অবকাশও তাঁহাদের মিলিল না। মকর্দ্দমা শেষ হইতেই বোধ হয় তাঁহাদের জীবনের কার্য্যও ফুরাইয়াছিল, তাই এক বৎসরের মধ্যে উভয়েই ইহ-লীলা সাঙ্গ করিলেন।

জ্যোতিষকে কলিকাতার কলেজের পড়া অসমাপ্ত রাখিয়া পশ্চিমাঞ্চলে চাকুরি করিতে ছুটিতে হইল।

সতীশের মামা হাইকোর্টের উকীল; মকর্দ্দমার সময় তাঁহার অনেক সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে এ-পক্ষের বাজে-খরচ অনেক কমিয়াছিল। তাহার উপর সতীশের পিতা খুব হিসাবী লোক ছিলেন, ছেলেকে স্কুল ছাড়াইয়া আনিয়া বেশী দিন বসাইয়া রাখেন নাই, বিষয়-কর্ম্ম দেখা-শুনার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিয়া, হাতে-কলমে বেশ একটু শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাই সতীশের পিতৃ-বিয়োগ হইলে তাহাকে জ্যোতিষের মত অকূলে ভাসিতে হয় নাই, পৈতৃক সম্পত্তির আয় হইতেই সংসার চালাইয়া ক্রমে সে একটু গুছাইয়া লইতে পারিয়াছিল।

(২)

এই ত্রিশ বৎসর কাল সতীশ এবং জ্যোতিষ কেহ কাহারও কোন সংবাদ রাখিতেন না। বাল্য-স্মৃতি অবশ্য একেবারে মুছিয়া যাইবার নয়; কিন্তু সে স্মৃতি একটা অস্পষ্ট বেদনায় পূর্ণ। পায়ে কাঁটা ফুটিলে তাহার যে যাতনা, তাহা কাঁটা তুলিয়া ফেলিলেই দূর হয়; কিন্তু ক্ষত স্থানে এমন একটু বেদনা থাকিয়া যায়, যাহা অনেক দিন পর্য্যন্ত কাঁটা-ফোটার তীব্র যাতনাকে মধ্যে মধ্যে স্মরণ করাইয়া দেয়। ইঁহাদেরও তাহাই হইয়াছিল;—বাল্য-জীবনের পরিপূর্ণ সুখের স্মৃতি চাপা পড়িয়া গিয়াছিল তাঁহাদের আকস্মিক বিচ্ছেদের বেদনায়। তাই যখনই একজনের কথা আর একজনের মনে পড়িত, তখন সেই নিষ্ঠুর

বিচ্ছেদের স্মৃতিই জাগিয়া উঠিত,—বাল্যকালের কথা ভাবিতে কাহারও মনে সুখ ছিল না।

এতদিন পরে আজ জ্যোতিষের একখানা পত্র পাইয়া সতীশের হৃদয় সহসা এক অপূর্ব্ব সুখের আবেশে ভরিয়া গেল। বাল্যের সেই বিস্মৃতপ্রায় ভ্রাতৃস্নেহ আজ আবার এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল। জ্যোতিষ চিঠিতে তাঁহাকে "দাদা" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, তিনি আর এখন কুসুমপুরের বড়-তরফের সতীশ রায় নহেন,—জ্যোতিষের দাদা! জ্যোতিষের সেই বাল্যকালের মধুর ডাক যেন বার বার তাঁহার কাণের নিকট ধ্বনিত হইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে অতীতের যত সুখময় স্মৃতি একে একে আসিয়া জুটিতে লাগিল।

এই সময়ে কন্যাকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সতীশ বলিয়া উঠিলেন—"বীণা, তোর কাকা আস্‌চে যে! এই দেখ, চিঠি দিয়েচে,—আট-দশ দিনের ভিতরই এসে পড়বে।"

বীণা প্রথমটা কিছু বুঝিতে পারিল না। সে কাকা বলিয়া কাহাকেও জানিত না। জ্যোতিষের কথা সে লোকমুখে প্রসঙ্গক্রমে কিছু কিছু শুনিয়াছে বটে, কিন্তু পিতার মুখে কখনও তাঁহার নাম পর্য্যন্ত শোনে নাই। তাই নিতান্ত কৌতূহলী হইয়া চিঠিখানা হাতে লইয়া, তাহাতে পত্রলেখকের স্বাক্ষর দেখিয়া তবে কথাটা বুঝিল। বলিল—"ও! ও-বাড়ীর জ্যোতিষ রায়?"

সতীশ বাধা দিয়া বলিলেন,—"জ্যোতিষ রায় কি রে! ও যে কাকা হয়,—দেখ্‌চিস্‌ না, আমাকে দাদা বলে চিঠি লিখেচে!"

বীণা যেন অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া, একটু নরম স্বরে বলিলেন—"তা তুই বা জান্‌বি কি করে,—কখনও ত চক্ষে দেখিস্‌ নি। কিন্তু তা'র কথা কি কখনও কিছু শুনিস্‌ নি?"

বীণা বলিল—"কিছু কিছু শুনেচি বই কি।"

সতীশ উঠিয়া সোজা হইয়া বসিলেন। বলিলেন,—"তা'কে আমি বড় ভালবাসতুম, জানিস্‌? মায়ের পেটের ভাইকেও বোধ হয় লোকে এত ভালবাস্‌তে পারে না।"

তার পর সতীশ তাঁহার বাল্যকালের সুখ ও সৌহার্দ্দ্যের কথা,—যাহা এত দিন নিজের কাছ হইতেও লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন,—একে একে শুনাইতে লাগিলেন। এ আলোচনায় তাঁহার এত আনন্দ দেখিয়া বীণা ভুলিয়া গেল যে সে পিতাকে আহারের জন্য ডাকিতে আসিয়াছে।

সতীশ বিপত্নীক, বীণা তাঁহার একমাত্র সন্তান। সেও তিন বৎসর হইল পর হইয়া গিয়াছে। এখনও যে একেবারে ছাড়িয়া যায় নাই, তাহার কারণ জামাতার কর্ম্মস্থল অতি দূরে। এম্‌-এ পাশ করিয়া সে এই এক বৎসর হইল রেঙ্গুন কলেজে অধ্যাপকের কার্য্য করিতেছে। কচি-ছেলে লইয়া বীণাকে এতদূরে পাঠাইতে সতীশের সাহস হয় নাই, জামাইও দ্বিরুক্তি করে নাই। বীণাও পিতার নিঃসঙ্গ জীবনকে একটু সরস করিয়া রাখিবার জন্য এই বিচ্ছেদের ক্লেশ হাসিমুখে বহন করিতেছে। তাই আজ পিতার এত আনন্দ দেখিয়া সে বড় সুখী হইল। পিতার কথা শুনিতে শুনিতে সে এত দিনে তাঁহার হৃদয়ের এক সরস কোমল অংশের সন্ধান পাইয়া তৃপ্ত হইল; ভাবিল, বাল্য-সখার সহিত এই দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর পুনর্ম্মিলন হইলে হয় ত তাঁহার সুখের অভাব অনেকটা পূর্ণ হইবে।

কিন্তু জ্যোতিষ মাত্র তিন মাসের ছুটী লইয়া আসিতেছেন। তাঁহার বড় মেয়েটী অরক্ষণীয়া হইয়া উঠিয়াছে,—যদিও আজকাল এ কথাটা অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে,—বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের মধ্যে তাহার বিবাহ দিতেই হইবে। মিলিটারী বিভাগের চাকুরি,—অধিক ছুটী পাওয়া গেল না।

(৩)

জ্যোতিষ আসিলেন। কয়েক দিন বেশ আনন্দে কাটিল। কিন্তু সতীশের যতটা স্ফূর্ত্তি দেখা গেল জ্যোতিষের ততটা হইল না,—কন্যার বিবাহের চিন্তায় যেন একটু বিমর্ষ, অন্যমনস্ক। সতীশ আশ্বাস দিয়া বলিলেন—"তোমার কোন চিন্তা নাই, সকল ভার আমার উপর ছেড়ে দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাক। আমি কথা দিয়ে রাখ্‌চি, যেমন করে হোক তোমার মেয়ের বিয়ে আমি দিয়ে দেবোই।"

দুজনে মিলিয়া পাত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন। অনেকগুলি সম্বন্ধ আসিল, কিন্তু কোনটাই অধিক অগ্রসর হইল না। বর মিলে ত ঘর মিলে না, ঘর মিলে ত পাত্র পছন্দ হয় না। যদি দুই মিলিল ত দর শুনিয়া পিছাইতে হইল।

এইরূপে দুই মাস কাটিল। জ্যোতিষ যেন একটু

হতাশ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সতীশের উদ্যম বাড়িয়া গেল; জ্যোতিষকে বসাইয়া রাখিয়া তিনি নিজেই ঘুরিতে লাগিলেন।

এই সময়ে আর একটা সুবিধা হইল। সতীশ জামাতার নিকট হইতে পত্র পাইলেন, শীঘ্রই তাহার কলেজে গ্রীষ্মের ছুটী হইবে, তখন সেও আসিয়া পড়িবে। তিনি জ্যোতিষকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—"অমল এলে অনেক সুবিধা হ'বে। তা'র বিস্তর আলাপী ছোকরা আছে, একটা যোগাড় করে দেবে এখন। তা'ছাড়া, বারাজী আমার ছুটাছুটি ঘোরাঘুরি কর্‌তে খুব মজবুৎ!"

(৪)

জ্যোতিষের বড় মেয়ে ঊষা দুদিনের মধ্যে বীণার সহিত খুব ভাব জমাইয়া লইয়াছে। দিবারাত্র সে দিদির কাছেই থাকে। দিনের বেলার আহারটা প্রায় নিজের বাড়ীতেই সারিয়া আসে, কিন্তু রাত্রে বীণার সহিত একত্র ভোজন ও শয়ন করে।

বীণার খোকাটীরও সকল ভার এখন প্রায় ঊষাই লইয়াছে। দু-মাসের শিশু এই নূতন লোকটীর নিকট মায়ের অপেক্ষা বেশী আদর পাইয়া ক্রমে তাহার প্রতি অধিক আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। নিতান্ত প্রয়োজন না বুঝিলে সে মাসীকে ছাড়িয়া মায়ের কোলে যাইতে চাহে না।

বীণা ঊষাকে মাঝে মাঝে স্মরণ করাইয়া দেয়, যে, বিবাহ হইলেই ত খোকাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, সুতরাং এত মায়া বাড়ানো ঠিক নয়। শুনিয়া ঊষা লজ্জায় কিছু বলিতে পারে না, কিন্তু মনের ভিতর একটা বেদনা অনুভব করে। সে বলে—"দেখ দিদি, তোমার যখন আর একটা খোকা হ'বে, তখন এটা আমাকে দিয়ে দিও,—কি বল?" বীণা বলে—"ততদিনে তোরও দুটো ছেলে হ'বে রে; তখন দিদির ছেলেকে ভুলে যাবি।" ঊষা বলে,—"বাঃ! তা' হ'বে কেন?" বীণা বলে—"কেন হ'বে তা বল্‌তে পারি না, কিন্তু হ'বে তা' জানি।" "বড্ড জানো!" বলিয়া ঊষা মুখ চোখ লাল করিয়া দিদিকে ঘুঁসি মারিয়া বা চিম্‌টি কাটিয়া এই তর্কের উপসংহার করিয়া দেয়।

ঊষা যেদিন শুনিল বীণার স্বামী অমল কাল আসিবে, সেদিন রাত্রের আহার সারিয়া সে নিজের বাড়ীতে শয়ন করিতে চলিল। বীণাকে বলিল—"কাল থেকে ত ভাই তোমার কাছে আর শুতে দেবে না; তা'র চাইতে আগে থেকে মানে মানেই যাই। একলা শোয়ার অভ্যাসটা আজ থেকেই করি।" বীণা হাসিয়া উত্তর করিল—"সে আর বেশী দিনের জন্য নয় গো! এই মাসেই—" ঊষা সলজ্জ ভ্রূকুটি করিয়া তাড়া দিয়া আসিল—"দাঁড়াও ত!" বীণা তাহার আস্ফালন দেখিয়া হাসিয়া গলাইল; ঊষাও খিড়্‌কি দ্বার দিয়া নিজের বাটীতে চলিয়া গেল।

শিশুকাল হইতে পশ্চিমে থাকিয়া ঊষার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা একটু স্বতন্ত্র ধরণের হইয়াছিল। অনেক বয়স পর্য্যন্ত সে "দিদি-বাবু" সাজিয়া ভৃত্যের সহিত ভাই-ভগিনীদের লইয়া কোম্পানীবাগানে বেশ হাওয়া খাইয়া বেড়াইয়াছে, বালিকা-সুলভ লজ্জা বা ভয়ের ধার ধারিত না। কিন্তু আজকাল কোথা হইতে একটা দুর্জ্জয় সঙ্কোচের ভাব আসিয়া তাহাকে নিতান্ত সন্ত্রস্ত করিয়া ফেলিয়াছে, অপরিচিত লোকের সম্মুখে বাহির হইতে কুণ্ঠিত হয়। তাই বীণার স্বামী আসিতেছে শুনিয়া প্রথমে তার মনটা একটু দমিয়া গিয়াছিল। তাহার আশঙ্কা হইল, দিদির সহিত তাহার যে মধুর অন্তরঙ্গ ভাব ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছিল, এই অপরিচিত লোকটী আসিয়া তাহাতে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু মায়ের কাছে যখন শুনিল যে ভগিনীপতির সম্মুখে লজ্জা করিতে নাই, তাহার সহিত নিঃসঙ্কোচে আলাপ করিতে, এমন কি, ঠাট্টা-তামাসাও করিতে হয়, বরং না করিলেই দোষ, তখন তাহার প্রাণে এক নূতন আনন্দ জাগিয়া উঠিল। জামাই-বাবুর সহিত কি কি কথা হইবে, কিরূপ তামাসা করিবে, তাহারই কল্পনা করিতে করিতে উৎসুক আগ্রহে তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

(৫)

পরদিন ভোরের ট্রেণে অমল আসিল। সামান্য বিশ্রাম করিয়া স্নান করিয়া লইল, বীণা চা আনিয়া দিল। তখন একটু বেলা হইয়াছে, বীণাও স্নান করিয়া এলোচুলে খোকাকে কোলে লইয়া অমলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এমন সময়ে খিড়্‌কিতে ঊষার গলার সাড়া পাইয়া বীণা তাড়াতাড়ি ছাদে গিয়া রৌদ্রে পিঠ দিয়া দাঁড়াইল।

ঊষার অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঘুম হয় নাই, ভোরবেলা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাই অমল আসিয়াছে তাহা জানিতে

পারে নাই। সে যে সকালে আসিবে তাহাও জানিত না। তাহারা আসিয়াছিল বৈকালে, তাই বোধ হয় ভাবিয়াছিল সকল ট্রেণ বৈকালেই আসে। উঠিতে বেলা হইয়াছে দেখিয়া ঊষা তাড়াতাড়ি এ-বাটীতে আসিয়া দেখিল বীণা ছাদে দাঁড়াইয়া খোকার মুখে অজস্র চুম্বন বৃষ্টি করিয়া তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিতেছে।

তাহার এই স্নেহের আতিশয্য দেখিয়া ঊষা বলিল—"ও! বড্ড আদর হচ্চে যে! আজ আবার সকাল বেলাই ছান্ করা হয়েচে,—বর আস্‌বে কি না, তাই!" এই বলিয়া বীণার পৃষ্ঠে একটা মৃদু কিল মারিয়া তাহার সারা পুলকাবিষ্ট দেহে আনন্দের হিল্লোল বহাইয়া দিল। বীণা কোন কথা কহিল না, একটু দুষ্ট হাসি হাসিয়া ঊষার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তাহাকে পরাজিত বুঝিয়া ঊষা বিজয়-গর্ব্বে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—"রোদে চুল শুকোতে এসেছ, ত কচি ছেলেটাকেও টেনে এনেচ কেন? বাছার মুখ-চোখ লাল হয়ে গেছে, দেখ দেখি! দাও, ছেলে আমাকে দাও।" উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে বীণার কোল হইতে খোকাকে কাড়িয়া লইয়া ঘরে ঢুকিল।

অমল তখন চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতেছিল; ঊষাকে ছেলে কোলে করিয়া আসিতে দেখিয়া, তাহাকে বীণা মনে করিয়া বলিয়া উঠিল—"পালিয়ে বেড়াচ্চ কেন? কাছে এস না।" পর মুহূর্ত্তে দুজনে চোখোচোখি হইতেই এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটিয়া গেল।

কতকটা বীণারই মত এই অপরিচিতা কিশোরীকে দেখিয়া, এবং তাহাকে কি কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছে ভাবিয়া, অমল লজ্জায় বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গেল। আর ঊষা,—সে ত জানিতই না যে ঘরের ভিতর কেহ আছে। সহসা একজন অপরিচিত লোককে দেখিয়া এবং তাহার এই আহ্বান শুনিয়া, লজ্জায় ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেল, এবং পর মুহূর্ত্তেই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া বীণার কাছে গিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—"দিদি, ঘরে ও কে?"

বীণা মুখ টিপিয়া হাসিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে উত্তর করিল—"কে তা কি করে বলি।"

ঊষা রাগিয়া উঠিল; বলিল—"তোমার ঘরে বসে রয়েছে, তুমি জান না কে! আমায় ধর্‌তে এসেছিল!"

ঊষা কাঁদিয়া ফেলিল। বীণা তখন সস্নেহে তাহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া বলিল—"এও বুঝ্‌তে পার্‌লি না, পাগ্‌লী মেয়ে! ওই ত তোর জামাই-বাবু। চল্, আলাপ-পরিচয় করিয়ে দি। তা তুই অত ভয় পেয়েচিস্ কেন? সত্যিই ধর্‌তে এসেছিল?"

দিদির কথায় ঊষার ভয় দূর হইল, বুকটা একটু হাল্কা হইল। কিন্তু শেষ প্রশ্নটায় সে একটু শঙ্কিত হইয়া উঠিল, অপরাধীর ন্যায় মিনতির সুরে কহিল—"না দিদি, মিথ্যে করে বলেছিলুম। আমার বড় ভয় পেয়েছিল কি না। জামাই বাবু এসেচেন তা ত জানি না। তুমিও ত বল নি সকালে আস্‌বেন,—তোমারই ত দোষ!"

বীণা নীরবে এই অপরাধ স্বীকার করিয়া লইল। আজ তাহার প্রাণ এক তীব্র সুখে ভরপুর,—শত অপবাদ, শত লাঞ্ছনাও আজ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না!

ঊষাকে ঘরে টানিয়া লইয়া গিয়া বীণা অমলের সহিত তাহার পরিচয় করিয়া দিল—"এইটী আমার ছোট বোন ঊষা। এরই বিয়ের জন্যে কাকাবাবু ছুটী নিয়ে এসেচেন।" খোকাকে তাহার মায়ের কোলে দিয়া ঊষা সলজ্জ চরণে অগ্রসর হইয়া অমলের পায়ের কাছে টিপ্ করিয়া একটা গড় করিল এবং ফিরিয়া গিয়া দিদির পশ্চাতে দাঁড়াইল।

অমল বলিল—"চোখের দেখাটাই বাকী ছিল, আর সব খবরই জানি। তা কর্ত্তারা দু-মাসেও কিছু পার্‌লেন না ত? যাক্, এখন আমি এসে পড়েছি,—এইবার বিয়ের ফুল ফুট্‌লো। এই মাসের মধ্যে যদি না হয় ত···"

বীণা কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—"ঢের হয়েচে, নিজের বাহাদুরী আর কর্‌তে হ'বে না। সেই আপনার কথাই ক' কাহন বলে,—তাই; দেখ না! একটা নতুন লোকের সঙ্গে পরিচয় হ'ল, কোথায় তা'র সঙ্গে দুটো কথা কইবে,—তা নয়···"

কথাটা আর শেষ হইল না। অমল হঠাৎ যেরূপ ভাল মানুষটীর মত,—বোধ হয় কি কথা কহিবে তাহাই খুঁজিবার জন্য,—ঘরের চারিদিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিতে লাগিল, তাহাতে দুজনেই হাসিয়া ফেলিল।

বীণা ঊষার গায়ে চিম্‌টি কাটিয়া একটু নিম্নস্বরে কহিল

—"তুই কিছু বল্ না। বল্‌বি বলে কথা মুখস্থ করে রেখেছিলি—দু-একটা এই বেলা বল্!" কিন্তু উষার মুখে কথা ফুটিল না। যাহাকে বলিবে তাহার সহিত যে ভাবে পরিচয় হইল, এবং গোড়াতেই যে প্রসঙ্গ উঠিল, তাহাতে তাহার মুখস্থ বুলি সব গুলাইয়া গেল,—একটাও মনে আসিল না।

(৬)

এইবার অমলের ঘোরাঘুরির পালা আরম্ভ হইল। সে স্থির হইয়া ঘরে বসিয়া থাকিতে পারে না, বিনা কাজে ঘুরিতেও বেশ আমোদ পায়। তাই বিবাহের পাত্র অন্বেষণের ভার যখন তাহার উপর পড়িল, তখন সে আন্তরিক আগ্রহের সহিতই এই কার্য্যে নিযুক্ত হইল।

ইতিমধ্যে সে কয়েকবার কলিকাতায় ঘুরিয়া আসিয়াছে। সেখানে যত পুরাতন সমপাঠি বন্ধু, বন্ধুর বন্ধু, তস্য বন্ধু, বিস্তর খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে। তাহাদের অনেকেরই বিবাহ হইয়া গিয়াছে। যাহাদের হয় নাই, তাহারা যতবড় উপাধীধারীই হউক না কেন, বিবাহ সম্বন্ধে এখনও নাবালক, মাতাপিতার একান্ত আজ্ঞাবর্ত্তী,—নিজেরা কোন কথাতেই নাই। অমল তাহাদের অভিভাবকদেরও ধরিতে ছাড়িল না। কিন্তু সে বড় কঠিন ঠাঁই,—বিশেষ কোন সুবিধা হইল না। তথাপি সে হাল ছাড়ে নাই, আজ আবার গিয়াছে,—রাত্রে ফিরিবে।

বৈকালে বীণা ও উষা পরস্পরের চুল বাঁধিয়া দিয়া পুকুরে গা ধুইতে গেল। কথায় কথায় অমলের প্রসঙ্গ উঠিল। তাহাকে লইয়া দু-বোনে অনেক আলোচনা করিয়াছে,—তথাপি অনেক কথা এখনও বাকী।

উষা বলিল—"আচ্ছা সত্যি করে বল ত দিদি, জামাই-বাবুকে খুব ভালবাস, নয়?"

বীণা হাসিয়া বলিল—"কেন বল্ দেখি?"

উষা। কেন আবার কি? বল না,—হাঁ কি না।

বীণা। তা' তুইই বল্‌না কেন!

উষা। আমি আবার কি বল্‌বো, বা রে! তুমি নিজের মুখে বল না।

বীণার মুখ হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া গেল, গাঢ়স্বরে বলিল—"তীর্থ করে এসে কেউ কাউকে বলেনা, জানিস? তেম্‌নি ও কথাও যে নিজের মুখে বল্‌বার নয়, বোন! তোরও যখন হ'বে, তখন বুঝ্‌বি।"

উষার মুখের উপর সন্ধ্যার অন্ধকার যেন বেশী করিয়া ঘনাইয়া আসিল। বীণা তাহা দেখিল। কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিল—"জামাই-বাবুকে তোর কি রকম লেগেচে বল্ দেখি।"

উষার মুখ আবার প্রফুল্ল হইল; সংক্ষেপে বলিল,—"বেশ,—খুব সুন্দর লোক!"

বীণা বলিল—"সুন্দর বল্‌চিস কি চেহারায়, না—?"

উষা প্রতিবাদ করিয়া বলিল—"তা' কেন, সব দিকেই বেশ।—আবার কি রকম আমুদে ভাই!"

অমল কবে কি একটা কৌতুক করিয়াছিল, তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া উষা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

বীণা হাসিয়া বলিল—"তা' হলে এক কাজ কর্ না কেন?"

কৌতূহলী দৃষ্টিতে চাহিয়া উষা বলিল—"কি?"

একটু দূরে সরিয়া গিয়া, বীণা দুষ্ট হাসি হাসিয়া বলিল—"তোর জামাই-বাবুকেই বিয়ে কর্ না!"

উষার মুখ লাল হইয়া উঠিল; বীণাকে কাছে না পাইয়া জল ছুঁড়িয়া মারিয়া বলিল—"যাঃ! তা বুঝি আবার হয়!"

বীণা বলিল—"খুব হয়,—ভগ্নিপতির সঙ্গে আর বিয়ে হয় না? আচ্ছা, তুই বল্ না,—হয় কি না দেখ্‌বি।"

একটু অভিমানের সুরে উষা বলিল—"হ্যাঁ, আমি বল্‌লেই!—আর তুমি—?"

মুখের হাসি কোথায় মিলাইয়া গেল, বীণা গাঢ় স্বরে উত্তর করিল—"আমি?—আমি তাও পারি। এই জল ছুঁয়ে বল্‌চি বোন্, হিন্দুর ঘরের মেয়ে হয়ে জন্মেছি, হাসিমুখে সব সইতে পারি,—কেবল স্বামীর অকল্যাণ ছাড়া।"

বীণার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। অপলক নেত্রে শূন্যে কোন অদৃশ্য মূর্ত্তির পানে চাহিয়া চাহিয়া তাহার নয়ন-পল্লব সিক্ত হইয়া আসিল। ধীরে ধীরে কাহাকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

চোখে-মুখে জল দিয়া বেশ করিয়া ধুইয়া ফেলিয়া যখন সে চাহিয়া দেখিল, তখন সে উষাকে দেখিতে পাইল না,—সে কখন নিঃশব্দে উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে।

ঘরে গিয়া কাপড় ছাড়িয়া উষাকে খুঁজিতে খুঁজিতে

তাহাদের বাড়ীতে গিয়া বীণা দেখিল, উষা মুখটী ভার করিয়া জানালায় বসিয়া আছে। বীণা কাছে বসিয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া দিতেছে দেখিয়া উষার মা' হেমাঙ্গিনী বলিলেন—"আজ আবার কি হ'ল উষার?"

বীণা বলিল—"কিছু নয়, কাকী মা; ওর জামাই-বাবুকে ভারি পছন্দ হয়েচে কি না,—তাই বল্‌ছিলাম তা'কেই না হয় বিয়ে কর্।"

হেমাঙ্গিনী হাসিয়া বলিলেন—"তুইও আচ্ছা পাগ্‌লী মেয়ে যা' হোক মা!"

বীণা প্রতিবাদ করিয়া বলিল—"কেন, অন্যায় এমন কি বলেচি, কাকী মা? তা' কি হয় না?—কথায় বলে 'বোন-সতীন',—একবার না হয় পরীক্ষা করেই দেখা যেত, কি-রকমটা দাঁড়ায়।"

হেমাঙ্গিনী বলিলেন—"তা, এও যে বড় বিদ্‌কুটে খেয়াল মা! না রে উষা, তোর দিদি তামাসা করে বলেচে। শালী-ভগ্নিপতিকে নিয়ে অমন কত ঠাট্টা-তামাসা করে, তা'র জন্যে কি রাগ কর্‌তে আছে, বোকা মেয়ে!"

(৭)

অমল কলিকাতায় একটা সম্বন্ধ ঠিক করিয়া আসিয়াছিল। কর্ত্তারা পরদিন দেনা-পাওনার কথা স্থির করিতে গেলেন। বরকর্ত্তার কিন্তু ধনুর্ভঙ্গ পণ,—ছয় হাজার টাকা নগদ দিতে হইবে, অলঙ্কার তিনি নিজে পছন্দমত একসময়ে গড়াইয়া লইবেন। জ্যোতিষ কন্যার বিবাহের জন্য দুই চারিখানি গহনা পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাও গ্রাহ্য হইল না—টাকা সব নগদ চাই। হাজার অনুনয়-বিনয়েও যখন বরকর্ত্তার মন গলিল না, তখন জ্যোতিষ অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া ভয়ে ভয়ে উপরিউক্ত সর্ত্তেই সম্মত হইলেন এবং সতীশকেও রাজী করাইলেন।

জ্যোতিষের কিন্তু এত টাকার যোগাড় ছিল না। এক সপ্তাহ পরে বিবাহের দিন, এই অল্প সময়ের মধ্যে কিরূপে টাকা সংগ্রহ হয়, ইহাই এখন বড় ভাবনার কথা হইয়া দাঁড়াইল।

সতীশের হাতে নগদ টাকা বেশী থাকিত না; যাহা কিছু ছিল আনিয়া জ্যোতিষের হাতে দিলেন। এইরূপে এ-দিক ও-দিক হইতে যাহা সংগ্রহ হইল তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত দেড় হাজার টাকার অকুলান রহিল। অনেক চেষ্টা করিয়াও টাকার কোন কিনারা হইল না। তখন জ্যোতিষকে মান-সম্ভ্রম বিসর্জ্জন দিয়া গ্রাম্য মহাজন এককড়ি নন্দীর শরণাপন্ন হইতে হইল। এককড়ি সহজে টাকা বাহির করিতে চায় না; বলে গ্রামস্থ জমীদারকে টাকা কর্জ্জ দিবে এতদূর স্পর্দ্ধা তাহার নাই, সে সামান্য তেজারতি করে, এত টাকা কোথায় পাইবে ইত্যাদি। অবশেষে সতীশের বিশেষ অনুরোধে কিছু সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া টাকা দিতে স্বীকৃত হইল। দলিল লেখাপড়া সেইদিনই হইয়া গেল, স্থির হইল পরদিন রেজিষ্টারী অফিসে যাইয়া টাকার আদান-প্রদান হইবে।

কিন্তু পরদিন এককড়ির আর দেখা নাই। বাড়ীতে খোঁজ লইয়া জানা গেল, কোন এক আত্মীয়ের কঠিন পীড়ার সংবাদ পাইয়া সে ভোরে উঠিয়াই বিষ্ণুপুর চলিয়া গিয়াছে, দুই দিন পরেই ফিরিবে। আশায় আশায় এই দুই দিন কাটিল, কিন্তু এককড়ি ফিরিল না বা তাহার কোন সংবাদ আসিল না।

ক্রমে বিবাহের দিন আসিয়া পড়িল। আর কোন উপায় না দেখিয়া সেদিন সকালেই অমলকে টাকার জন্য কলিকাতায় ছুটিতে হইল। কতকগুলি অলঙ্কার সঙ্গে লইয়া গেল, সেগুলি বন্ধক রাখিয়া আবশ্যক মত টাকা যোগাড় করিয়া আনিতে হইবে।

সারাদিন কলিকাতার নানা স্থানে ঘুরিয়া অমল দেখিল জিনিস বন্ধক রাখিয়া টাকা দিতে কেহই রাজী নয়,—বিক্রয় করিতে পারিলে হয়। কিন্তু এগুলি সতীশের পরলোকগতা পত্নীর অলঙ্কার। তাঁহার এই স্মৃতিচিহ্নগুলি বিক্রয় করিবার কল্পনা পূর্ব্বে কাহারও হয় নাই, অমলেরও সাহস হইল না। কাজেই টাকার আর যোগাড় হইল না, অমল হতাশ হইয়া সন্ধ্যার সময় ট্রেনে উঠিল।

এদিকে বর যথাসময়ে আসিয়াছে,—লগ্নও উপস্থিত। বরকে সম্প্রদানের জন্য লইয়া যাইবার অনুমতি চাহিলে, বরকর্ত্তা বিশ্বম্ভর চৌধুরী অমায়িক ভাবে হাসিয়া বলিলেন,—"তা'র আর কথা কি! তবে তাড়াতাড়ির কোন দরকার নেই;—বরং ততক্ষণ ও-দিকটা সেরে ফেল্লে হয় না? কি বলেন চক্কোত্তি মশায়?"

শিয়ালদহ পুলিশ-কোর্টের মোক্তার নৃসিংহ চক্রবর্ত্তী চৌধুরী-মহাশয়ের প্রধান পরামর্শদাতা। তিনি কোমরে চাদর জড়াইতে জড়াইতে বলিলেন—"হ্যাঁ, তা বটেই ত! টাকাকড়ির ব্যাপার একটু সময়-সাপেক্ষ; বাকীটা বরং পুরুত ঠাকুর আর মেয়েরা একটু হাত চালিয়ে সেরে নিতে পারেন।"

সতীশ যখন জানাইলেন যে সমস্ত টাকা এখনও সংগ্রহ হইয়া উঠে নাই, জামাই কলিকাতায় টাকার চেষ্টায় গিয়াছেন, ফিরিয়া আসিলেই সব টাকা দেওয়া যাইবে, তখন চক্রবর্ত্তী প্রবোধ দিয়া বলিলেন—"তা, বেশ ত, বেশ ত,—আসুক না। তাড়াতাড়ির কোন প্রয়োজন নেই,—অনেক রাত পর্য্যন্ত লগ্ন আছে। আর বরও একটু ক্লান্ত আছে, সেই বেলা তিনটের সময় বাড়ী থেকে রওনা হয়েচে, তা'র ওপর উপবাস, আর এই দারুণ গরম। বেচারি একটু বিশ্রাম করুক,—আপনারা বেশী ব্যস্ত হবেন না। আমি বলি ততক্ষণ বরং ইয়ে কর্‌লে হয় না? একটা কাজ এগিয়ে থাকে,—বরযাত্রদের কতক কতক বসিয়ে দিলে ——?"

"যে আজ্ঞে, তাই বন্দোবস্ত করে দি"—বলিয়া জ্যোতিষ অতি ব্যস্তভাবে চলিয়া গেলেন।

অমলের ফিরিতে এত বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া সকলের যেমন উদ্বেগ হইতেছিল, তেমনি আবার একটু আশাও হইতেছিল যে, যখন এত দেরী হইতেছে, নিশ্চয়ই টাকার একটা যোগাড় করিয়া আসিবে। কিন্তু অমল যখন আসিল তখন সকল আশার অবসান হইল এবং উদ্বেগ শতগুণ বাড়িয়া গেল।

জ্যোতিষ তখন চৌধুরী মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলেন। কিন্তু তিনি টাকা কিছুতেই বাকী রাখিতে প্রস্তুত নহেন। জ্যোতিষ অগত্যা হ্যাণ্ডনোট পর্য্যন্ত লিখিয়া দিতে চাহিলেন। কিন্তু চক্রবর্ত্তী জনান্তিকে বুঝাইয়া দিলেন যে হ্যাণ্ড্‌নোট আইনে না টিঁকিতে পারে,—বিপদে ফেলিয়া ভয় দেখাইয়া লিখাইয়া লইয়াছে বলিলে আদালতে অগ্রাহ্য হইতে পারে।

তখন সতীশ একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিতে আসিলেন। অমল যে অলঙ্কারগুলি লইয়া গিয়াছিল তাহাই জামিন রাখিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য এক সপ্তাহের সময় চাহিলেন। চৌধুরী-মহাশয় এ প্রস্তাবে যেন একটু নরম হইলেন, কিন্তু চক্রবর্ত্তীর পরামর্শ না লইয়া কিছু বলিতে পারিলেন না। চক্রবর্ত্তীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া এ-কথা বলিতেই তিনি চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"আরে না না! এমন কাজও করবেন না। কা'র জিনিস তা'র ঠিক নেই, নিয়ে শেষে বিপদে পড়্‌বেন? মনে করুন যদি চোরাই মালই হয়!"

দূর হইতে চক্রবর্ত্তীর কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছিল। শেষের কথাটা শুনিয়া সতীশ রুখিয়া আসিলেন, বরযাত্রীরা হৈ হৈ করিয়া ছুটিয়া আসিল,—মুহূর্ত্ত-মধ্যে দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার বাধিয়া গেল। এই গোলযোগের ভিতর চৌধুরী-মহাশয়, বর তুলিয়া লইয়া বাহিরে আসিলেন। যে গাড়ীতে বর আসিয়াছিল, দূরদর্শী চক্রবর্ত্তী পূর্ব্ব হইতেই তাহা আট্‌কাইয়া রাখিয়াছিলেন,—বরকে তুলিয়া লইয়া গাড়ী তৎক্ষণাৎ ছুটিল।

(৯)

ব্যাপার দেখিয়া জ্যোতিষ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

সতীশ মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে বাটীর ভিতর গিয়া "মা মা" বলিয়া চীৎকার করিয়া দালানে একটা তক্তপোষের উপর শুইয়া পড়িলেন। বীণা ছুটিয়া আসিল। পিতার বিকৃত কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে বড় ভয় পাইল, তাড়াতাড়ি একখানা পাখা আনিয়া মাথায় বাতাস করিতে লাগিল।

বাহিরে এইমাত্র যে কাণ্ডটা ঘটিয়া গিয়াছে তাহা কাহারও জানিতে বাকী ছিল না; সুতরাং বীণা ম্লানমুখে নীরবে পিতার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহিল।

একটু প্রকৃতিস্থ হইলে সতীশ বলিলেন—"তুই বল্ মা, এখন কি উপায় করা যায়,—আমার বুদ্ধিতে ত আর কুলায় না। আর এ বিভ্রাট ত আমার বুদ্ধির দোষেই ঘটেচে। জ্যোতিষ আমার ওপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত ছিল, এখন কি করি! এ দায় ত জ্যোতিষের নয়,—আমার!"

বীণা পিতার কেশ-বিরল মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—"এ সময়ে এত অধৈর্য্য হ'লে চল্‌বে কেন, বাবা! অন্য কোন পাত্র যোগাড় করে শুভকার্য্য সেরে নিতে হবে,—অন্য উপায় কি আছে?"

সতীশ হতাশভাবে উত্তর করিলেন—"সে উপায়ও ত দেখ্‌চি না। লগ্ন আর বেশীক্ষণ নেই, আর তেমন পাত্রই বা কই?"

বীণা বলিল—"কেন; এত বড় গ্রামে এমন একটাও পাত্র খুঁজ্‌লে পাওয়া যায় না? ভাল নাই বা হ'ল।"

ক্ষণেক চিন্তা করিয়া সতীশ ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন—"কই, তেমন কাউকেই ত দেখ্‌চি না।"

পিতার মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া বীণা কহিল—"ঠিক বল্‌চো বাবা? ভাল করে ভেবে দেখ দেখি কেউ আছে কি না। হয় ত এইখানেই কেউ আছে—"

কন্যার তীব্র দৃষ্টির সম্মুখ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া সতীশ গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন; ধীরে ধীরে বলিলেন—"হুঁ, কিন্তু তা' হয় না মা, তা' হয় না।"

বীণা উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—"কেন হ'বে না বাবা! যে একবার কন্যাদায় থেকে তোমাকে উদ্ধার করেচে, এবারও সেই কর্‌বে,—এ যে তা'র চেয়েও বড় দায়, বাবা! আচ্ছা, তুমি এখন একটু চুপ করে শুয়ে থাক দেখি,—আমি এখনি আস্‌চি।"

এই বলিয়া বীণা বিদ্যুৎ-বেগে বাহির হইয়া গেল, পিতাকে একটী কথা বলিবারও অবকাশ দিল না।

বাহির-বাটীতে জ্যোতিষ তখনও তেমনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছেন; অমল কোমরে গামছা জড়াইতে জড়াইতে আস্ফালন করিয়া বলিতেছে—"আপনারা হুকুম দেন ত এখনও গিয়ে বরকে ধরে আন্‌তে পারি। ভোর তিনটার আগে আর ট্রেন নেই,—যা'বে কোথা!"

বীণা দরজার নিকট হইতে অমলকে ডাকিল, এবং চেলীর জোড় তাহার হাতে দিয়া মৃদুস্বরে বলিল—"পরো।"

অমল বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গেল; রুদ্ধস্বরে বলিল—"পর্‌বো!—আমি!—কেন?"

বীণা অবিচলিত কণ্ঠে উত্তর করিল—"আমি বল্‌চি—তাই।"

এইবার অমল বীণার উদ্দেশ্য বুঝিল। অন্য সময়ে হইলে কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিত, কিন্তু সে চাহিয়া দেখিল বীণার প্রশান্ত মুখমণ্ডল এক স্বর্গীয় আলোকে উদ্ভাসিত, নয়নে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ! এত দিন যাহাকে সরলা মুগ্ধা বালিকা-রূপে দেখিয়া আসিয়াছে, আজ তাহার এই মহিমময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া, তাহার আদেশ অমান্য করিবার শক্তি রহিল না। নির্ব্বাক-বিস্ময়ে চেলীর জোড় হাতে লইয়া অমল মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বীণার অনুবর্ত্তী হইল।

জ্যোতিষের স্ত্রী হেমাঙ্গিনী বাহিরে হাঁকাহাঁকি শুনিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। অনেকক্ষণ পরে, জ্ঞান-সঞ্চার হইলেও, নিশ্চল হইয়া পড়িয়া রহিলেন। সহসা শঙ্খধ্বনি শুনিয়া তিনি চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ছুটিতে ছুটিতে একেবারে বাহির-বাটীতে আসিয়া পড়িলেন। দেখিলেন কন্যা-সম্প্রদান হইতেছে,—বীণা স্বহস্তে অমল এবং উষার সংযুক্ত করে ফুলের মালা জড়াইয়া দিতেছে! উপস্থিত সকলেরই মুখ বিষণ্ণ, চক্ষু বাষ্পপূর্ণ। কেবল একজনের চোখে-মুখে এক স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে,—যে অকাতরে সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিতে পারে,—স্বামীর অকল্যাণ ছাড়া যে আর সব সহিতে পারে!

হেমাঙ্গিনী কাঁদিয়া ফেলিলেন। আর্ত্তনাদ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"বীণা, এ কি কর্‌লি মা?—শেষে এই হ'ল?"

অমলের পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া বীণা উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার বিজয়োৎফুল্ল বদনে মধুর হাসির রেখা ফুটাইয়া বলিল—"কেন কাকীমা, এ মন্দ কি হ'ল? উষাকে সতীন কর্‌বো বলেছিলুম,—মনে নেই? আজ সেই কথাই ফলে গেল বই ত নয়!"

হেমাঙ্গিনী বলিলেন—"তা বলে একটা মুখের কথার জন্যে—"

বীণা বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—"মানুষের সব কথাই মুখ দিয়ে বা'র হয়, কাকীমা। তা'র মধ্যে কোন্‌টা যে অন্তরের কথা তা' কেবল অন্তর্যামীই জানেন, আর এই রকম করেই বুঝিয়ে দেন!"

আবার মুহুর্মুহুঃ শঙ্খধ্বনি হইল। তাহা সেই নিথর নিশ্চল বায়ুস্তরে মিশিয়া নীরব হইলেও একটী অবলা পল্লীবালার এই বিজয়-বার্ত্তা যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিল!

卐

জৈনশাস্ত্রে জড় ও জীব

শ্রীপূরণচাঁদ সামসুখা

(পৃথ্বীকায়)

জৈনশাস্ত্রের বহু তথ্য সাধারণ্যে তেমন প্রচলিত নহে। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণের চিন্তার প্রচুর উপাদানে জৈনশাস্ত্র পরিপূর্ণ। বিজ্ঞানবিদ্‌গণের চিন্তাধারার বর্ত্তমান প্রগতিতে উহার আলোচনা কোন কোন বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিতে পারে, এ জন্য এ প্রয়াস বঙ্গভাষায় অভিনব হইলেও, বৈজ্ঞানিকগণের স্বাভাবিক দৃষ্টি ইহাতে আকৃষ্ট হইবে ইহা ভরসা করা যায়।

জৈনশাস্ত্রে মৃত্তিকা, জল, অগ্নি, বায়ু—যাহাকে সাধারণতঃ জড় বলা হয়—এবং উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে বলিয়া উল্লেখ আছে; অর্থাৎ ঐ সমুদায়ের কোনটীই প্রকৃতপক্ষে জড় নয়, উহার প্রত্যেকটী জীব-সংজ্ঞার অন্তর্গত। মৃত্তিকাকে পৃথ্বীকায়, জলকে অপকায়, বায়ুকে বায়ুকায়, অগ্নিকে তেজস্কায় ও উদ্ভিদ্‌কে—বনস্পতিকায় এইরূপ সাধারণ নাম দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে উল্লিখিত পৃথ্বীকায়ের বিশদ্ বিবরণ প্রদত্ত হইবে। অবশ্য বলা আবশ্যক যে, পৃথ্বীকায় বলিলে কেবলমাত্র মৃত্তিকাই বুঝায় না, প্রস্তর, বালুকা, ধাতু প্রভৃতি যদ্দ্বারা পৃথিবীর, দেহখানি গঠিত—তৎসমস্তই উহার অন্তর্গত বুঝিতে হইবে।

পৃথ্বীকায় প্রধানতঃ দুই প্রকারে বিভক্ত। "সূক্ষ্ম" ও "বাদর"। 'সূক্ষ্ম' তাহাদিগকে বলা যায় যাহারা আমাদের ইন্দ্রিয়গোচরের বহির্ভূত; আর 'বাদর' তাহারা যাহারা ইন্দ্রিয়গোচরের বিষয়ীভূত। অর্থাৎ 'সূক্ষ্ম' পৃথ্বীকায় আমরা দর্শন বা স্পর্শ করিতে পারি না, আর 'বাদরকে' দেখিয়া বা স্পর্শ করিয়া তাহার সত্তা অনুভব করিতে পারি। সূক্ষ্ম পৃথ্বীকায় সম্পূর্ণ লোকে * সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে। অর্থাৎ সূক্ষ্ম পৃথ্বীকায় জীব কেবলমাত্র এই ধরণীতেই যে আছে তাহা নহে; পরন্তু সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছে।

বাদর পৃথ্বীকায় সংক্ষেপে দুই প্রকারের—"শ্লক্ষ্ণ" অর্থাৎ মসৃণ ও "খর" অর্থাৎ কঠোর। 'মসৃণ' পৃথ্বীকায় কাল, নীল, লাল, পীত ও শ্বেত এই পঞ্চ মূলবর্ণের †। 'খর' পৃথ্বীকায় অর্থাৎ ক্ষিতি মোটামুটী ছত্রিশ প্রকারের, যথা:—(১) পৃথিবী—মৃত্তিকা; (২) শর্করা—কাঁকর; (৩) বালুকা; (৪) উপল: (৫) শিলা; (৬) লবণ; (৭) ঊষ—ক্ষারভূমি; (৮) অয়ঃ; (৯) তাম্র (১০) রাং; (১১) সীসক; (১২) রৌপ্য; (১৩) সুবর্ণ; (১৪) বজ্র; (১৫) হরিতাল; (১৬) হিঙ্গুল; (১৭) মনঃশিলা; (১৮) পারদ; (১৯) অঞ্জন; (২০) প্রবাল; (২১) অভ্র; (২২) অভ্রবালুকা; (২৩) গোমেদক; (২৪) রুচক; (২৫) অঙ্ক; (২৬) স্ফটিক; (২৭) লোহিতাক্ষ; (২৮) মরকত; (২৯) মসারগল্ল; (৩০) ভূজমোচক; (৩১) ইন্দ্রনীল; (৩২) হংসক; (৩৩) চন্দ্রপ্রভ; (৩৪) বৈদূর্য্য; (৩৫) জলকান্ত; (৩৬) সূর্য্যকান্ত। যদিও ৩৬ প্রকারের বিভাগ বলা হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিভাগ অসংখ্য—বিচিত্রপ্রকারের মৃত্তিকা, প্রস্তর, ধাতু, রত্ন প্রভৃতির সংমিশ্রণে যাহা যাহা উৎপন্ন হয় তৎসমুদয়ই ইহার অন্তর্ভুক্ত। তদ্ভিন্ন বর্ণ, গন্ধ, রস, স্পর্শভেদেও আবার অনেক বিভাগ হয়; একই বর্ণাদির তারতম্য অনুসারে ও বর্ণাদির পরস্পর মিশ্রণেও অনেক প্রকার ভেদ হইতে পারে।

* আকাশের যে অংশে জীবগণের বসতি তাহাকে 'লোক' ও যে অংশে আকাশ ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ নাই তাহাকে 'অলোক' বলে।

† এই প্রবন্ধ "আচারাঙ্গ নিয়ুক্তি" অবলম্বনে লিখিত। 'প্রজ্ঞাপনা' ও 'জীবাভিগম' সূত্র মতে মসৃণ পৃথ্বীকায় সাত প্রকারের—উপরোক্ত পাঁচ প্রকার ব্যতীত 'পাণ্ডুর' ও 'পণক' আরও এই দুই প্রকার নির্দ্দিষ্ট আছে।

উভয় প্রকারের পৃথ্বীকায় 'পর্য্যাপ্ত' ও অপর্য্যাপ্ত' ভেদে দ্বিবিধ। এস্থলে 'পর্য্যাপ্ত' ও 'অপর্য্যাপ্ত' শব্দ দুইটী বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। পর্য্যাপ্তি ছয় প্রকারের:—আহার, শরীর, ইন্দ্রিয়, শ্বাসোশ্বাস, বচন ও মন।

কোনও জীব এক শরীর ত্যাগ করিয়া অন্য শরীরে উৎপন্ন হইবামাত্র যে বিশেষ শক্তি দ্বারা আহারাদির উপযুক্ত দ্রব্য গ্রহণ করিয়া শরীর ও ইন্দ্রিয়াদিতে পরিণত করে তাহাকে 'পর্য্যাপ্তি' কহে; অর্থাৎ জীব উৎপন্ন হইবামাত্র আহারের উপযুক্ত দ্রব্য গ্রহণ করিয়া যে শক্তি দ্বারা তাহাকে রসে পরিণত করে তাহাকে আহার-পর্য্যাপ্তি, যে শক্তি দ্বারা জীব ও ঐ রসকে সপ্তধাতুতে পরিণত করে তাহাকে শরীর-পর্য্যাপ্তি কহে, ইত্যাদি। যে সকল জীবের এইরূপে 'পর্য্যাপ্তি' পূর্ণ হয় তাহাদিগকে 'পর্য্যাপ্ত' ও যাহাদের পূর্ণ হয় না—পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই মৃত্যু হয়—তাহাদিগকে 'অপর্য্যাপ্ত' কহে। একেন্দ্রিয় জীবের ছয় পর্য্যাপ্তির মধ্যে মাত্র আহার, শরীর, ইন্দ্রিয় ও শ্বাসোশ্বাস এই চারি পর্য্যাপ্তি হয়, বাকী দুইটী—বচন ও মন পর্য্যাপ্তি হয় না অর্থাৎ ইহাদের বচন ও মন নাই। ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কেবলমাত্র স্পর্শেন্দ্রিয় আছে, অন্য ইন্দ্রিয় নাই। সূক্ষ্ম ও বাদর পৃথ্বীকায়ের যত প্রকারের বিভাগ হয়, প্রত্যেক বিভাগে পর্য্যাপ্ত ও অপর্য্যাপ্ত উভয় প্রকারের জীব হয়। বলা আবশ্যক যে, যে পর্য্যায়ের জীবের যে কয়টী পর্য্যাপ্তি হইবে পর্য্যাপ্তি পূর্ণ হইলেও সে কয়টীর বেশী পর্য্যাপ্তি পূর্ণ হয় না, যেমন—পৃথ্বীকায় জীবের আহারাদি প্রথম চারিটী পর্য্যাপ্তি ছাড়া কখনও পাঁচটী হইবে না, এক স্পর্শেন্দ্রিয় ব্যতীত কখনও দুইটী ইন্দ্রিয় হইবে না।

বাদর পৃথ্বীকায় যদিও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথাপি একটী, দুইটী বা সংখ্যা দ্বারা ব্যক্ত করা যায় এরূপ সংখ্যেয় পৃথ্বীকায় একত্র হইয়া থাকিলেও উহা সাধারণতঃ আমাদের দৃষ্টি-শক্তির মধ্যে আসে না—তাহারা এতই ক্ষুদ্র; ঐরূপ অসংখ্য জীব একত্র হইলে তবেই তাহাদের সমষ্টি আমাদের ইন্দ্রিয়গোচরের বিষয়ীভূত হয় এবং তখনই, তাহারা মৃত্তিকা, বালুকা ইত্যাদি রূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। ইহাদের আকৃতি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে ইহাদের শরীর দেখিতে মসুর বা চন্দ্রের ন্যায় †।

বাদর পৃথ্বীকায়ও কত ক্ষুদ্র তাহা একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান হইয়াছে—যদি পূর্ণযৌবনা, সুস্থকায়া, বলশালিনী কোন স্ত্রীলোক আমলকী পরিমিত মৃত্তিকা লইয়া শিলায় একুশবার পেষণ করে তবে কতক পৃথ্বীকায় জীব মরণ প্রাপ্ত হইবে, কতক কেবল বেদনা প্রাপ্ত হইবে, আবার কতক কোন আঘাত প্রাপ্ত হইবে না—তাহাদের অঙ্গে শিলার স্পর্শ পর্য্যন্ত লাগিবে না।

আর সূক্ষ্ম পৃথ্বীকায় জীব এত ক্ষুদ্র যে তাহাদের অসংখ্য জীব একত্র হইয়া থাকিলেও কখনও তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে পৃথ্বীকায়িক জীবের কেবল মাত্র স্পর্শেন্দ্রিয় আছে। এ বিষয়ে একটু বিশদ্‌ভাবে বলা যাইতেছে। জৈনশাস্ত্রে সংসারী জীবসমূহকে একেন্দ্রিয়, দ্বিন্দ্রিয়, ত্রিরিন্দ্রিয়, চতুরিন্দ্রিয় ও পঞ্চেন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়ের কমবেশী অনুসারে মোটামুটী পাঁচভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। অর্থাৎ যাহাদের কেবলমাত্র স্পর্শেন্দ্রিয় আছে তাহারা একেন্দ্রিয়, যাহাদের স্পর্শ ও রসেন্দ্রিয় আছে তাহারা দ্বিন্দ্রিয়, যাহাদের স্পর্শ, রস ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় আছে তাহারা ত্রিরিন্দ্রিয়, যাহাদের স্পর্শ, রস, ঘ্রাণ ও দর্শনেন্দ্রিয় আছে তাহারা চতুরিন্দ্রিয় এবং যাহাদের স্পর্শ, রস, ঘ্রাণ, দর্শন ও শ্রোত্রেন্দ্রিয় আছে তাহারা পঞ্চেন্দ্রিয়। পৃথ্বীকায়াদি উপরে যে পাঁচপ্রকারের জীবের কথা বলা হইল ইহারা একেন্দ্রিয় পর্য্যায়ভুক্ত অর্থাৎ ইহাদের মাত্র এক ইন্দ্রিয়—স্পর্শেন্দ্রিয় আছে।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে পৃথ্বীকায় জীবের শ্বাসোশ্বাস পর্য্যাপ্তি হয়—ইহা দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে এই শ্রেণীর জীব নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস পরিত্যাগ ও গ্রহণ করে। এক স্থলে

† জীবাভিগম সূত্র—১ম প্রতিপত্তি—"মসূরচন্দ সংঠিয়া পন্নত্তা"।

ভগবান মহাবীর তাঁহার শিষ্য প্রথম গণধর ইন্দ্রভূতি গৌতমকে বলিতেছেন যে "হে গৌতম, পৃথ্বীকায় জীব সতত নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস পরিত্যাগ ও গ্রহণ করে"।

যেরূপ অব্যক্ত চৈতন্য, মূর্চ্ছাপন্ন কোন মানুষের উপয়োগ, অনুভবাদি শক্তি অব্যক্তরূপে থাকে, তদ্রূপ পৃথ্বীকায় জীবের উপয়োগাদিও অব্যক্তরূপে থাকে। ইহাদিগকে কোনও প্রকার আঘাত করিলে ইহারা বেদনা অনুভব করে—যদিও ঐ অনুভূতি অন্যান্য উচ্চতর পর্য্যায়ের জীবগণের তুলনায় অতি অল্পতর। ইহার আহার, ভয়, মৈথুন ও পরিগ্রহ এই চারি প্রকারের সংজ্ঞা বলা হইয়াছে অর্থাৎ ইহারা আহারাদির বেদনা অনুভব করিয়া থাকে। এই অনুভূতিও অতি সূক্ষ্ম। ইহাদের মন নাই ও ইহারা নিকৃষ্টতম পর্য্যায়ের জীবশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ইহাদের অনুভূতিও অতি সামান্য।

ইহাদের মধ্যে স্ত্রী বা পুং যোনি নাই। সমস্তই নপুংসক যোনি। ইহারা গর্ভজ নয় অর্থাৎ ইহাদের উৎপত্তি শরীরাংশ হইতে হয়।

সূক্ষ্ম পৃথ্বীকায় জীবের অল্পতম ও উচ্চতম—যাহা জৈন-সাহিত্যে যথাক্রমে 'জঘন্য' ও 'উৎকৃষ্ট' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত হয়—আয়ু অন্তর্মুহূর্ত্তকাল অর্থাৎ এক মুহূর্ত্তের (৪৮ মিনিটের) মধ্যেই তাহাদের আয়ু শেষ হয়।

বাদর পৃথ্বীকায় জীবের অল্পতম (Minimum) আয়ু অন্তর্মুহূর্ত্তকাল অর্থাৎ এক মুহূর্ত্ত সময়ের মধ্যে যে কোন সময় এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট (Maximum) আয়ু এইরূপ :—

শ্লক্ষ্ম পৃথ্বীকায়ের—এক সহস্র বৎসর।

খর পৃথ্বীকায়ের—বাইশ সহস্র বৎসর।

খর পৃথ্বীকায়ের মধ্যে আবার ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন 'উৎকৃষ্ট' আয়ু কথিত হইয়াছে—যেমন বালুকার ১৪০০০ বৎসর, শর্করার—১৮০০০ বৎসর ইত্যাদি। এই যে 'সর্ব্বোৎকৃষ্ট' আয়ুর পরিমাণ কথিত হইল ইহা দ্বারা এরূপ অনুমান করা উচিত নহে যে, ঐ বিভাগের সমস্ত পৃথ্বীকায় জীব ঐরূপ সময় পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। যদি কোন পৃথ্বীকায় জীব পৃথ্বীকায় যোনিতে উৎপন্ন হইয়া সেই জন্মে স্বকর্ম্মবশতঃ সর্ব্বোৎকৃষ্ট আয়ু ভোগ করে তবে উপরে লিখিত উচ্চতম সময় পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারে মাত্র ইহাই বুঝায়—যদি সর্ব্বোৎকৃষ্ট আয়ু ভোগ না করে তবে অল্পতম আয়ু অর্থাৎ অন্তর্মুহূর্ত্তকাল হইতে উচ্চতম পরিমাণ আয়ুর সময়ের মধ্যে যে কোন সময় পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। স্থানভেদেও আয়ুর কম বেশী হয়।

প্রাচীন ও পরবর্ত্তী হিন্দুশাস্ত্রে এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-শাস্ত্রের আধুনিক যুগে মৃত্তিকা, প্রস্তরাদির প্রাণ আছে এরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছে। কোন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক উপরিলিখিত বিষয়ের সহিত আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্যের তুলনামূলক কোন সমালোচনা করিলে আরও উত্তম হয়।

চাঁদ্‌নি রাতের জুঁই

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

আমি চাঁদ্‌নি রাতের জুঁই,
আমি দুলন-দেওয়া ঢেউ-জাগানো
হাঁওয়ার দোলায় শুই!
আমি চাঁদ্‌নি রাতের জুঁই।
আমি চোখ-জুড়ানো চাঁদের সুধায়
আঁখিটি মোর ধুই।
আমি চাঁদ্‌নি রাতের জুঁই।

আমি ভুবন-ভরা চাঁদের হাসি
এই বুকেতে থুই।
আমি চাঁদনি রাতের জুঁই।

আমি রূপোয় গলা একটি ফোঁটা
শিশির-ভারে নুই।
আমি চাঁদ্‌নি রাতের জুঁই।

ছায়ার মায়া

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(চিত্র-নাট্য)

চলচ্চিত্রে স্বরোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে চিত্র-নাট্যের পদ্ধতিও পরিবর্ত্তিত হ'য়েছে। মূক-চিত্রের জন্য যেভাবে চিত্রের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা প্রয়োজন ছিল, মুখর-চিত্রের কাজে তা অনেকখানি বদলে গেছে। তখন যা ছিল শুধু ছবি এখন কথা এসে তাকে ক'রে তুলেছে চিত্র-নাট্য। একেবারে রঙ্গালয়ে অভিনয়ের জন্য রচিত নাটক না হ'লেও মুখর ছবির জন্য 'নাটক'ই লেখানো হ'চ্ছে। 'Dialogue' অর্থাৎ বাক্‌চাতুর্য্য বেশ চিত্তাকর্ষক না থাকলে মুখর ছবি জনপ্রিয় হওয়া কঠিন। অনেক সময় নৃত্যগীতের প্রাচুর্য্যের দ্বারা বাক্‌চাতুর্য্যের অভাব পূরণ করা হয় বটে কিন্তু, সে ছবি তত বেশী জমেনা যতটা জমাট বাঁধে কথার মার-প্যাঁচের কায়দায়।

'চিত্র-নাট্য' সম্বন্ধে আলোচনা করবার পূর্ব্বে চলচ্চিত্র কত বিভিন্ন প্রকারের হ'তে পারে সে বিষয়ে কিছু বলা দরকার। মোটামুটি দেখা যায় চলচ্চিত্রকে বারোটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ক'রে ফেলা যেতে পারে, যেমন—

প্রথম—নিছক্ ছবি! (Abstract or Absolute Film.) অর্থাৎ কোনো গল্প বা ঘটনার সাহায্য না নিয়ে কেবলমাত্র গতিছন্দ, বর্ণ বৈচিত্র্য, রূপান্তর, সৌন্দর্য্যাভিব্যক্তি, নিসর্গদৃশ্য, কাল্পনিক মায়া ইত্যাদি সৃষ্টি ক'রে দর্শকের মনোরঞ্জন করা ও তাদের চিত্তকে নাড়া দেওয়া, যেমন 'Filmstudie' 'Light & Shade' ইত্যাদি চিত্র।

দ্বিতীয়—কাব্য-চিত্র (Cine-Poem or Ballad Film) অর্থাৎ কোনো প্রসিদ্ধ গাথা, কবিতা বা গানকে চিত্রে মূর্ত্ত ক'রে তোলা বা রূপ দেওয়া। যেমন La Marseilloise, Ænoch-Arden ইত্যাদি—

তৃতীয়—নাট্য-চিত্র (Cine-Drama or Play Film) অর্থাৎ চিত্রের পর চিত্র সাজিয়ে নৃত্যগীত ও বাদ্য সহযোগে ছবির ভিতর দিয়ে একটি অখনও নাট্যরসকে জীবন্ত ক'রে তোলা। যেমন Rio-Rita, Love-Parade' 'Piccadily' 'Broadway' ইত্যাদি—

চতুর্থ—কথা-চিত্র (Cine-Fiction or Story Film) অর্থাৎ প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের রচিত বা বিশেষভাবে চিত্রের জন্য লেখানো কোনো গল্প বা উপন্যাস অবলম্বনে তার প্রতিপাদ্য বিষয়টি চিত্রের সাহায্য ফুটিয়ে তোলা। যেমন 'Uncle Tom's Cabin 'Scarlet Letter' 'Romola' ইত্যাদি—

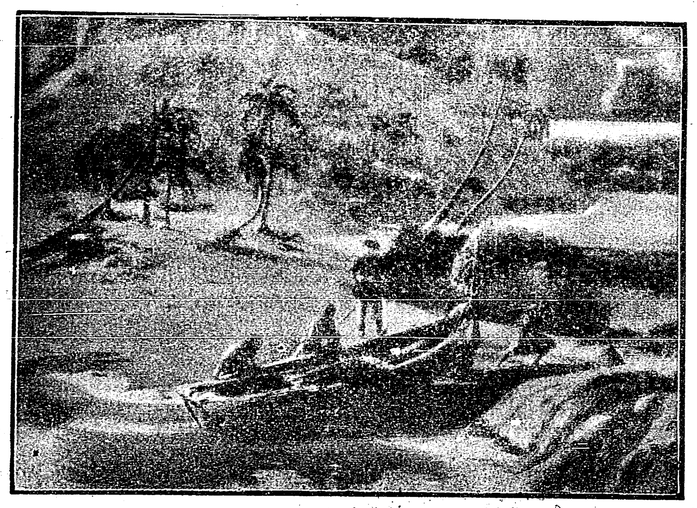

উপ-চিত্র ('The Black Pirate' ছবিতে চিত্রগড়ে তৈরী মরুদ্বীপের সকল দৃশ্য, তরুলতা পর্ব্বত ও সমুদ্র সমস্তই Studio Set)

পঞ্চম—রসচিত্র (Cine- Farce or Comic Film) অর্থাৎ চিত্রের সাহায্যে নানা অদ্ভুত ঘটনার সমাবেশ ক'রে হাস্যরস সৃষ্টি করা। যেমন—Charlie Chaplin, Harold Lloyd, Buster Keaton এর ছবি।

ষষ্ঠ—উপ-চিত্র (Fantasy Film) অর্থাৎ ছবিতে কোনো আজগুবি গল্প বা আষাঢ়ে কাহিনী ও ঠাকুমা'র রূপকথাকে রূপ দেওয়া। যেমন—'Trip to the Moon' Thief of Bagdad' ইত্যাদি—

সপ্তম—কৌতুক চিত্র (-Cartoon Film) অর্থাৎ শিল্পীর আঁকা কৌতুকাঙ্কনকে সজীব করে তোলা। যেমন 'Felix the Cat' 'Mickey Mouse'—

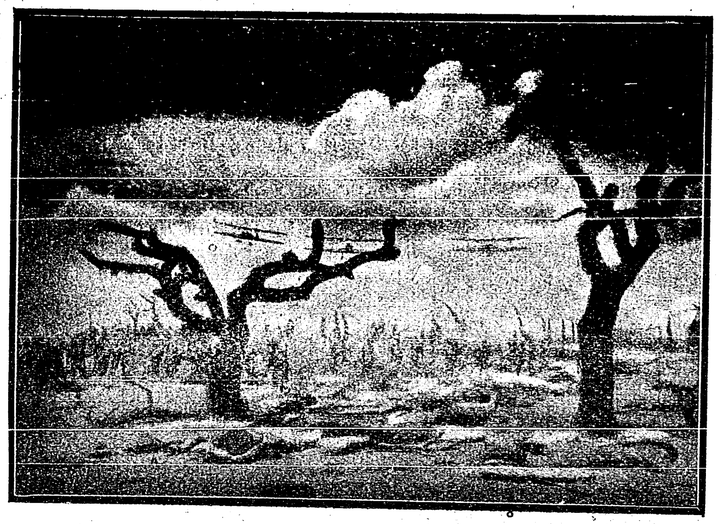

বিরাট-চিত্র ('Wings' ছবিতে চিত্রগড়ে তৈরী রণক্ষেত্রের নকল দৃশ্য ; হতাহত মৃত ব্যক্তিগণ ও দগ্ধ পাদপগুলি নকল)

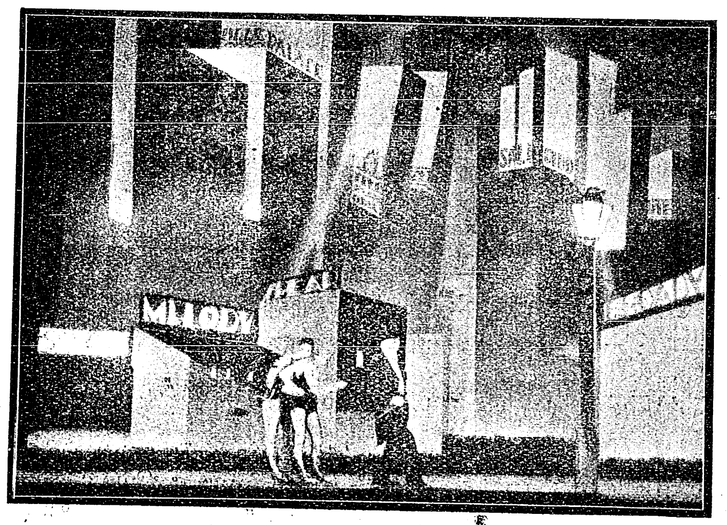

নাট্য-চিত্র (The Broadway Melody' ছবিতে চিত্রগড়ে তৈরী রঙ্গমঞ্চের একটি দৃশ্য। এই দৃশ্যপটের গায়ে সঙ্গীতের স্বরলিপি এঁকে সুরের আবেষ্টন সৃষ্টি করা হ'য়েছে।)

অষ্টম—ঐতিহাসিক চিত্র (Cine-classic or Epic Film) অর্থাৎ কোনো ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক বিরাট চরিত্রের সুবৃহৎ ছবি। যেমন—'King of Kings' 'Napoleon' ইত্যাদি—

নবম—শিক্ষা-চিত্র (Scientific, Cultural & Sociological Film) অর্থাৎ কোনো বিষয়ের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, তার শিক্ষার দিক এবং সমাজতত্ত্ব মূলক ছবি। যেমন The Birth of the Hours, The mechanics of the Brain, Arctic Expeditions. The miners ইত্যাদি—

দশম—কারু-চিত্র (Decorative or Art Film) অর্থাৎ ছবিখানি আদ্যোপান্ত উচ্চাঙ্গের কারুকলার আবেষ্টনের মধ্যে তোলা যেমন—'Siegfried' 'Waxworks ইত্যাদি।

একাদশ—ধর্ম্মমূলক চিত্র, (Church Film) অর্থাৎ—কোনো ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যাপারের ছবি। যেমন—'Ten Commandments' 'Joan of Arc' ইত্যাদি।

দ্বাদশ—বিরাট চিত্র (Super Film) অর্থাৎ—যে কোনো বিষয়ের একখানি জমকালো, দৃশ্যবহুল (Spectacular) সুদীর্ঘ ছবি। যেমন Metropolis, La Miserables ইত্যাদি।

এই দ্বাদশবিধ চিত্রের পার্থক্য মনে রেখে চিত্র-নাট্য রচনায় হস্তক্ষেপ করা উচিত। চিত্রনাট্যের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করবার আগে মানসচক্ষে সমস্ত ছবিখানি কল্পনা ক'রে দেখা চাই। কারণ চিত্র-নাট্যের মধ্যে এমন কোনো দৃশ্য থাকা উচিত নয় যা ছবির আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে এগিয়ে দেয়না। অবান্তর বা অসঙ্গত কোনো ঘটনার স্থান

নেই ছবির মধ্যে। চলচ্চিত্রে ছবি আঁকা হয়না—তৈরী করা হয়। এই চিত্র নির্ম্মাণ করাকে বলে 'যোজনা' (Montage) অর্থাৎ, অসংখ্য টুক্‌রো টুক্‌রো ছবিকে একসঙ্গে জুড়ে একখানি সম্পূর্ণ ছবি গড়ে তোলা হয়। প্রথমে গল্পাংশের নানা ঘটনার পৃথক পৃথক আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়, তারপর সেগুলিকে বেছে বাদ সাদ দিয়ে কেটে ছুটে জোড়া লাগানোকেই বলে 'যোজনা' (Montage) সুতরাং 'যোজনা' বলতে কেবলমাত্র জোড়ালাগানো বুঝ্‌লে হবেনা। 'যোজনা' হ'লো—সৃষ্টি, সঙ্কলন এবং গঠন এই ত্রিবিধ ব্যাপারের সমন্বয়ে চলচ্চিত্রের অঙ্গ সম্পাদন (Cine Organisation)

চখের ভাষা ('The man with the Camera' ছবিতে নায়কের একটি চোখের Big-Close-up.)

এই চলচ্চিত্রাঙ্গ সম্পাদনের প্রথম কাজ হ'চ্ছে গল্পাংশকে মনের মধ্যে ছবিরূপে কল্পনা ক'রে পরের পর সাজিয়ে নিয়ে পরে চিত্র-নাট্যে লিপিবদ্ধ করা। দ্বিতীয় কাজ হ'চ্ছে ছবির যাবতীয় উপকরণ চিত্র-নাট্যের নির্দ্দেশ অনুসারে সংগ্রহ ক'রে ফেলা। অভিনেতা অভিনেত্রী নির্ব্বাচন এবং ছবির যে যে অংশ চিত্রগড়ে (Studio) তোলা হবে ও যে যে অংশ অনুকুল স্থান (Location) নির্ব্বাচন ক'রে তোলা হবে—তা যাছাই ক'রে ভাগ ক'রে ফেলা। তৃতীয় কাজ হচ্ছে—ছবি নেওয়া (Taking) ও তার রাসায়ণিক পরিস্ফুটন ও মুদ্রণ (Developing & Printing) চতুর্থ কাজ হচ্ছে চিত্রপটের টুক্‌রাগুলিকে (Strips of Film) দেখে শুনে হিসাব ক'রে সাজিয়ে নেওয়া ও সম্পাদন করা। (Editing)

পূর্ব্বেই বলেছি 'পরিচালক' (Director) হ'চ্ছেন চিত্ররাজ্যের প্রধান কর্ণধার। চলচ্চিত্রের সৃষ্টি, সঙ্কলন ও গঠন এই ত্রিবিধ-অঙ্গ সম্পাদনের (cine-organisation) সম্পূর্ণ ভার তাঁর উপর। চিত্র-নাট্যকার, আলোক-গ'ড়ে তোলেন। এঁরা প্রত্যেকেই পরিচালকের অধীন হ'য়ে তাঁর ইচ্ছা ও উপদেশ অনুযায়ী কাজ করেন।

কথা-চিত্র' (The Ghost that never returns ছবির একটি mid shot দৃশ্য)

সুতরাং সুপরিচালক যিনি তিনি প্রথমেই খোঁজেন একখানি সুরচিত চিত্রনাট্য। সেই চিত্রনাট্যখানিকে তিনি আবার

নিজের ইচ্ছানুরূপ পরিবর্ত্তন করে নেন। এমন কি কোনো প্রসিদ্ধ লেখকের বহু পরিচিত কোনো রচনাকেও তিনি ছবির উৎকর্ষ ও আকর্ষণের দিক থেকে বিচার ক'রে

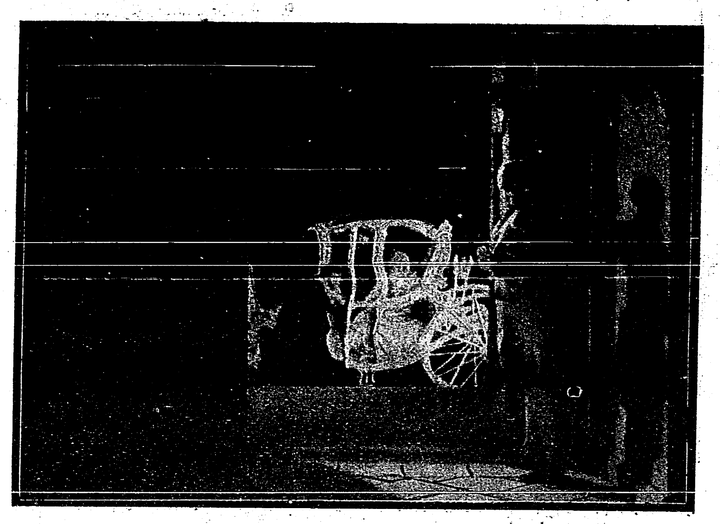

উপ-চিত্র (Cindrella রূপকথার ছবির একটি Long-mid-shot দৃশ্য)

অনেক সময় আমূল পরিবর্ত্তন করে নেন। মিলনান্তক বহু গল্পই ছবিতে বিয়োগান্ত হ'য়ে দেখা দেয়, আবার

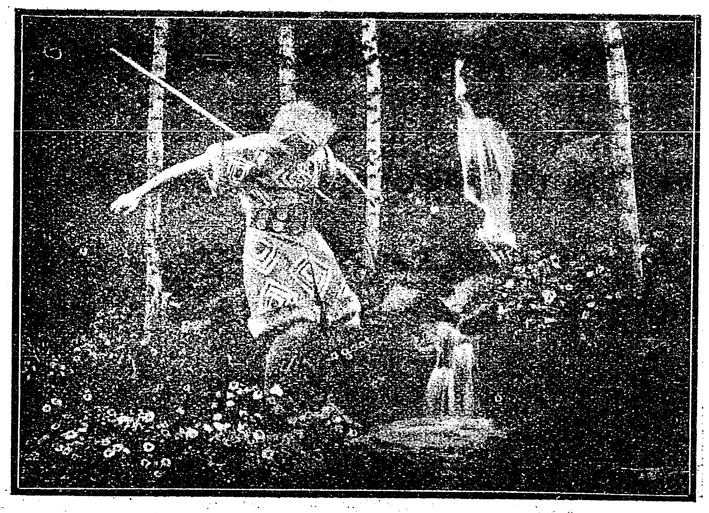

কারু-চিত্র (Sefried ছবির একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য, দৃশ্যটি নকল। অরণ্য পুষ্প প্রস্রবণ সবই চিত্রগড়ে তৈরী)

বিয়োগান্ত কাহিনীও অনেক সময় হয়ে ওঠে মিলনের মাধুর্য্যে অপরূপ। মোট কথা—চলচ্চিত্রের বীজ নিহিত থাকে—চিত্র-নাট্যের মধ্যেই। কাজেই, চিত্র-নাট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে চলচ্চিত্রের প্রথম ও প্রধান উপকরণ।

ছবির জন্য কোনো মৌলিক গল্প রচনা ক'রে চিত্র নাট্য প্রস্তুত করাই হচ্ছে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায়, কারণ সে ক্ষেত্রে লেখকের কল্পনার একটা অবাধ স্বাধীনতা থাকে। গল্পটি তিনি ছবিরূপেই ভাবতে ও লিখতে পারেন কিন্তু কোনো প্রসিদ্ধ লেখকের বিখ্যাত রচনাকে চিত্র-নাট্যে রূপান্তরিত করা একান্ত কঠিন। কারণ সেক্ষেত্রে গল্পটিকে শুধু ছবি ক'রে তুলতে পারলেই হবেনা; সেই প্রসিদ্ধ লেখকটির সেই বিখ্যাত রচনার যা কিছু বিশেষত্ব অর্থাৎ, যে কারণে সেই রচনা এত বিখ্যাত ও জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছে, সেটি সম্পূর্ণরূপে ছবির ভিতর ফুটিয়ে তোলা চাই। তবেই সে চিত্র-নাট্য ও তার ছবির সাফল্য অর্জ্জন করা সম্ভব হ'তে পারে।

চিত্র-নাট্য থেকে পরিচালক আবার তাঁর কাজের জন্য একটি নক্সা (Scenario Plan) বা চিত্র-লিপি তৈরি ক'রে নেন। তাকে ব'লে 'Shooting Manuscript.' চলচ্চিত্রের ছবি নেওয়াকে বলে Shooting, তাই দূর থেকে নেওয়া ছবির আখ্যা হয়েছে Long Shot, মাঝামাঝি ব্যবধান থেকে নেওয়া ছবিকে বলে—Mid-Shot; ক্যামেরাকে গতির অনুগামী করে যে ছবি তোলা হয়, তাকে বলে—Track Shot ইত্যাদি। 'Closeup Fadein, Fade out, Dissolve প্রভৃতি কথাগুলির তাৎপর্য্য আগেই লিপিবদ্ধ ক'রেছি, তার পর জানা দরকার ছবির—Titles (পরিচয় লিপি) পরিচয় লিপি তিন চার রকম—'Titles, Sub-Titles, Grand Titles ইত্যাদি। এ গুলোর প্রয়োজনীয়তা জানা থাকলে চিত্র-নাট্য রচনা সহজ ও সম্পূর্ণ হ'তে পারে।

অনেক সময় কেবলমাত্র গল্পটুকু পেলেই পরিচালক

তাকে চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত ক'রে নেন। চলচ্চিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ পরিচালক যেখানে স্বয়ং গল্প রচনা ও চিত্রনাট্য প্রস্তুত ক'রতে পারেন। সেখানে ছবি প্রায়ই খুব ভালো উৎরে যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ শ্রীযুক্ত দেবকী-বসুর পরিচালিত 'অপরাধীর' উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলা ছবির মধ্যে এখানি সকলদিক দিয়ে অনেকটা এগিয়ে এসেছে ব'লতেই হবে। গল্পটির মধ্যে আগাগোড়া বিলাতী গন্ধ থাকলেও পরিচালক স্বয়ং সেটি রচনা করেছিলেন এবং তার চিত্ররূপ দেবার স্বাধীনতা পেয়েছিলেন বলেই—ছ বি খা নি ও ভালো হবার সু যো গ পেয়েছিল।

যেখানে চলচ্চিত্র সম্বন্ধে সুবিজ্ঞ পরিচালক স্বয়ং সাহিত্য রচনায় তেমন সুপটু না সেখানে তাঁকে চিত্র-নাট্যের জন্য জনকয়েক সুলেখকের উপর নির্ভর করতেই হয়। এ যিনি না করেন—তিনি ঠকেন। সুসাহিত্যিকের সহযোগীতা ব্যতিত সুচিত্র প্রস্তুত করা তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর নয়। এমন কি তিনি যদি প্রসিদ্ধ কোনো গল্পলেখক বা ঔপন্যাসিকের বিখ্যাত কোনো রচনা নিয়েও ছবি ক'রতে নামেন তা হ'লেও তাঁকে অকৃতকার্য্য হ'তে হয়। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অতুলনীয় রচনা 'শ্রীকান্ত' ছবির পর্দ্দায় যে শোচনীয় রূপ পরিগ্রহ করেছিল তার পর আর এ কথা আশা করি কাউকে দুবার বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন নেই। বাংলা ছবির প্রথম যুগে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'মান-ভঞ্জনেরও' ঠিক্ এমনিই দুর্দ্দশা হ'তে দেখেছিলুম। এই সাহিত্য রসিকদের সহযোগীতার অভাবেই দেশী ছবির চিত্র পরিচয় (Titles) অপাঠ্য হ'য়ে ওঠে!

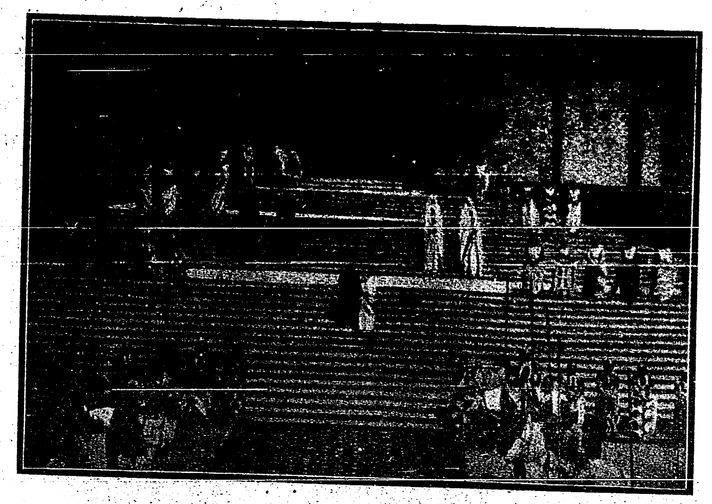

কাব্য-চিত্র (Nibelungen Saga'র long shot দৃশ্য)

হ'তে পারতো যদি এই ছবির পরিচালকেরা দুঃসাহসিকতার সঙ্গে এগুলির আবশ্যকীয় চিত্ররূপ দিতে বদ্ধপরিকর হ'তেন। অর্থাৎ—ইচ্ছামত অদল-বদল ক'রে নিতেন। যেমন

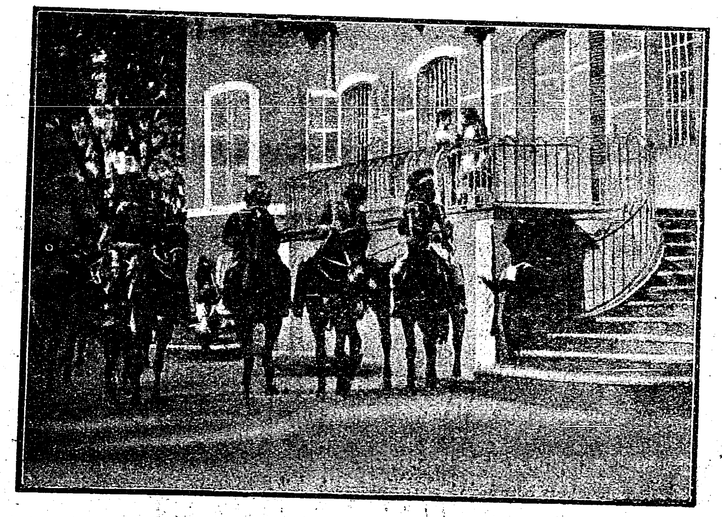

ঐতিহাসিক চিত্র (ন্যাপোলিঁয়ো বোনাপার্ৎ)

আবার খ্যাতি ও নামের মোহে ছবির জন্য গল্প নির্ব্বাচন ক'রতে পরিচালকেরা অনেক সময় ভুল ক'রে ওদেশের পরিচালকেরা অনেকেই ক'রে থাকেন। স্পেনের বিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত ব্লাস্কো আইবানেজ্ (Blasco

Ibanez) তাঁর একখানি নাটকের চিত্ররূপ দেখতে গিয়ে ক্ষেপে উঠেছিলেন একেবারে! তাঁর গ্রন্থে ছিল নায়ক-নায়িকার মিলনের আনন্দ-ছবি! কিন্তু চলচ্চিত্রে গিয়ে

ধর্ম্মমূলক চিত্র ('জোয়ান অফ্ আর্ক' ছবির দৃশ্য) (Closeup)

আলোকচিত্রের ঔৎকর্ষে এ ছবিখানি অতুলনীয় দেখলেন তিনি—তাঁর নায়ক যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত! নায়িকা শোকে দুঃখে একান্ত কাতর! অসীম সহানুভূতি ও সমবেদনা নিয়ে বন্ধু এলো বান্ধবীকে সান্ত্বনা দিতে—পঞ্চশরেরর অব্যর্থ শর সন্ধান এবারে আর ব্যর্থ হ'লোনা! আইবানেজ অবাক্! এ বন্ধুটি, তাঁ'র গ্রন্থে ছিলনা! এটি পরিচালকের সৃষ্টি!

চলচ্চিত্র সম্বন্ধে যাঁর সবিশেষ অভিজ্ঞতা নেই তিনি সুসাহিত্যিক হ'লেও যে সুপরিচালক হ'তে পারেন না এ সত্যও বাংলা দেশে একাধিক চিত্রে সপ্রমাণিত হ'য়ে গেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কেবলমাত্র একজন পরিচালকের একার চেষ্টায় কোনো ছবিই সুন্দর হ'তে পারে না, যদি না তিনি একাধারে চলচ্চিত্রাভিজ্ঞ, সুসাহিত্যিক, আলোকচিত্রে পটু এবং অভিনয়ে সুদক্ষ হন। এরূপ একাধারে সর্ব্বগুণ সম্পন্ন পরিচালকপাওয়া দুর্লভ ব'লেই প্রয়োজকদের উচিত বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞদের সংগ্রহ করে একটি দল গঠন করা এবং তাঁদের নিয়ে একত্রে একযোগে কার্য্য করা। এই ভাবে কাজ ক'রতে না পারলে ভালো ছবি হওয়া সম্ভব নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও শরচ্চন্দ্রের একাধিক শ্রেষ্ঠ রচনাই পরের পর চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হ'তে দেখা গেলো, কিন্তু কোনটিই চলচ্চিত্র হিসাবে শ্রেষ্ঠ হ'য়ে উঠতে পারলে না। এই শোচনীয় ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে তাঁদের কোনো বইখানিরই 'চিত্র-নাট্য' ঠিক্ চলচ্চিত্রের উপযোগী করে লেখানো হয় নি এবং এ সকল ছবির পরিচালকেরা রঙ্গালয়ের অভিনেয় নাটক এবং ছায়াচিত্রে অভিনেয় নাটকের পর্থক্য ও তাহার ভিন্ন অভিব্যক্তি স্বীকার করেন নি অথবা সে সম্বন্ধে তাঁরা অভিজ্ঞ নন।

রঙ্গালয়ের জন্য যেভাবে নাটক রচিত হয়, ছবির পর্দ্দার জন্য ঠিক সেভাবে চিত্র-নাট্য লেখালে চলবে না একথা পূর্ব্বেও বলেছি, আবার বলছি। এবং চিত্রাভিনয়ও যদি রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের অনুসরণ করে তাহ'লে চলচ্চিত্র হিসাবে সে যে ব্যর্থ হবেই এ সম্বন্ধেও পুনরুক্তি করা বাহুল্য মাত্র। 'চিত্র-নাট্য' কী-ভাবে রচিত হওয়া উচিত, আমি এখানে শরচ্চন্দ্রের একটি গল্প অবলম্বনে তার বিশেষত্বটুকু পরিস্ফুট ক'রে দেখাবার চেষ্টা ক'রছি। গল্পটি—

(ধর্ম্মমূলক চিত্র। জোয়েন অফ আর্ক আর একটি দৃশ্য)

কাশীনাথ

চুম্বুক (Synopsis)

কাশীনাথ শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন। মাতুলালয়ে অনাদরে অযত্নে প্রতিপালিত। বয়স আঠারো। টোলে পড়াশুনা করে। সুখে দুঃখে নির্ব্বিকার।

মাতুল মধুসূদন পূজারী ব্রাহ্মণ। মাতুলানী মুখরা—মমতাহীনা। মাতুলপুত্র হরিচরণ কাশীনাথের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন। মাতুলগৃহে সকলেই কাশীনাথকে অশ্রদ্ধা করে, কেবল মাতুল কন্যা বিন্দুবাসিনী তাকে স্নেহচক্ষে দেখে। কাশীনাথ তাই বিন্দুবাসিনীর অনুগত।

জমীদার প্রিয়নাথবাবু অপুত্রক। একমাত্র আদরিণী কন্যা কমলাই তাঁর সব। অত্যাধিক আদরে কমলা স্বেচ্ছাচারিণী। কন্যা বিবাহযোগ্যা। প্রিয়নাথ সুপাত্র সন্ধান ক'রছেন। গুরুদেব কাশীনাথের সন্ধান দিলেন। প্রিয়নাথ তাকে মনোনীত করে কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিলেন এবং 'ঘরজামাই করে রাখলেন।

কমলা স্বামীর প্রকৃতি ঠিক বুঝতে পারলে না। ফলে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হ'লো।

অল্পদিন পরেই প্রিয়নাথবাবু অসুস্থ হয়ে পড়লেন। উইল ক'রে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি কন্যা ও জামাতাকে সমানভাগ করে দিলেন। কমলা এতে প্রবল আপত্তি জানিয়ে পিতার সমস্ত সম্পত্তি নিজের নামে লিখিয়ে নিলে।

প্রিয়নাথবাবুর মৃত্যুর পর কমলার বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ করছিল কাশীনাথ। কিন্তু মধ্যে বিন্দুবাসিনীর চিঠিতে তার স্বামীর অসুস্থতা ও তাদের অর্থাভাবের বিষয় জানতে পেরে কাশীনাথ কিছু টাকা নিয়ে বিন্দুবাসিনীকে সাহায্য ক'রতে গেলো। কমলা এ ব্যাপারে কাশীনাথের উপর বিরক্ত হ'য়ে একজন নূতন ম্যানেজার রেখে নিজেই বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করতে সুরু করে দিলে।

কাশীনাথ ফিরে এসে দেখলে যে সে বাড়ীতে তার আর স্থান নেই। নূতন ম্যানেজার ও পত্নী কমলার কাছে বার বার অপমানিত হ'য়ে কাশীনাথ যেদিন গৃহত্যাগ করলে সেইদিনই রাত্রে পথের মাঝখানে লাঠিয়ালদের হাতে মার খেয়ে কাশীনাথ আহত হ'য়ে পড়ে রইল। বিন্দুবাসিনীর স্বামী সেরে উঠে বিন্দুকে নিয়ে কাশীনাথের সঙ্গে দেখা ক'রতে আসবার সময় পথের মাঝে কাশীনাথকে আহত অবস্থায় পড়ে আছে দেখে তুলে নিয়ের গেলো।

এই ঘটনায় কমলা অত্যন্ত অনুতপ্ত হ'য়ে পড়লো, ফলে স্বামী-স্ত্রী মধ্যে পুনর্মিলন ঘটলো।

(শেষ)

নাট্য-চিত্র (Piccadily ছবির একটি দৃশ্যে নায়িকার ভূমিকায় বিখ্যাতা চীনা অভিনেত্রী Anna May Wong)

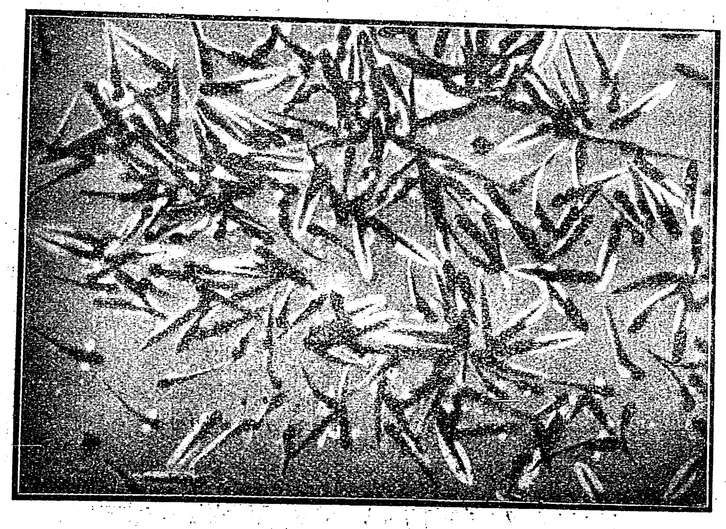

শিক্ষা-চিত্র (The Frog ছবির একটি দৃশ্যে ব্যাঙাচির ব্যাপার!)

গল্পের এই সংক্ষিপ্তসার থেকেই বোঝা যাচ্ছে চলচ্চিত্রে এ কী রূপ নেবে এবং ছবির দিক দিয়ে এর সম্ভাবনা?

কতখানি। এটি যে 'কথা-চিত্র' শ্রেণীর ছবি হবে একথা বলাই বাহুল্য, সুতরাং এই গল্পটির 'চিত্রনাট্য' রচনা ক'রতে হ'লে গল্পের প্রতিপাদ্য বিষয়টুকু যাতে ছবির মধ্যে

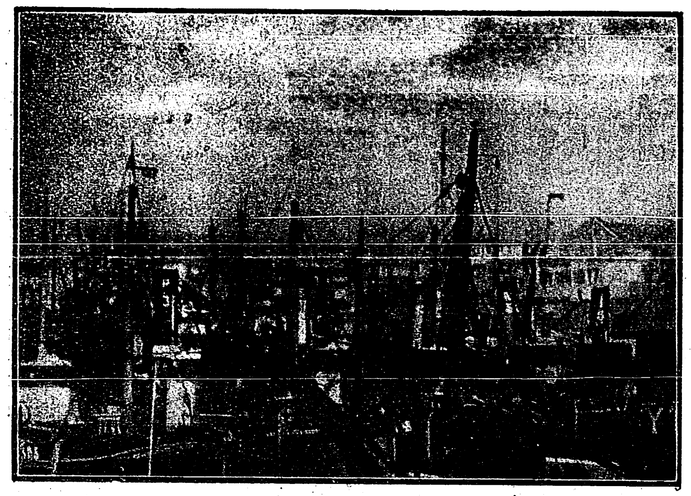

শিক্ষা-চিত্র ('Drifters' ছবিতে সমুদ্রের মাছধরা জাহাজ বা ধীবর নৌ বাহিনী

ফুটে ওঠে এবং প্রসিদ্ধ লেখক শরচ্চন্দ্রের রচনার বিশেষত্বও যাতে কোথাও ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে কলম

নিছক্ চিত্র (La Marche Des Machines নামের

ফরাসী ছবিতে কলকব্জার রূপ !)

ধ'রতে হবে। প্রত্যেক চিত্র-নাট্যের গোড়ায় গল্পের সারাংশ দিতে হয় এবং পাত্র-পাত্রীদের একটি কোষ্ঠীপত্র বা পরিচয় লিপি লিখে দিতে হয়। তাতে প্রত্যেক চরিত্রের মোটামুটি একটা বর্ণনা থাকা চাই। যেমন—

কাশীনাথ—সুন্দর যুবা, বয়স আঠারো। বয়সের তুলনায় ধীর গম্ভীর। শান্তপ্রকৃতি। সৎস্বভাব, সুখে দুঃখে নির্ব্বিকার চিত্ত, দৃঢ়মনা, অশেষ সহ্যগুণ। সহজে বিচলিত হয় না। বিপদে স্থির। সঙ্কল্পে অটুট। আত্মমর্য্যাদা সম্বন্ধে সজাগ, রুদ্ধ অভিমানি।

কমলা— চির আদরে লালিতা তরুণী ধীর দুলালী। রূপও আভিজাত্যগর্ব্বিতা, অহঙ্কারে পরিপূর্ণ মন, উদ্ধতস্বভাবা, স্বাধীন প্রকৃতি, দুর্ব্বিনীতা, কোপন-স্বভাবা। উগ্র, চঞ্চল, অস্থির মতি, দুর্জ্জয় অভিমানিনী।

প্রিয়নাথবাবু—উদার মহৎপ্রাণ সদাশয় জমীদার, স্নেহপ্রবণ পিতা, অনুরক্ত স্বামী। বয়সে প্রৌঢ়। সৌম্যকান্তি। বিলক্ষণ ও বিষয়ী।

এইভাবে মধুসূদন, মধুসূদনের স্ত্রী, হরিচরণ, বিন্দুবাসিনী, গুরুদেব, নূতন ম্যানেজার প্রভৃতি চিত্র-নাট্যের অন্তর্গত প্রত্যেক চরিত্রের কিছু কিছু বর্ণনা সহ একটি তালিকা দিতে হবে। তারপর চিত্র-নাট্য সুরু করা চাই।

গল্পে আমরা পাচ্ছি কাশীনাথ শৈশবে পিতৃমাতৃহীন, মাতুলালয়ে অযত্নে অনাদরে প্রতিপালিত। মাতুলানী তার প্রতি মমতাশূন্য। মাতুলপুত্র হরিচরণ বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন। একমাত্র মাতুলকন্যা বিন্দুবাসিনী তার প্রতি স্নেহশীলা—সুতরাং এখানে চিত্রনাট্য সুরু করা উচিত প্রধান চরিত্র বা নায়কের শৈশব ঘটনার একটি করুণ দৃশ্য থেকে। কারণ এতে দর্শকদের মনটি গোড়া থেকেই নায়কের প্রতি সহানুভূতিতে ভরে উঠবে ফলে ছবিখানি সুরু থেকেই তাদের চিত্ত স্পর্শ ক'রে একটা আকর্ষণ জাগিয়ে তুলতে পারবে।

অতএব এ চিত্র-নাট্যখানি সুরু ক'রতে হবে ঐ রকম

একটি প্রস্তাবনা (Prologue)—দিয়ে। প্রস্তাবনায় যে ক'টি দৃশ্য থাকা প্রয়োজন ভেবে নিয়ে তার একটি তালিকা ক'রে ফেলা চাই। তারপর গল্পটির দিকে লক্ষ্য রেখে মূল নাটকের দৃশ্যাবলীরও একটি তালিকা প্রস্তুত ক'রতে হবে। তাহলে চিত্রনাট্য রচনা করা সহজ-সাধ্য হ'য়ে উঠবে এবং পরিচালকেরও কাজের অনেক সুবিধা হ'য়ে যাবে। গল্পটিকে ছবির ভিতর দিয়ে দেখবার চেষ্টা করলেই দৃশ্যবিভাগ আপনা হতেই পরের পর মনে আসবে। লেখক তাঁর কল্পনা-শক্তিকে জাগ্রত ক'রতে পারলে ছবিখানির আরও অনেক সৌন্দর্য্য সম্পাদন ক'রতে সক্ষম হবেন।

আমার মনে হয় প্রস্তাবনাটি এইরকম ক'রলে মন্দ হবে না। অবশ্য, যিনি 'পরি-চালক' তিনি আলোক চিত্রকরের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ইচ্ছামত এর পরিবর্ত্তন ক'রে নিতে পারবেন।

অসীমের রূপ ! (Old & New ছবিতে একটি নিসর্গ দৃশ্য ! অনন্ত আকাশ এখানে অসীম প্রান্তরে এসে মিলেছে !

The Prologue

—প্রস্তাবনা—

Grand-Title :—

The Advent of Poojah in the Village

পল্লীতে শারদীয়া পূজা

Time—শারদ-প্রভাত

Properties—প্রতিমা, পূজার সরঞ্জাম, ঢাক ঢোল কাঁসর ঘণ্টা

Costume—সকলের নব বস্ত্রাদি উৎসব বেশ

Sub-Title :—"আনন্দময়ীর আগমনে
আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে।"

The whole Village is delighted with the joy of the Pujah

Scene 1, —পল্লীদৃশ্য—(Panorama)
Truck shot leads to
(2) জনৈক পল্লীবাসীর চণ্ডীমণ্ডপে

Business :—দশভূজার পূজা

Long shot মহাসমারোহে পূজারতি চলছে, ঢাক ঢোল
Mid shot কাঁসর ঘণ্টা বাজছে, দলে দলে ছেলে মেয়ে
Close up স্ত্রী পুরুষ এসে প্রতিমাদর্শন ও প্রণাম করছে, অদূরে যূপকাষ্ঠে ছাগ শিশু বাঁধা

Dissolved in to

Scene 11—পূজাবাড়ীর প্রবেশদ্বার

Business নহবৎখানায় নহবৎ বাজছে, পূজাবাড়ী
mid shot প্রবেশের জন্য নরনারী বালক বালিকারা
Long mid shot ভীড় করে আসছে, পথপার্শ্বে মেলা ব'সেছে, বিবিধ দোকানপাট ; খেলনা পুতুল বিক্রী হ'চ্ছে

Fade out—

Time—same as before

Properties—নহবতের বাদ্য যন্ত্রাদি, আম্র-পল্লব, কদলী বৃক্ষ, সশীর্ষ ডাব, পূর্ণ কুম্ভ, দোকান; খেলনা পুতুল ইত্যাদি

Contume—উৎসব বেশ

Grand Title—A Lonely Orphan

একটি নিঃসঙ্গ অনাথ শিশু !

Subtitle—**Kasinath at his uncles place.**

মাতুলালয়ে কাশীনাথ

Deprived of all affection & care which a child needs most.

আশৈশব সকলের স্নেহ যত্নে বঞ্চিত !

Time—Same.

Properties—ফুটো বালতি, কুয়োর দড়ী,

Costume— ছিন্ন মলিন বস্ত্রে কাশীনাথ—

Sub-Title—"হের ঐ ধনীর দুয়ারে
দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে !"

Time—Same

Properties—দ্বারপালেদের হাতে লাঠি

Costume—দ্বারপালেদের উর্দ্দিপরা, ভিখারিণী মেয়ের ছিন্ন মলিন বেশ

Time—Same

Properties—বাল্‌তি, বাঁশী, পুতুল, সন্দেশের থালা, ফুল, মালা গাঁথার ছুঁচ সুতা,

Costume—উৎসব বেশে বিন্দু ও হরিচরণ, ছিন্ন মলিন বেশে কাশীনাথ

Fade in—

Scene 111 মধুসূদনের কুটীর প্রাঙ্গন। প্রাঙ্গণের একপাশে বড় একটি চাঁপা গাছ। চাঁপাগাছের পাশ দিয়ে বাগানের পথ! পথের ধারে সারি সারি ফুলগাছ। চাঁপাতলায় বাঁধানো কূপ

Business কাশীনাথ অতিকষ্টে বাল্‌তি ক'রে কূপ

mid shot থেকে জল তুলছে এবং সেই জলের বাল্‌তি দু'হাতে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে ফুলগাছে

close up জল দিচ্ছে' কিন্তু হাঁপিয়ে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ছে !

Lap Dissolve in to 1st···Scene.

closeup—যূপকাষ্ঠে ছাগশিশু বাঁধা

Fade out—

Fade in—

Scene II পূজাবাড়ীর প্রবেশ দ্বার—

Business—

দ্বারপালেরা উৎসব বেশধারীদের প্রবেশ ক'রতে দিচ্ছে, কিন্তু, দুঃখী ভিখারীদের যেতে দিচ্ছে না। একটি মেয়ে—কাঙ্গালিনী —করুণ নেত্রে দ্বারে দাঁড়িয়ে !

Fade out—

Revive-Scene III.

Business—জল সেচনে ক্লান্ত কাশীনাথ পূজার স্বপ্ন দেখ্‌ছে। বাল্‌তি হাতে কুয়োর পাড়ে

Close up বসেছিল সে; নূতন জামা-কাপড় প'রে বাঁশী ও পুতুল হাতে বালক হরিচরণ এসে তাকে আপনার সাজসজ্জা ও সম্পদ দেখালে, কাশীনাথ মুখ ফিরিয়ে নিয়ে উঠে

Mid shot প'ড়লো এবং জল তুলে গাছে দিতে গেল। ফুটো বাল্‌তী থেকে জল ফিন্‌কী দিয়ে এসে হরিচরণের নতুন জামা কাপড় ও জুতো ভিজিয়ে দিলে। হরিচরণ রাগে

—do— ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠে কাশীনাথকে খুব মারলে। কাশীনাথ জলের বাল্‌তি তুলে হরিচরণকে মারতে যাচ্ছিল; কিন্তু মামী আসছে

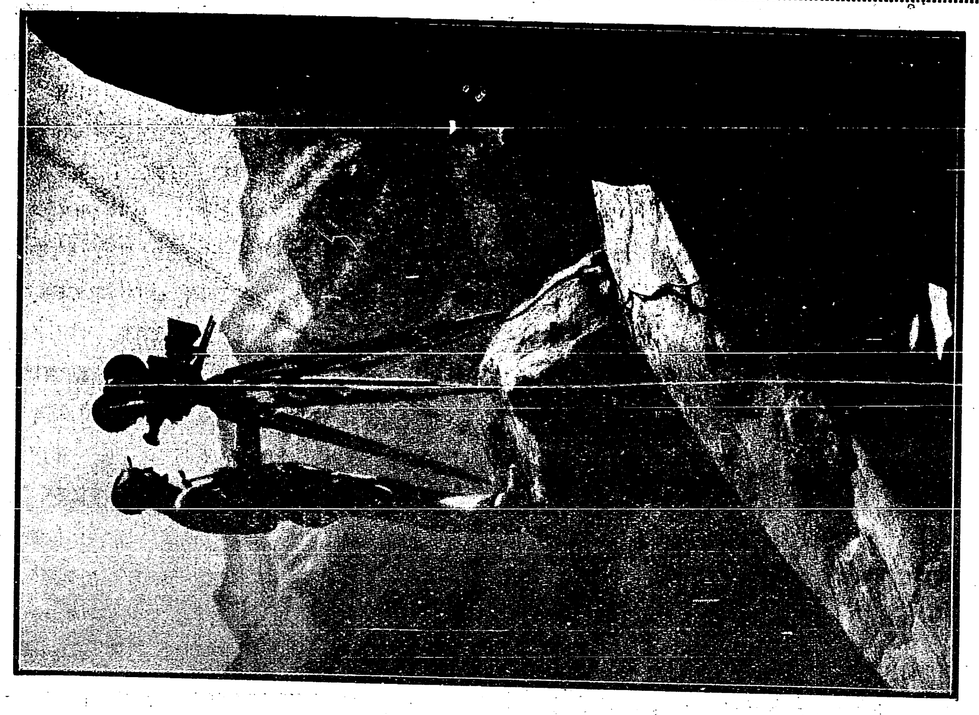

তুঙ্গশৃঙ্গের চিত্র (The Great-Medow' ছবিতে ক্যামেরা নিয়ে দশ হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের চূড়োয় উঠে তুঙ্গ শৃঙ্গের দৃশ্য তোলা হচ্ছে।

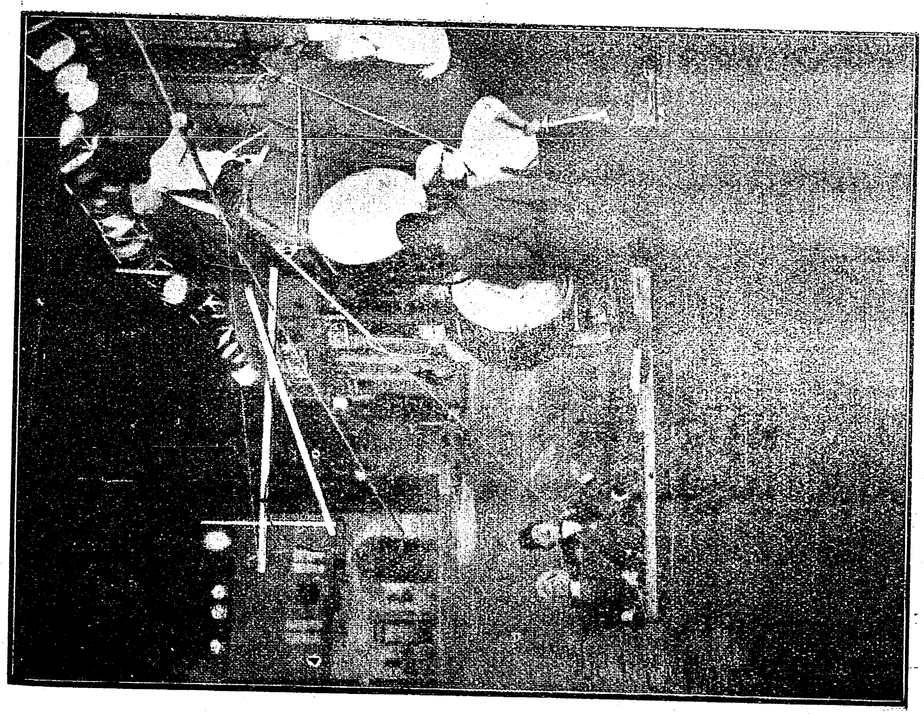

পিছলিয়ে বাড়ী যাওয়া ! (Fifty Million French men ছবিতে প্যারীর পথ দিয়ে পিছলিয়ে বাড়ী ফেরার একটি দৃশ্য তোলা হ'চ্ছে—হোলীউডের চিত্র গড়ে ! সমস্ত অভিনয় মায় যন্ত্রপাতি ও লোকজন সব একটি গড়ানে মাচার উপর তুলে ছবি নেওয়া হয়েছে ?)

Grand Title—**The solitary Sympathiser**

Sub-Title—**The only joy of his Childhood !**

—তার দুখের দুখী ব্যথার ব্যথী
শৈশবের একমাত্র সঙ্গিনী !"

Sub-Title **A constant menace**

চির-শত্রু !

Time—Afternoon

Properties—মহাভারত

Costume—আটপৌরে ধুতি সাড়ী

—do— দেখে উদ্যত বাহু নামিয়ে নিলে। সন্দেশের থালা হাতে মামী এসে হরিচরণকে সন্দেশ খেতে দিলে—হরিচরণ মা'র কাছে

—do— কাশীনাথের নামে লাগালে যে সে তার নতুন জুতোজামা ভিজিয়ে দিয়েছে। মামা কাশীনাথকে ব'কলে ও সন্দেশ না দিয়ে চলে গেল। হরিচরণ খুসী হ'য়ে কাশী-

close up নাথকে তাঁর সন্দেশ দেখিয়ে ভেঙ্‌চে চলে গেলো, কাশীনাথ জলের বাল্‌তি ছুঁড়ে

mid shot ফেলে দিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগ্‌লো। এমন সময় বালিকা বিন্দুবাসিনী এসে তা'কে

mid shot কাঁদতে দেখে আঁচল দিয়ে তার চোখ মুছিয়ে দিলে। নিজের হাতের সন্দেশ তাকে খাইয়ে দিলে। বাবাকে বলে কাশীনাথের জন্য নূতন পূজার কাপড় কিনে দেবে বললে। কাশীনাথ তবুও ভার মুখে বসে রইল দেখে তার হাত ধ'রে টেনে তুলে চাঁপাফুল পেড়ে দিতে বললে। কাশীনাথ চোখ মুছে মালকোঁচা বেঁধে গাছে উঠে ফুল পাড়তে লাগলো, বিন্দু-

long shot বাসিনী কুড়িয়ে জড়ো করতে লাগলো। আঁচল ভরে উঠ্‌তেই কাশীনাথকে গাছ থেকে নেমে আসতে বললে। কাশীনাথ নেমে আসতে তার কাণে একটি ফুল পরিয়ে দিয়ে তার হাত ধরে টেনে কুয়োর ধারে নিয়ে গিয়ে বসালে এবং নিজে তার পায়ের কাছে ব'সে মালা গাঁথতে সুরু

close up করলে। এবং গল্প ক'রতে লাগলো। হরিচরণ এসে একটু দেখলে তারপর কাশীনাথের কাণের ফুল কেড়ে নিলে ও বিন্দুর আঁচলের ফুল সব ছড়িয়ে ফেলে দিলে !

Dissolved into—

Scone IV. মধুসূদনের বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপ সিঁড়ির উঁচু

Business ধাপের উপর বসে কাশীনাথ মহাভারত

mid shot পড়ছে; পায়ের কাছে নীচের ধাপে বিন্দু-

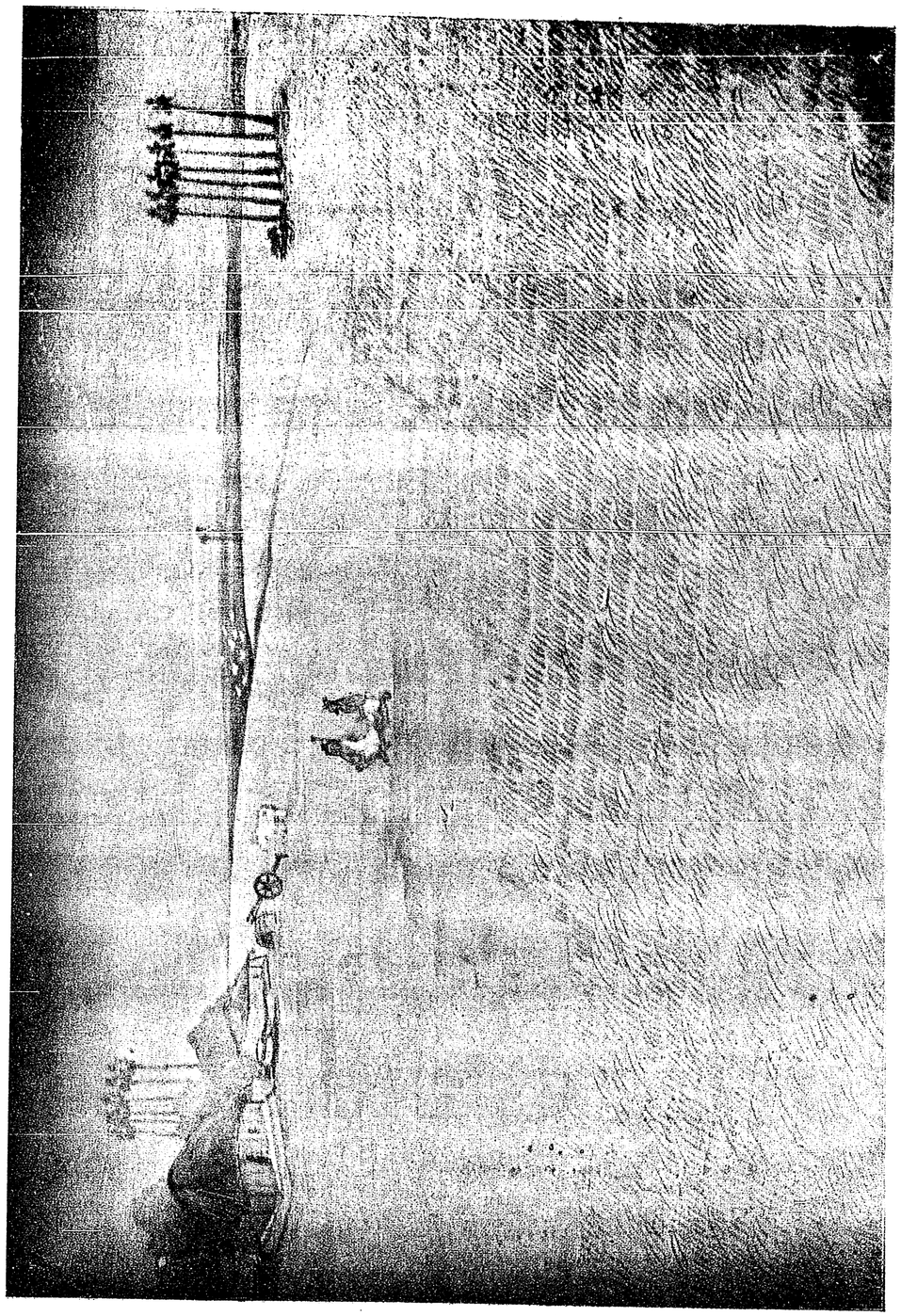

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

বাসিনী বসে শুনছে। হরিচরণ কাছে

close up দাঁড়িয়ে মুখভঙ্গী করে দেখছে—

Double Exposure (The Boys & girl slowly transformed into grown-ups) হরিচরণ একটু

mid shot পরে কাশীনাথের হাত থেকে মহাভারত-খানা কেড়ে নিয়ে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেলো। কাশীনাথ বিরক্ত হয়ে

—do— সেদিকে চেয়ে রইল। বিন্দু উঠে বইখানি কুড়িয়ে নিয়ে এসে কাশীনাথকে দিতে যাচ্ছিল এমন সময় মামী এসে মেয়েকে সেখান থেকে চলে যেতে ব'ললে। বিন্দুর হাত থেকে বইখানি মাটিতে পড়ে গেল।

Close-up সে ধীরে ধীরে অপ্রসন্ন নতমুখে বাড়ীর ভিতর চলে গেলো। মামী কাশীনাথকে তীব্র ভর্ৎসনা ক'রে চলে গেলেন। কাশীনাথ অপ-

—do— মানের রুদ্ধ ক্ষোভে ভুলুণ্ঠিত বইখানার দিকে চেয়ে বসে রইল।

Sub-Title— **A grown up young man who never earns a penny, ought to be ashamed of living upon others, and running after girls.**

বুড়ো মদ্দ ছেলে, এক পয়সা রোজগার করবার নাম নেই, কেবল ব'সে ব'সে গিলবে, আর কুণো বেরালের মত মেয়েদের আঁচল ধরে পড়ে থাকবে!—লজ্জা করেনা একটু!

Fade out—

এইখানে প্রস্তাবনা শেষ করে এইবার মূল গল্পের চিত্রনাট্য সুরু করা উচিত। মূল গল্পটি অনুসরণ ক'রলে ছবির হিসাবে দেখা যাবে ৪১ খানি ছবির মধ্যে গল্পটিকে ফুটিয়ে তোলা যায় যেমন :—

ছবির সংখ্যা	Details
১, জমীদার প্রিয়বাবুর বাড়ী	(১) ঘটনাচক্রে কাশীনাথের সঙ্গে কমলার ক্ষণিকের দেখা। প্রিয়বাবু তাঁর গুরুদেবের সহিত পরামর্শ ক'রে কাশীনাথের সঙ্গে কমলার বিবাহ দেওয়া স্থির করলেন।
২. মধুসূদনের বাড়ী	(২) মধুসূদনের বাড়ী গিয়ে ক·া পাকা ক'রে এলেন। মধুসূদন ও তার স্ত্রী হরিচরণের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব ক'রলে। প্রিয়বাবু অসম্মত হলেন।
৩. কাশীনাথের সঙ্গে কমলার বিবাহ	(৩) কাশীনাথের সঙ্গে কমলার বিবাহ হ'লো—
৪. দরিদ্র কাশীনাথের জমীদারের জামাতায় রূপান্তর	(৪) দরিদ্র ভট্টাচার্য্যের পুত্র কাশীনাথের একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে বাবু সাজতে হ'লো। তার বাথরূমে স্নান, তার জুড়ী চড়ে সান্ধ্যভ্রমণ, তার চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় আহার, তার দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন, তার সুবৃহৎ লাইব্রেরী, ক্রমাগত, তাকে তার পূর্ব্ব দুরবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে লাগলো। কাশীনাথ অসাচ্ছন্দ্য বোধ করে।
৫. নবপরিণীত দম্পতী	(৫) কাশীনাথের মনে সুখ নেই দেখে কমলা তার জন্য চিন্তিত, কাশীনাথ বিরক্ত।

৬. কাশীনাথের মাতুলালয়ে যাত্রা

(৬) কাশীনাথ মাতুলালয়ে চললো, পথে দ্বারবান সঙ্গে যাচ্ছে 'দেখে' কাশীনাথ তাকে ফিরে যেতে ব'ললে, দ্বারবান তার অবাধ্য হ'ল।

৭. মাতুলালয়ে কাশীনাথ

(৭) কাশীনাথ মাতুলালয়ে গিয়ে বিন্দুবাসিনীর কাছে মনের দুঃখ বললে। হরিচরণ এসে জমীদারের ঘরজামাই ব'লে বিদ্রূপ ক'রে গেলো। কমলাকে বিন্দু দেখতে চাইলে। কাশীনাথকে নিতে জমীদার বাড়ী থেকে গাড়ী এলো, সেই গাড়ীতে বিন্দুকে কাশীনাথ নিয়ে যেতে চাইলে, হরিচরণ আপত্তি করলে।

৮. কাশীনাথ ও কমলা

(৮) কাশীনাথ ফিরে কমলাকে মামার বাড়ীর ঘটনা জানালে—

৯. মাতুলালয়ে কাশীনাথ

(৯) পরের দিন আবার বিন্দুকে আনতে গিয়ে শুনলে বিন্দুর স্বামী অত্যন্ত পীড়িত—'তার' পেয়ে বিন্দু চলে গেছে।

১০. প্রিয়বাবু ও কমলা

(১০) প্রিয়বাবু পীড়িত, কমলার সেবা

১১. কাশীনাথ ও কমলা

(১১) কাশীনাথের মনোকষ্ট ও অসুস্থতা, কমলা কারণ জানতে ব্যগ্র, কাশীনাথের স্বীকারোক্তি যে এ বিবাহে সে সুখী হ'তে পারে নি।

১২. প্রিয়বাবু ও কাশীনাথ

(১২) প্রিয় বাবু কাশীনাথের উপর জমীদারীর ভার দিলেন।

১৩. উকীল ও প্রিয়বাবু

(১৩) উকীলকে ডেকে উইল ক'রে সমস্ত সম্পত্তি কন্যাজামাতাকে সমান ভাগ ক'রে দিলেন ; কমলা আপত্তি ক'রে সমস্ত সম্পত্তি নিজ নামে লিখিয়ে নিলে।

১৪. প্রিয়বাবুর মৃত্যু

(১৪) প্রিয়বাবুর মৃত্যু।

১৫. কাশীনাথ ও দেওয়ান

(১৫) দেওয়ানকে নিয়ে কাশীনাথের জমীদারী সম্বন্ধে আলোচনা ও উইলের বিষয় অবগত হওয়া।

১৬. কমলা ও পরিচারিকা

(১৬) কমলা স্বামীর উদাসীনতার জন্য দুঃখিত। পরিচারিকার কাছে অভিযোগ, পরিচারিকার কাশীনাথের পক্ষ সমর্থন।

১৭. কমলার পীড়া

(১৭) কমলার পীড়ায় কাশীনাথের একাগ্র সেবা যত্ন।

১৮. জমীদার কাশীনাথ

(১৮) জমীদার কাশীনাথের লোকপ্রিয়তা।

১৯. কাশীনাথ ও কমলা

(১৯) কাশীনাথকে কমলার অশ্রদ্ধা, পরিচারিকার কর্ম্মচ্যুতি নিয়ে স্বামীর অবাধ্যতা।

২০. কলিকাতায় কাশীনাথ

(২০) বিন্দুর চিঠি পেয়ে কাউকে কিছু না ব'লে কাশীনাথের কলিকাতা যাত্রা।

২১. কমলা ও দেওয়ানজী

(২১) কমলার দেওয়ানজীকে ব'লে নূতন ম্যানেজার নিয়োগ।

২২. দেওঘরে কাশীনাথ

(২২) বিন্দু ও তার স্বামীকে নিয়ে ডাক্তারের পরামর্শে কাশীনাথের দেওঘর যাত্রা।

২৩. নূতন ম্যানেজার ও কমলা

(২৩) নূতন ম্যানেজারকে কমলার কার্য্যভার প্রদান।

২৪. কাশীনাথ ও নূতন ম্যানেজার

(২৪) তিনমাস পরে ফিরে এসে কাশীনাথ বুঝলে এ বাড়ীতে তার স্থান নেই। নূতন ম্যানেজার তাকে মানে না। (২৫) কমলার কাছে কাশীনাথের অভিযোগ। কমলার ম্যানেজারের পক্ষ অবলম্বন (২৬) ব্রাহ্মণপ্রজার কাশীনাথের কাছে নূতন ম্যানেজারের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ। (২৭) কমলাকে কাশীনাথের সেকথা বিজ্ঞাপন। কমলা এবারও নূতন ম্যানেজারের পক্ষ নিলে। (২৮) কাশীনাথ অন্তঃপুর ত্যাগ

২৫. কমলা ও কাশীনাথ

২৬. কাশীনাথ ও ব্রাহ্মণ প্রজা

২৭. কমলা ও কাশীনাথ

২৮. বারবাড়ীতে কাশীনাথ

২৯. কমলা ও নূতন ম্যানেজার

৩০. কাশীনাথ দুঃস্থ

৩১. কমলা ও নূতন ম্যানেজার

৩২. কাশীনাথ ও কমলা

৩৩. কাশীনাথের গৃহত্যাগ

৩৪. কমলা ও ম্যানেজার

৩৫. পথের মাঝে কাশীনাথ আহত

৩৬. বিন্দু ও তার স্বামীর কাশীনাথকে পাওয়া

৩৭. কমলা ও পরিচারিকা

৩৮. গ্রামে হুলস্থুল

৩৯. ডাক্তার, কাশীনাথ, বিন্দু, কমলা, পুলিশ

৪০. সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় কাশীনাথ, বিন্দু, কমলা

৪১. কাশীনাথ, কমলা

(শেষ)

করে বারবাড়ীতে আশ্রয় নিলে। (২৯) কমলাকে নূতন ম্যানেজার কাশীনাথের বিরুদ্ধে অনেক কথা বললে। (৩০) কাশীনাথ নিজের ঘড়ীচেন বেচে বিন্দুকে ৫০০৲ টাকা পাঠালেন। ব্রহ্মণপ্রজাদের নালিশ করতে বললেন এবং নিজে তাদের পক্ষে সাক্ষী দেবেন জানালেন।

(৩১) নূতন ম্যানেজার কমলাকে জানালে কাশীনাথের বিরুদ্ধ সাক্ষ্যের জন্য মামলায় হার হয়েছে।

(৩২) কমলা কাশীনাথকে এইজন্য তীব্র তিরস্কার ও অপমান করেল।

(৩৩) কাশীনাথ গৃহত্যাগ করে চলে গেল।

(৩৪) কাশীনাথকে জব্দ করবার জন্য কমলা নূতন ম্যানেজারকে হুকুম দিল।

(৩৫) ম্যানেজার লোক সঙ্গে নিয়ে পথের মাঝে কাশীনাথকে মেরে রেখে গেল।

(৩৬) বিন্দু ও তার স্বামী দেশে আসবার পথে তাকে কুড়িয়ে পেলো।

(৩৭) পরিচারিকার মুখে কমলা কাশীনাথের অবস্থা শুনে মর্ম্মাহত হ'ল। (৩৮) গ্রামে এই নিয়ে হুলুস্থুল প'ড়ে গেল। (৩৯) ডাক্তার বাঁচবার আশা দিয়ে গেল। কমলা ও বিন্দুর সেবা। পুলিশ এই দুর্ঘটনার অনুসন্ধানে এলো। কাশীনাথের ও ম্যানেজারের জবানবন্দী নিতে। কমলার ভয়। কে মেরেছে জেনেও পুলিশের কাছে এজেহারে কাশীনাথ তা প্রকাশ করলেনা।

(৪০) বিকারের ঘোরে কাশীনাথের মুখে সেকথা প্রকাশ হ'লো, অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। ডাক্তার এসে ভালো করলে, বিন্দুর ও কমলার সেবা। কাশীনাথের আরোগ্য লাভ।

(৪১) কমলার কাশীনাথের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা। কাশীনাথ কমলাকে প্রশান্ত মনে ক্ষমা করলে। (শেষ)

এই ছবির তালিকা ধরে পরের পর ঠিক এই গল্পের প্রস্তাবনা'র অনুরূপ ক'রে দৃশ্যগুলি সাজিয়ে লিখতে পারলেই একখানি মূক ছবির জন্য সুসম্পূর্ণ 'চিত্র-নাট্য' রচিত হবে। এর মধ্যে 'পরিচালক' ইচ্ছা ক'রলে একাধিক দৃশ্যে 'প্রতীক' বা Symbol ব্যবহার করতে পারেন। প্রতীক্ অনেক ছবিকে সুন্দর ক'রে তুলতে পারে। এ ছবিখানির প্রস্তাবনায় 'যূপকাষ্ঠে বাঁধা ছাগ শিশুকে' আমি অসহায় কাশীনাথের অবস্থার 'প্রতীক্‌রূপে' একবার ব্যবহার ক'রেছি। মূল ছবির চতুর্থ দৃশ্যে যেখানে দরিদ্র ভট্টাচার্য্যের পুত্র কাশীনাথ ধনী জমীদারের জামাতা হ'য়ে সুখী হ'তে পারছে না—সেখানে অরণ্যতরুকে তুলে এনে টবের চারায় পরিণত করার প্রতীক ব্যবহার হ'তে পারে। এমনি ক'রে অনেক খুঁটিনাটি বাড়িয়ে ছবিখানিকে বেশ উপভোগ্য ক'রে তোলা যায়। পরিচালক এই ছবি সম্পাদন করবার সময় কোথায় কোথায় এ ছবির উপযোগী বিরাম কাল (cuts) পাওয়া যেতে পারে বিবেচনা ক'রে একে তিন অংশে (Parts) বা চার অংশে ভাগ ক'রে ফেলতে পারেন।

'কাশীনাথ' গল্পটি 'মূক-ছবি' না হয়ে যদি 'মুখর চিত্র' রূপে গৃহীত হয় তাহ'লে এ 'চিত্রনাট্য থেকে সে ছবি নেওয়া চলবে না। মুখর চিত্রের জন্য নূতন ক'রে 'চিত্র-নাট্য' রচনা করা চাই। তাব'লে সে যেন ষ্টেজের নাটক না হয়! কথায় অনেক কিছু বোঝানো যায় বলে—পরিচালক ইচ্ছা করলে 'মুখর চিত্র' ছবিখানিকে ক্ষতিগ্রস্ত না ক'রেও, ছবির অংশ অনেক কমিয়ে ফেলতে পারেন, কিন্তু আমার মনে হয় সেদিকে ঝোঁক দেওয়া কোনো পরিচালকের উচিত নয়, কারণ, চিত্র মুখর হ'লেও—সে ছবি! সুতরাং,

ছবির সংখ্যা কমানো মানেই ছবিকে হত্যা ক'রে রঙ্গমঞ্চের নাটককে পর্দ্দায় টেনে আনা !

মুখর 'চিত্রনাট্য' করবার সময় 'কাশীনাথ' ছবিতে প্রস্তাবনা অংশ রাখবার প্রয়োজন নেই। কারণ যে দৃশ্যে

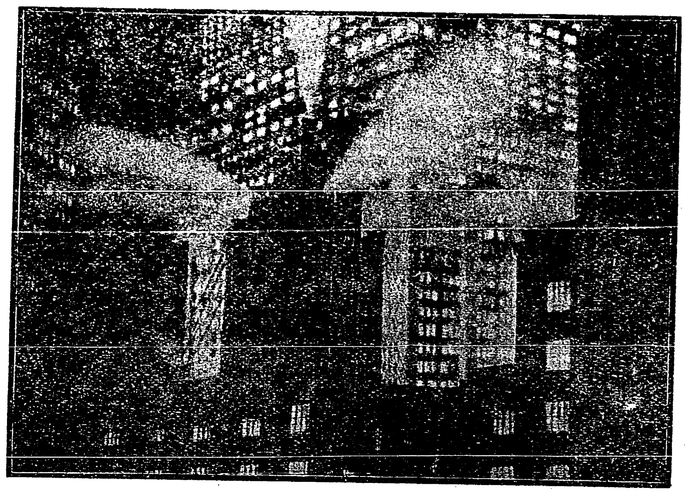

বিরাট চিত্র—(বিশ্ববিশ্রুত Metropolis ছবির অপূর্ব্ব আলোক চিত্র !)

কাশীনাথ কমলার কাছে বিন্দুবাসিনীর কথা বলবে সেই দৃশ্যে সে তার শৈশবের দুরবস্থার বর্ণনা করবার সুযোগ পাবে সুতরাং মুখর চিত্রনাট্য একেবারে 'প্রিয়বাবুর বাড়ী' থেকে কমলার বিবাহের কথাবার্ত্তা নিয়ে সুরু করলেই হবে। এবং ৩, ৯, ১০, ১৪, ২৪, ২৯, ৩০, ৪০ প্রভৃতি, দৃশ্যগুলি অনায়াসে বাদ দেওয়া চলবে। শরৎ সাহিত্যে 'Conversation' ও dialogue' আলাপ ও বাক্‌চাতুর্য্য অতি অপূর্ব্ব এবং উপভোগ্য, সুতরাং চিত্রনাট্যে দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য রচয়িতাকে 'কথা' তৈরী করবার জন্য মাথা ঘামাতে হবে না, বই থেকেই সব পাওয়া যাবে। মুখের চিত্রনাট্যের আর একটা মস্ত সুবিধা 'Titles' বা চিত্র পরিচয়ের বড় একটা প্রয়োজন হয় না। কথা শুনে গল্প বোঝা যায়। কেবলমাত্র যেখানে 'সময়' বোঝাবার দরকার অর্থাৎ একটা ঘটনার পর দীর্ঘকাল কেটে গেছে, ছবিতে যখন তার পরের ব্যাপার দেখানো হবে—তখন ছবির Continuity বা পারম্পর্য্য রক্ষার জন্য 'Caption' বা ছেদ-পূরণ' ব্যবহার করা আবশ্যক। সুতরাং মুখর ছবির 'চিত্র-নাট্য' ষ্টেজের নাটক না হ'য়ে যাতে ছবিরই 'নক্সা' হয় সেদিকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার।

(ক্রমশঃ)

সুপ্তিভঙ্গে

শ্রীকালিদাস রায়

বিকালবেলা ঘুম ভেঙেছে
বসে আছি জানলা পাশে,
অকাল ঘুমের অলস আবেশ
তখন' চোখ জড়িয়ে আসে।
এলোমেলো মনটা আমার
তখনো ঠিক হয়নি জড়ো,
চিরপ্রাচীন সৃষ্টিটাকে
লাগ্‌লো হঠাৎ মিষ্টি বড়।

আজ মনে হয় গাছপালা মাঠ
সবই যেন চিত্রে আঁকা,
নিত্য দেখা দৃশ্যগুলি
সবই যেন স্বপ্ন-মাখা।
ঝুর্‌ঝুরে ঐ বাতাস যেন
কইছে কানে রসের বুলি।
ছায়া যেন মায়ার রূপে
চোখে বুলায় কাজল তুলী।

অপূর্ব্বতা পেয়েছ আজ
গাছের পাতা রঙ গড়নে,
নাম-না-জানা পতঙ্গেরা
দৃষ্টিতে মোর স্বপন বোনে।
শিউরে ওঠা শিরীষ তরু
অঙ্গে তাহার আলোকলতা,
কাঠবিড়ালী নাড়ছে মাথা,
তার সাথে কয় মনের কথা।
এক পলকো একটি ঠাঁয়ে
পক্ষী দুটি থির না থাকে,
দুইটি পাখীই পক্ষীভরা
করেছে ঐ বৃক্ষটাকে।
দুজন সুখে কূজন করে
পুচ্ছ নাচায় দোলায় গ্রীবা,
আদিম যুগের প্রেমের লীলা
আড়ি পেতে দেখ্‌ছি কিবা।
একটি ছোট ধব্‌ধবে মেঘ
দেখছি ভেসে যাচ্ছে দূরে,
সবুজ রঙের একটি ঘুড়ি
তাহার সঙ্গে সঙ্গে উড়ে।
চন্দনের ঐ ফোটা ও কি
শ্যামলা দিগ্‌বধূর ভালে ?
তাহার নীচেই একটি ছোট
তিল কি জাগে তাহার গালে ?
তাল নারিকেল কুঞ্জশিরে
আলোর লুকোচুরির ফাঁকি,
আকাশ-বধূর ময়ূরকণ্ঠী
ঢেলির আঁচল দুল্‌ছে নাকি ?
সোনার আলোয় জ্বল্‌ছে দূরে
ঝল্‌ছে বিলের বক্ষখানি,
দিনের ও কি পিছন পানে
চাউনি সজল—বিদায় বাণী ?
চরছে ঘোড়া দীঘির পাড়ে,
ঢেউ খেলে যায় তাহার লোমে,
সেই হরষের লহর লাগে
অঙ্গে আমার রোমে রোমে।
ভরা কলস আঁকড়ে কাঁখে
গ্রামের বধূ ফিরছে ঘরে,
মাঝে মাঝে চম্‌কে জাগে—
বাঁশ-বাগানে আড়াল পড়ে।
ওরা যেন ব্রজের গোপী
কবির স্বপন দিয়ে গড়া,
চলন ওদের নাচের মতন,
ঘট কি ওদের সুধায় ভরা ?
তৃপ্তি যেন মূর্ত্তিমতী
ধেনুগুলি ফির্‌ছে ধীরে,
লক্ষ্মীছাড়ার ঘরে যেন
লক্ষ্মী-শ্রীটিই আস্‌ছে ফিরে।
ঘুমঘোরের আবেশভরা
নয়নে আজ দেখ্‌ছি চেয়ে,
সৃষ্টি হাসে আমায় হেরে
নূতন কলেবরটি পেয়ে।
ঘুম ভেঙে আজ ঘুমের স্বপন
মন হ'তে কি বাইরে এসে
প্রাচীন ধরায় অভ্র দিয়ে
আড়াল করে বেড়ায় ভেসে ?
দণ্ড কয়েক অকাল ঘুমের
ব্যবধানের মধ্যখানে,
সৃষ্টি এমন বদ্‌লে যাবে
হয় না মনে—হয় না মানে।
দেহ মনের সব পরিজন
এখনো মোর কেউ না জাগে,
শুধু আমার চোখ জেগেছে
হঠাৎ আজি সবার আগে।
তাদের কোলাহলের মাঝে
যারে পাওয়া যায় না খুঁজি,
নেত্র আমার একলা পেয়ে
নিভৃতে তাই ভুঞ্জে বুঝি।

যাযাবর

শ্রীধূর্জ্জটি অধিকারী

১

বরিশাল এক্স্‌প্রেসের যাত্রী।

বিত্ত অধমের কোঠায়, বিন্দুবিশেষ—has position but no magnitude। কিন্তু যাত্রী মধ্যমশ্রেণীর। মানের কান্না নয়; স্বাস্থ্যের বালাই নিয়েই হয়রাণ। তৃতীয় শ্রেণীর কামরাগুলি বেঞ্চবর্জ্জিত হ'লেই Cattle van। তার উপর জর্দ্দার পিচ্‌কারি, চীনে বাদামের খোসা, মাছের ঝুড়ি, বিড়ি-সিগারেটের বাস্তু—অর্থাৎ তাল্লাকি অংশগুলির সমাবেশে স্থানটি এমনই মনোরম যে, তৈলঙ্গ স্বামীর কোঠায় না পৌঁছুলে সেখানে আসন পাতে কার সাধ্য। তাই দেড়া ভাড়ার দণ্ড। কিন্তু এও কিছু বৈকুণ্ঠ নয়—হাওড়া সহরের তুলনায় কাশীর বাঙ্গালীটোলা আর কি!

দেখি, আমারও আগে এসে একজন একখানি বেঞ্চে দখল জারি ক'রে গেছেন। দুটি সুটকেশ, শয্যাদ্রব্য, টিফিন-ক্যারিয়ার, গ্রামোফোনের বাক্স প্রভৃতির একটি ছোটখাটো স্তূপ—তারই মাঝে একটি বেতের ছড়ি প্রোথিত, আর তার উপর একটি শোলাহাট। যেন Polar Expeditionist বেওয়ারিস ভূমির উপর Union Jackএর প্রতিষ্ঠা ক'রে গেছেন। আমার লোটা কম্বল সামনের বেঞ্চে রেখে দু'একখানা কেতাবের সন্ধানে নেমে প'ড়লুম।

বুক্‌ষ্টলে এটা ওটা সেটা নাড়াচাড়া করছিলাম। ট্রেনের তখনো পনের মিনিট বিলম্ব ছিল। খর্ব্বাকৃতি, আগাগোড়া প্রায় গোলাকার একটি আধাবয়সী ভদ্রলোক ঐ একই অজুহাতে সময় কাটাচ্ছিলেন। পরণে হাফ্‌প্যাণ্ট, হোজ, অক্‌স্‌ফোর্ড সু, হাতকাটা আহ্লাদে শার্ট, আগাগোড়া খাকি—মায় গায়ের বর্ণটুকু পর্য্যন্ত।

মনে হ'ল স্বগতোক্তি, কিন্তু ক্রমশঃ কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল যে নিছক আত্মার তৃপ্তির জন্য বায়ুমণ্ডলকে বিক্ষুব্ধ করা নয়—আলাপ সুরুর উদ্দেশ্যে বাগুরা বিস্তারও বটে। বলছিলেন—

His Last Bow—Conan Doyle, হুঁঃ। Trash অর্থাৎ বাংলায় যাকে বলে গাঁজা। দেশী থিয়েটার দেখেছেন?

কেতাবের সমালোচনা থেকে থিয়েটার; নিজেকে বিশেষ অসহায় ব'লেই মনে হ'ল। কিন্তু পরক্ষণেই—

পাশেই জলজ্যান্ত বর্ত্তমান। অথচ অন্য দিকে চেয়ে পরিত্রাহি চীৎকার "সাবিত্রী কই—সনাতন! সাবিত্রী কই।" Conan Doyleও তাই মশায়। অথচ ওর জোরেই বাজীমাৎ ক'রে রেখেচেন—একেবারে স্যর্ (Sir)। Blue of the Twisted Candle—Edgar Wallace, Daughters of the night—Ditto—এঃ একেবারে জগন্নাথঘাটের সিঁড়ি যে রে বাবা। পাশাপাশি ব'সে গেছেন—শিবালয়—ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় অন্ধকার।

বুঝলাম—গাঁজারই বিস্তারিত ব্যাখ্যা চ'লেচে। তার পর সহসা একরকম আমাকে টেনেই নিয়ে চ'ল্‌লেন।

আসুন, আসুন। কেনবার মত কিছুই নেই। আমার কাছে যথেষ্ট বই আছে, দেব'খন। কোন্ ক্লাস? তিন দাঁড়ী না ত্রিশঙ্কু? ত্রিশঙ্কু বুঝলেন না? বাংলা পরিভাষা নিয়ে সাহিত্যিকদের প্রসবব্যথা উপস্থিত হ'য়েছে। কিন্তু Intermediate অর্থে মধ্যমশ্রেণী—দাস-মনোবৃত্তির চরম পরিচয়। মৌলিকতার সংজ্ঞা কি? আসুন আগে বসি গুছিয়ে, পরে বিশ্রম্ভালাপ করা যাবে।

দেখি, আমারই কক্ষের—room-mate। কিন্তু আমার স্থানটি ততক্ষণে বেদখল; অর্থাৎ আমার কম্বলের উপর এক অজানা—চৌদ্দপোয়া। আমার হাতব্যাগটি মাথায় দিয়ে বাংলা দৈনিকে আত্মহারা। অবশ্য কাগজখানিও আমার খরিদা সম্পত্তি। একটু থতিয়ে গেলাম। খাকি ভদ্রলোকটি ততক্ষণ কিন্তু চৌদ্দপোয়ার উদ্দেশে সুরু ক'রে দিয়েছেন—

মশয় শুন্‌চেন! আপনার নিবাস কুমিল্লায় নয়?

চৌদ্দপোয়া তিনপোয়ায় পরিণত হ'লেন অর্থাৎ উঠে

ব'সলেন। আর্ট-থিয়েটারি চুল-বিন্যাস। নাকটি একটু চ্যাপ্টা, চোখ দু'টি ছোট ছোট। কর্ণযুগলের প্রথমার্দ্ধ পোকাধরা বেগুনপাতার মত কুঁকড়ে গেছে—হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন দু'কাণ-কাটা। ছোট ছোট চোখ দু'টি যথা-সম্ভব বিস্ফারিত ক'রে চেয়ে রইলেন। খাকি নাছোড়বান্দা—ব'লতে লাগলেন—

বলুন না মশয়—নিবাস আপনার কুমিল্লায় নয়?

আজ্ঞে—কাছাকাছি। নয়নপুর। আপনি—

আমি জান্‌লুম কি ক'রে? হ্যঃ হ্যাঃ হ্যাঃ। এ খাটো খদ্দরের পাঞ্জাবী অভয় আশ্রমের নিশ্চয়। কাপড়খানা বঙ্গচন্দ্র পালের দোকান থেকে নিয়েচেন, কি বলেন? আগাগোড়া খদ্দর কুলিয়ে উঠতে পারেন নি। বুঝেছি, বুঝেছি।

কানকাটা ভদ্রলোক একেবারে থ।

কিন্তু খদ্দরের পাঞ্জাবি আর বঙ্গচন্দ্রের কাপড় আপনাকে ধরিয়ে দেয়নি। আমি পথ চলি চোখ চেয়ে—যখন চ'লতেই হ'বে, তখন তা ছাড়া নান্যপন্থা। আর তা নইলে মজাও নেই বুঝলেন।

শেষের লাইনটি আমাকেই নিবেদন করা হ'ল।

হ্যাঁ, তার পর কতদূর চ'লেচেন? বরিশাল। তা বেশ। বিছানাপত্র কিছুই ত' দেখচি না। এক কাপড়েই বেরিয়ে প'ড়েচেন। সদানন্দ পুরুষ—বসুধৈব কুটুম্বকম্। একেবারে পরমাত্মীয়ের মত পাতা বিছানায় গা ঢেলে দিয়েচেন। খবরের কাগজখানিও বোধ হয় এই ভদ্রলোকের। হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানা আছে, জানা আছে। দুটো পয়সাও বিদ্যা-সাগরকে ফাঁকি দেন আপনারা। নামটি কি?

কাণকাটা—আজ্ঞে নাগেশচন্দ্র বল্। কিন্তু বিদ্যা-সাগরকে ফাঁকি দেওয়ার অর্থটা বুঝলাম না।

খাকি—সোজা কথা—তরলং। দু পয়সা খরচ হ'বে ব'লে একখানা প্রথম ভাগও কিনে পড়েন না কস্মিন্‌কালে। আহা বসুন বসুন, চ'টবেন না।

নাগেশচন্দ্র কিন্তু সে গাড়িই পরিত্যাগ ক'রলেন। কিছু পরেই গাড়ির চলা সুরু হ'ল।

২

খাকি পরিচয় দিলেন। শুনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। মনে হয়েছিল টিক্‌টিকি। তা নয়—আমারি মত খিলাতী ফিরিওয়ালা, কোন ইংরাজ কোম্পানীর Traveller। সারা পূর্ব্ববঙ্গে টহলদারি করেন। যে কোম্পানীর নেমক খান, তাঁরই মহিমা প্রচার ক'রে বেড়ান। নাম—কলিজাপ্রসন্ন সরকার। নামটায় Hindu-Moslem pactএর গন্ধ কেন, নিজেই ব্যাখ্যা ক'রলেন। যথা—দূরদৃষ্টি মশায় দূরদৃষ্টি। সাত টাকা মাইনের জেটি সরকার হ'লে কি হয়, বাবার আমার ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টি বাপুদেব শাস্ত্রীকেও হার মানিয়ে দেয়। ব'লতেন, সাত টাকা সাতাশ বৎসরে ছত্রিশ টাকায় উঠেছিল রে বাবা। আর নিবারণ মল্লিকের ব্যাটা য়্যালবিয়ন রয় আমারি য়্যাক্টিনি ক'রতে এসে তিন বৎসরের মধ্যে পনের থেকে সাড়ে তিনশোয় ফোরম্যানিতে পাকা হ'য়ে ব'সল। আরও পাঁচ বর্ষার পর একেবারে য়্যাকাউন্‌ট্যাণ্ট—সাড়ে বারশোর গ্রেড্। তাই অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এই নাম-করণ—নইলে তোর মা ত' রেগেই খুন। ব'লত, কুলদা রাখলেই কি মহাভারত অশুদ্ধ হ'ত। যখন সাহেবের ঘরে Slip পাঠাবি, লিখবি "Coolidge Pershing Sircor" একশোর কম First appointment দিতে ভরসাই ক'রবে না। হয়েছিলও তাই। কিন্তু সইল না। তবে জেল খাটতে হয় নি, এই যা। পিতৃপুরুষের পুণ্যের জোর ছিল, আর হয় ত বা—

লাইনটি অসমাপ্তই র'য়ে গেল। পাশের কামরায় বোধ হয় একটা বিপ্লব সুরু হ'য়েছিল। হৈ হৈ চীৎকার। গাড়ি থেমে গেল—চীৎকারের কেরামতি নয়, বারাসাত ষ্টেশনের খাতিরে।

এবার ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ হল। পাশের কক্ষে এক ভদ্রলোক স্ত্রীকন্যা নিয়ে যশোহর চ'লেচেন। পুরুষ-কামরা। দু'পাশে দু'খানি বেঞ্চ। ভদ্রলোক একখণ্ড চীনে চাদর মাঝামাঝি টাঙ্গিয়ে দিয়ে কামরাটিতে সদর-মফস্বলের ব্যবস্থা ক'রে নিয়েচেন। শিয়ালদহে কামরার মুখ ছিল পশ্চিমে, সুতরাং ভদ্রলোক সেই দিকের বেঞ্চেই সদর প্রতিষ্ঠিত ক'রেছিলেন। কিন্তু শিয়ালদহের পরবর্ত্তী ষ্টেশনগুলির অবস্থান-ভেদে বারেবারে ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন অসম্ভব বিধায় ভদ্রলোক মফস্বলের দরজা জানালাগুলির উপর martial law জারি ক'রে দিয়েছিলেন—সব

বন্ধ থাকবে। চলতি ট্রেণে চোর-প্রবেশের রেওয়াজ আছে বটে, কিন্তু লম্পট-প্রবেশের কথা ইতিহাসে পড়া যায় না। তখন অপরাহ্ন—সদরে কর্ত্তা সজাগ, অন্দরে গিন্নী। তাই বোধ হয় মেয়েটি মাত্র একটি জানালা খুলে দিয়েছিলেন। অপরাধ এই। ভদ্রলোক রাসভ-চীৎকার জুড়ে দিয়েছিলেন—হুঁস নেই যে সেটা ট্রেন, তাঁর অন্দর-মহল নয়। তখন উত্তরখণ্ড সুরু হয়েছে। ভদ্রলোক ব'লছিলেন—

দশ হাত কাপড়ে ন্যাংটার জাত্। ধাতে ময়লা—কার বাপের সাধ্যি তোমাদের সিধে রাখে। শ্যামবাজার থেকে পটলডাঙ্গা, সেখান থেকে তালতলা, পরের মাসেই উল্টোডিঙ্গী—বাড়ী পাল্টাপাল্টি ক'রে হয়রাণ—ছাতে ওঠা রদ্ ক'রতে পারলুম না। কোল্‌কেতা—নিকুচি ক'রেছে কোলকেতার—সদরে চাবি বন্ধ ক'রে বাবুরা অফিস বেরুলেন, যেন লক্ষ্মণের গণ্ডী টেনে দিয়ে গেলেন। আর ছাতের ওপর দিয়ে যে সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল সেদিকে হুস নেই। লোকে ঘুস দিয়ে কোলকেতায় য়্যাক্টিনি ক'রতে পেলে বর্ত্তে যায়—আর আমি শালা ঘুস দিয়ে যশোরে বদ্‌লি হ'চ্ছি।

রেলের খালাসী, ক্রু, যাত্রী, পানি-পাঁড়ে, চা-মিঞা প্রভৃতির একটি ছোটখাটো জনতা মজা দেখ্‌ছিল। স্ত্রী-লোকটি কাপড়কুণ্ডলী হ'য়ে এক কোণে ব'সে ছিলেন এবং পাঁচ ছয় বৎসরের শিশু কন্যা মা'র কোল ঘেঁসে ভয়চকিত দৃষ্টিতে বাপের পানে চেয়ে ছিল। দৃশ্যটা ক্রমে অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌ছিল; নিজের কামরার দিকে ফিরছিলাম—খাকি ইসারায় নিষেধ ক'রলেন। আবরুবাজ কামরা রিজার্ভ করেন নি, বে-পরোয়াই ছিল। বারাসাতে তিন মিনিট গাড়ি থামে। গোলমালে খেয়াল ছিল না—হঠাৎ গাড়ির চলা সুরু হ'তেই কলিজা সেই কাম্‌রাতেই উঠে প'ড়লেন এবং আমাকেও পাছু নিতে হ'ল। গাড়িতে উঠেই কলিজা আরম্ভ ক'রলেন—

Emergency মশয়—মাপ ক'রবেন। পরের ষ্টেশনেই নেমে যাচ্ছি।

অন্দরের আসনেই ব'সে প'ড়লেন। আমি দ্বারের পাশেই দাঁড়িয়ে রইলাম। আসন গ্রহণ ক'রেই সুরু ক'রলেন—

আপনি মশয় যদি এই মাঝখানটিতে বসেন তাহ'লেই আমার দিকটা neutral ground হ'য়ে পড়ে।

ভদ্রলোক কলিজার দিকে একবার ভস্মলোচন ছেড়ে তাই ব'সলেন।

কলিজার বিরাম নেই।—

দেখুন মশয়, দম্পতী-কলহ কালিদাসের আমলেও বেশ কায়েমী ভাবে এ দেশে ছিল। ইতিহাসের পাতায় তো ইতরে জনার স্থান নেই; আর রাজা-রাজড়ার হাঁড়ি হঠাৎ হাটে ভাঙ্গা যায় না। তাই কাব্য বা উপন্যাসের শরণ নেওয়া। মুঘল-বাদশাদের চক্ষু-লজ্জার বালাই ছিল না—ইতিহাসে অমর হ'য়ে আছেন। কিন্তু আপনি ত' হিন্দু! রামচন্দ্রের নজির আছে বটে—কিন্তু সে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা, তখন বানর জাতিরও সমাজে হুঁকো মিল্‌তো।

কাসির অছিলায় জানালার বাইরে মুখ বা'র ক'রে হাসি গোপন ক'রলাম।

কলিজা—গাম্ভীর্য্য সুরুতে একটা pose মাত্র, তার chronic অবস্থার পরিচয় হ'ল habit। আবার তারই মল্লিনাথ হ'ল—second nature। কিন্তু Diversion ব'লে একটা কথা আছে। ছেলে-ভুলানো একটা গল্পে প'ড়েছিলুম, বিষম রাগ হ'লে এক থেকে এক শো অবধি গুণতে আরম্ভ ক'রবে। এর তলেও ঐ principle of Diversion ছাড়া আর কিছুই নেই। Diversion ভাল মশয়, ভাল। বদ্ধ পাগলের জন্য এটাই হ'ল পরম ব্যবস্থা।

"Rascal"—Boilerএর safety valve চকিতের জন্য খুলে দিলে যেমন একটা শব্দ হয় তদনুরূপ একটু আওয়াজ।

কিন্তু কলিজার হেল্‌দোল্ নেই। নির্ব্বিকার চিত্তে ব'লে যেতে লাগ্‌লেন—

তামাম কোলকেতা শহর উঠোন ক'রে ফেলেছেন—নিরাপদ স্থান দিক্‌চক্ররেখার মত পিছিয়েই গেছে। শেষে যশোর নগরীকে ভাগ্য-পরীক্ষার ক্ষেত্র ক'রলেন। বড় সুবিধা হ'বে মনে হয় না। Gratis adviceএর গুরুত্ব নেই—হয় ত' এ কাণ দিয়ে প্রবেশ ক'রে অন্য কাণ দিয়ে বেরিয়ে যাবে। তবুও বলি। কোন্ জেলা? হুগ্‌লী না বর্দ্ধমান? তা যেখানেই হ'ক—কাঁঠালগাছ দেখেছেন বোধ হয়। পশ্চিম-বঙ্গের কাঁঠালগাছ মশয়—পূর্ব্ববঙ্গের নয়—সেখানে অত বাঁধাবাঁধি নেই। কাঁঠাল পাকবার

প্রাক্কালেই জ্ঞানী ব্যক্তিরা গোড়া থেকে অন্ততঃ ছ'সাত হাত উপর পর্য্যন্ত বাব্‌লা কাঁটার ব্যবস্থা করেন—শৃগাল প্রভৃতি পরস্বলোভী পশ্বাদির দুশ্চেষ্টা ব্যর্থ করবার ফিকির আর কি। Chittagong Hill Tracts নাম শুনেছেন বোধ হয়। সেখানে অল্পায়াসে কিছু বন ইজারা পেতে পারেন। গাছের ওপর কুটীর নির্ম্মাণ—বাব্‌লা কাঁটা—আর একখানি দড়ির সিঁড়ির ব্যবস্থা—ব্যস্।

পরের ষ্টেশন এসে পড়ার দরুণ হাতাহাতিটা আর হ'ল না। নিজেদের কামরায় যাবার আগে কলিজার বিদায়-সম্ভাষণটুকু কিন্তু আবরুবাদী লোকটিকে বিস্মিত ক'রল—

আবগারি বিভাগের মগজের মধ্যে একটা কথা দিনরাত জ্বল জ্বল ক'রছে—"Illicit"। কিন্তু মেয়েদের সাতপাকের বাঁধনের বাইরেও দু একজন থাকে যাদের সঙ্গে মাথামাথির মানে Illicit Love নয়ই নয়—বুঝলেন। এখনই যদি আপনার গিন্নীকে সুশীলা ব'লে ডাকি, সে ঘোমটা ত' খুলবেই—পানের খিলিও একটা দিতে পারে। কি বলিস রে সুশীলা—আহাম্মকটার কাণ ম'লে দিয়ে পরিচয়টা দিয়ে দিবি তো।

মিহিসুরের মোলায়েম আওয়াজ এল—সরকার মশাই—খাকি ফিরলেন।

৩

নিজের কামরায় ফিরে এসে দেখি, আসন জোড়া ক'রে দুই ম্যাওয়া। গায়ের গন্ধে থাইসিস সারে। দুই পাগ্‌ড়ীতেই দু'শো গজের ধাক্কা। অনেক দুঃখেই আমানুল্লা সাহেবিয়ানা পোষাকের পক্ষপাতী হ'য়ে প'ড়েছিলেন—অন্ততঃ পাগ্‌ড়ীর আওতায় প'ড়ে কাবুলী মগজটা বিগড়ে যাবার সম্ভাবনা আর থাক্‌তো না। একজন গোঁফে তা দিচ্ছিলেন, আর একজন দাড়ী চোম্‌রাচ্ছিলেন। আমাকে দেখেই দু'জনের চোখে চোখে কি ইসারা হ'য়ে গেল। কলিজা তখনো ফেরেন নি, বোধ হয় পাশের গাড়িতে সদর-মফস্বলের শান্তি-বৈঠকে পান-তামাক দুই-ই মিলেছিল। ইসারার পর কি আকারিত হ'য়ে ওঠে দেখবার জন্যে আগ্রহ ক্রমেই ঘনিয়ে উঠ্‌ছিলো। মিনিট কয়েক পরেই গোঁফবিলাসী ব্যক্তিটি কাবুলী বাংলায় সম্ভাষণ ক'রলেন—

এঃ বাব্ব্! খোল্‌না কঃ বাজ্জে পৌঁচ্ছা? ক্যতনা? সাড়ে'চ্ছ?

তার পর দেশওয়ালী ভাষায় সঙ্গীকে কি ব'ললেন, আমার মনে হ'ল "কামস্কাট্‌কা"। সঙ্গীর উত্তরটা শোনালো, "খাগ্ন খাস্‌তো খা না খাস্‌তো গ্ন"।

কথা কওয়া ত' নয় যেন করাত চালানো। ঐ ভাষায় নবদম্পতীর মধুমিলনের প্রথম আলাপ কেমন জমে কে জানে।

বাথরূম—কথাটা শোনায় ভাল—নইলে ইণ্টার ক্লাসের বাথরূম ব'লতে যা বোঝায় তা'র বাংলা তর্জ্জমাটায় পর্য্যন্ত দুর্গন্ধের দৌরাত্ম্য। বাথরূম থেকে বেরিয়ে এলেন আর এক মূর্ত্তি। জেগেই ছিলুম—নইলে মনে হ'ত নৃসিংহ অবতারের স্বপ্ন দেখ্‌ছি। ইয়া দাড়ী-গোঁফের সমারোহ—চুলগুলির সমাবেশ এমনই যে ঝড়-বিধ্বস্ত ধানক্ষেতকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। মাথায় লম্বা লম্বা তামাটে জটা—যেন কণ্টিকারীর বন। গলায়, দুই বাহুতে রুদ্রাক্ষের মালা। গায়ে বস্ত্রের বালাই নেই—লোম প্রাচুর্য্য সে অভাব মিটিয়েছে। তবে কটিদেশ হ'তে হাঁটু পর্য্যন্ত, একখণ্ড গেরুয়া পাঁচ আইনকে ঠেকিয়ে রেখেছে। হাতের আঙ্গুলে লম্বা লম্বা নখ। তেমন মেধাবী আইন-সচিবের পাল্লায় প'ড়লে অস্ত্র-আইনের কবলে আস্‌তেন। দাড়ি-গোঁফের তরঙ্গের মাঝে নাসিকাটি শুশুকের মত যেন ক্ষণিকের জন্য ভেসে উঠেছে—তলিয়ে গেল ব'লে। একটি মাত্র চক্ষু। আর একটি, শুক্‌নো ডোবার মত চিহ্নমাত্রে পর্য্যবসিত। ক্রমশঃ এগিয়ে এলেন কাল-বোশেখীর মেঘের মত। চেহারার চটকে কাবুলীযুগল পর্য্যন্ত থ। একচক্ষের দৃষ্টি আমারই ওপর প্রসন্ন। খাড়া অবস্থাতেই কথা সুরু ক'রলেন—

আপ্‌নে বাবুজি বঙ্গালি আছে, আপ্‌নে বোঝ্‌বেন। বিদেশী জাত রাজতক্ত পাইয়েছেন, সাধু ফকিরকোভি পাশ পয়সা মাঙ্গ্‌ছেন। ইয়ে কলি, পূরা কলি দেওতাকো প্রভাব। অন্যথা আপ্‌নে কব্‌ভি পোড়েছেন, শোনেছেন সাধু-সন্ন্যাসী কোড়ি দেকর্ এক শওহরসে দুসরা শওহরমে যাইছেন। পরণে নোকর আপ্‌নে বঙ্গালি বাবুমণ্ডলী ভি ভেড়ুয়া বনে গিয়েছেন। আপ্‌নে বোল্‌বেন ইয়ে রেল্‌কে চোড়্‌কে কেনো যাইছেন—পাঁওদলমে যাইলে কোড়ি

লাগ্‌ছে না। পাঁওদলের সড়ক রাখ্‌ছেন যে যাইবো? ফুটাফাটা সড়ক। একটা গাছভি নেহি যে বিশ্রাম করি। একঠো কুয়াভি নেহি যে তিয়াসকা জল মিলি। নালা খালামে একঠো লাওভি নেহি যে ইস্‌পারসে উস্‌পার যায়ি। সড়কে সে কেমোন কোরে যাইবন। বোলেন—একঠো বাত তো বোলেন।

কিন্তু সাধুসঙ্গ বেশীক্ষণ অদৃষ্টে নেই—বাত্ বোল্‌বার অপেক্ষা সইল না। ষ্টেশন কাছে এসে পড়ায় গাড়ীর গতি মন্দীভূত হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে সাধু মহারাজ বাথরুমে প্রবেশ ক'রলেন। হয় তো কলিকাতা থেকেই এই লুকোচুরির সুরু। মাথার ওপর হঠাৎ ধ্বনি, "ইচ্ছে হয় কাণ ধ'রে এনে দেখিয়ে দিই"। তাজ্জব! Bunkএর ওপর একজন। কখন অধিষ্ঠিত হ'য়েছিলেন এবং কলিজার Kitsএর মাঝখানে কেমন ক'রে যে আত্মগোপন ক'রেছিলেন ঈশ্বর জানেন। দশ পনের মিনিট কামরাতে ছিলাম না, এরই মধ্যে আম্‌দানি, না কলিজার মালপত্রের সঙ্গে Smuggled হ'য়ে এসেছিলেন বুঝতে পারলুম না। পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসরের যোয়ান ছোক্‌রা। গৌরবর্ণ, নাসিকার ডগে একটুকরো গোঁফ, জোড়া ভ্রূ, দিব্যি আয়ত চক্ষু। অঙ্গের বাকী অংশটুকু আধময়লা শয্যাস্তরণে ঢাকা। বললুম—

ধরা প'ড়লে এর চেয়ে আর বেশী শাস্তি কি হ'বে মশাই। বাথরুমে বন্দী। জরিমানা দেবার সম্বল নেই, দু'দশ দিনের কয়েদ হ'বে। পাঁচ ছ' ঘণ্টা নরকবাসের চাইতেও সে কি বেশী শাস্তি?

আহা তা নয়। তা নয়। Railway দেশের নৈতিক চরিত্র কতখানি অবনত ক'রেছে Railway পাণ্ডাদের সাম্‌নে এই সাধুকে হাজির ক'রে দেখিয়ে দিই। হাঁটা রাস্তা লোপাট, পয়সা ফেল, পায়ের ওপর পা দিয়ে ব'সে এ-গাঁ ও-গাঁ যাওয়া-আসা কর। না থাকে, চুরি কর, মোদ্দা রেলে যেতেই হ'বে। হাত পা থাক্‌তে জগন্নাথ। এ তো গেল এক দিক। পল্লীগ্রামের ধান দুধ মাছ তো চুরি ক'রছেই—মানুষ পর্য্যন্ত চুরি ক'রছে এই রেল। ক'লকেতায় আজ যারা জলজীয়ন্ত তারা তো চোরাই মাল মশাই। এই রেল তাদের চুরি ক'রে এনে গাফ্ ক'রেছে। গাফ্—একেবারে বেমালুম। এমন বেমালুম যে আজ দেশ যদি তাদের দাবি করে, সেটা হ'বে দেশের বেয়াদবি; আর যদি জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যায়, সেটা হ'বে বাটপাড়ি। তার পর দেখুন আর এক দিক।

ব'লতে ব'লতে উঠে ব'সলেন।

যারা চাষ ক'রতো তারা হ'য়েছে চাপ্‌রাশী; ফলে মাঠ হ'য়েছে বন কি ভাগাড়; ম্যাঞ্চেষ্টার হয়েছেন দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা; Gillete Blade আর Hair cutting Saloonএ দেশ ছেয়ে গেছে। মাছ নিঃশেষ, Director of Fisheries আছেন—খান্, কত খাবেন। গোয়ালিনীর মার্কা দেখিয়ে পুত্রকন্যাকে সন্তুষ্ট করুন। তেল—যারা ক'লকেতা খুঁজুন, সর্ব্বত্রই "এখানে ভেজাল মিশ্রিত তৈল পাওয়া যায়"—খাঁটি সর্ষের তেল কি প্রত্নতত্ত্বের সামিল না কি? আরে মশাই, এইখানেই কি ইতি?

ব'লতে ব'লতে নেমে এলেন। খদ্দরের কাপড়, বেনিয়ান। দিব্যি পেশী-বহুল সটান চেহারা।

তখন বর্গী আস্‌তো—হাঁটা-পথে পালে-পার্ব্বণে লুঠ করলো—চৌথ আদায় করলো—ব্যস্ প্রস্থান। এখন বর্গীর হাঙ্গামা ডাক্তার-উকীল-কাবুলী-গঠিত একটা বিরাট চমূ। শেষ নেই, ফাঁক নেই, দিন নেই, ক্ষণ নেই—বারো মাস, চব্বিশ ঘণ্টা লুঠছে—হাড়মাস চিবিয়ে খাচ্ছে; —এই রেলের কল্যাণে। এই যে দুব্যাটা চলেছে—জিজ্ঞাসা করুন, কাকে পাঁচ টাকার বিনিময়ে পঞ্চাশ টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখিয়েছে, এখন হয় ত গরু-বাছুর, জরু পর্য্যন্ত খুইয়ে সে খত তাকে ফিরিয়ে নিতে হ'বে। দুখানা গাড়ির পরেই ফাষ্টক্লাসে চ'লেছেন ডাক্তার বর্ণচোরা রায়—যশোরে; আমাশায় শলা চালাবেন, ৬৪০৲ টাকা মাথট। রিজার্ভ সেলুনে চ'লেছেন রক্তচক্ষু সরখেল য়্যাভভোকেট—বরিশাল; গরু চুরির মোকর্দ্দমা—দৈনিক ৩৫০০৲ চাঁদির জুতি গ'ণে নেবেন। আর ওঁরা—যাঁদের নাম করতে ভয় হয়, তাঁরা তো লাখে লাখে—যেন ময়মনসিংহের মশা—কি মার্টিনের রেলের ছারপোকা—রক্ত নেবেই, আপনি যতই কেন সাবধান হোন না।—এই যে, যশোর। আসি মশায়, নমস্কার। এক জায়গায় ডাক প'ড়েছে। একবার মা'র পায়ের ধুলো নিতে চ'লেছি। দেখা হয় তো, এই শেষ কিংবা এই সুরু। আসি, নমস্কার।

নেমে প'ড়লেন।

প্লাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে আবার একবার বিদায়-সম্ভাষণ—মনে মনে হয় তো ভাবছেন পাঁচ মিনিটে পাঁচশো কথা ক'য়ে গেল, ছোকরা বড় বক্তার; আর কথাগুলোর মধ্যে বস্তু কিছু নেই। কিন্তু কথাগুলোকেই বড় ক'রে নাই দেখ্‌লেন। কবি-সমাজে একটা প্রবচন আছে—দুটো লাইনের মুখোস প'রে যে দ্রব্যটা প্রচ্ছন্ন হ'য়ে আছে সেইটাকে আবিষ্কার করাই কেরামতি। কিন্তু সকলেই কিছু কবি নন। কবি-সমাজের বাইরেও একটা জগৎ আছে, সেখানকার মত এই যে, সত্য অপ্রকাশ থাকে না—ধরা প'ড়বেই এবং তার জন্য বিশেষ কিছু কেরামতির দরকার নেই; তবে সময়-সাপেক্ষ হ'তে পারে। কখনো বা হাতে-হাতেই ধরা পড়ে, কখনও বা লগ্ন ব'য়ে গেলে। এ ক্ষেত্রে, আমাকে বক্তারই ভাবুন আর রেলওয়ে-বিরোধী আহাম্মকের কোঠাতেই পৌঁছে দেন, আমার মধ্যে সত্যিকার যে মানুষটি বর্ত্তমান তাকে চিন্‌বেনই চিন্‌বেন। আমি তখন হয় তো আপনার দৃষ্টির পরিধির বাইরে চ'লে গেছি এবং সে চেনায় আমার কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি না হ'বারই সম্ভাবনা, তবে আপনার বুদ্ধির পরিমাণ যে বাড়বে সে বিষয়ে সন্দেহ পর্য্যন্ত নেই—হাঃ হাঃ হাঃ। আসি—নমস্কার।

চ'লে গেলেন। ভ্রমণ-প্রতিযোগিতায় যে গতিটাকে চলার গতি বলা হয় সেই ছন্দেই গেলেন। আমার মতে কিন্তু সেটা চলন নয়—ধাবন। শেষের ক'টি কথা কেমন যেন বেখাপ্পা ঠেক্‌লো। রেলসম্বন্ধে বেশ বৈরীভাব পোষণ করেন—বেশ বোঝা গেল। কিন্তু এ ছাড়াও ওঁর ভিতর সত্যিকার কি আছে যেটা জান্‌তে পারলে আমার বুদ্ধির পরিমাণ বেড়ে যাবে—এ তো ধারণাতেই এল না। Humbug!

"এঃ বাব্বু!"—পয়লা নম্বরের কাবুলী আলাপচারীর উপক্রম ক'রলেন। "আপ্‌কে বেকুফ্ বনায়া—ভাগ্‌নেবালা আদ্‌মী choor হ্যায়।"

য়্যাঁ! চ'মকে উঠ্‌লুম। চোর? তাই তো—কলিজার সুটকেশের চাবি খোলাই তো বটে। সর্ব্বনাশ!—"এতনা ঘড়ি কাহে নেই বোলা?"

"ক্যা জরুরৎ?"

তা বই কি—তুমি তো আর—। যাক্, কলিজা এসে প'ড়লেন। নির্ব্বিকার মানুষ। সব শুনে, একটু হাসলেন মাত্র। বললেন—

ওর ভেতর সত্যিকার মানুষটি হচ্ছে 'চোর'—যিনি হাত ফস্কে পালিয়ে গেলেই বুদ্ধি বাড়ে—ইতি প্রবাদবাক্য। হাঃ হাঃ হাঃ।

গুম্ হ'য়ে রইলুম।

খুলনায় গাড়ি পৌঁছে গেছে, কিন্তু আমাদের গেরো কাটেনি। ট্রেণের কামরা হ'তে বা'র হ'বার উপায় নেই। দ্বারপথের এক প্রান্তে কাবুলীযুগল পশ্চিমাস্যে নমাজ সুরু ক'রে দিয়েছিলেন, অন্য প্রান্তে নৃসিংহাবতার পূর্ব্বমুখে প্রাণায়ামে ব'সেছিলেন। কলিজার স্ফূর্ত্তি দেখে কে। বলছিলেন,

আফ্‌শোষ। আলো নেই—একটা snap নিতুম। শাস্ত্রে বলে একত্রে সাতপদ মাত্র ভূমি অতিবাহিত ক'রতে পারলে মৈত্রীর দাবী যমেও রদ ক'রতে পারে না। ক'লকেতা হ'তে খুলনা এক সঙ্গে পাড়ি—কিন্তু বরিশালের ষ্টীমার তো ধর্ম্মসম্মেলনের মর্য্যাদা রাখবে না। অথচ, ধর্ম্মেও হাত দিতে পারি না!

আমি শায়েস্তা খাঁর পথ অবলম্বন করার পরামর্শ দিলাম —গবাক্ষ-পথ। কলিজা ব'লেন—অণিম-লঘিমা আদি কায়দা-কানুনগুলো জানা থাক্‌লে এই বপু সত্ত্বেও না হয় আপনার পরামর্শটা risk করতাম। অন্ততঃ আপনি নেমে প'ড়ে কাজটা অর্দ্ধেক এগিয়ে রাখুন, অচল লাগেজ-গুলো চালান ক'রে দিন।—সচল লাগেজ পরেই যাবেন। বেশী দেরী হ'বে না;—টিকিট-কলেক্টারদের অধ্যবসায় বেশী নয়, তাঁরা ষ্টেশনের গেট ত্যাগ ক'রলেই ধর্ম্ম-সম্মেলন ভেঙ্গে যাবে। আপনি ষ্টীমারে উঠে খান্‌সামাকে দুটো পুরো ডিনারের কথাই ব'লে দেবেন বুঝলেন;—ও নিরামিষে আমার আস্থা নেই।—হ্যাঁ সেকণ্ড্ ক্লসে বৈ কি। ষ্টীমারে ত্রিশঙ্কুত্বে বালাই অনেক—পয়লা নম্বর হচ্ছে—আচ্ছা সে বর্ণনা পরে হবে'খন।—আপনি অগ্রসর হোন্।

ইরাক

শ্রীভারতকুমার বসু

ইরাক-দেশটী এশিয়ার পশ্চিম-প্রান্তে অবস্থিত। দেশটী আয়তনে ছোট হ'লেও ঐতিহাসিক দিক দিয়ে এর খ্যাতি অন্য যে-কোনো দেশের চেয়ে কম নয়। ইসলাম যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে এর বুকের উপর দিয়ে অনেক রাষ্ট্রবিপ্লব ও ধর্ম্মবিপ্লবের প্রবল স্রোত ব'য়ে গেছে। বিগত মহাসমরের সময়ও সেখানে তুর্কী সরকার ও ইংরাজদের মধ্যে একটা বিশেষ বোঝাপড়া হ'য়ে গেছে। মেসোপোটেমিয়া নামে এই দেশটি সব যায়গায় পরিচিত। সেখানকার প্রাকৃতিক

আরব অভিজাত

বিশেষত্ব মোটেই উপভোগ্য নয়। দক্ষিণে ও পশ্চিমে আছে —আরব ও সিরিয়ার ধূ-ধূ মরুভূমি। মরুভূমির মতো হ'লেও, ইরাক কিন্তু আরবের মতো নয়। ইরাকের ভিতর দিয়ে ব'হে গেছে—তাইগ্রীস্ ও ইউফ্রেটিশ নদী। এর উত্তর ও পূর্ব্ব দিকে র'য়েছে জিমেন ও জেব্রেল পর্ব্বত। উভয় নদীই মিলিত হ'য়ে প'ড়েছে পারস্য উপসাগরে। এই জন্যই আরবের তুলনায় ইরাক হচ্ছে বসবাস ও চাষবাসের পক্ষে অনেক বেশী উপযুক্ত স্থান। কিন্তু তা ব'লে সেখানকার উত্তাপের পরিমাণ কম নয়! উত্তাপ ১১২ থেকে ১২৩ ডিগ্রি পর্য্যন্ত ওঠে। মেসোপোটেমিয়ার যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যাঁরা ইংরাজের স্বপক্ষে যুদ্ধ ক'রতে গিয়েছিলেন, তাঁরা ওই উত্তাপের প্রতাপ হাড়ে-হাড়ে বুঝেছিলেন। দারুণ গ্রীষ্মে সামনে নদীর জল থাকলেও তার জল ব্যবহার করবার হুকুম ছিল না। এমন কি, এই রকম আদেশ জারী করা হ'য়েছিল যে, যদি কেউ নদীর জল ব্যবহার করে তা হ'লে তাকে তৎক্ষণাৎ 'গুলি' ক'রে মেরে ফেলা হবে। সরকার থেকে জনপিছু আড়াই পাউণ্ড জল দেওয়া হ'তো। এই জলের দ্বারা স্নান-পান ইত্যাদি সমস্ত কাজই শেষ ক'রতে হবে। সোডাওয়াটার দেওয়া হ'তো বটে, কিন্তু তাতে জলের অভাব কি মেটে?

নদীর জল ব্যবহার ক'রতে দেওয়া হ'তো না, কারণ শত্রুপক্ষীয়রা যদি তা বিষাক্ত ক'রে দিয়ে থাকে—এই ভয়ই ছিল ভয়। যুদ্ধের পর ইরাক, তুর্কীদের অধীনতা পাশ ছিন্ন ক'রে, নিজেকে স্বাধীন দেশ ব'লে ঘোষণা করে। হেজাজের রাজার তৃতীয় পুত্র এমীর ফয়জল্‌কে সর্ব্বাদি-সম্মতিক্রমে রাজা ব'লে মেনে নেওয়া হ'লো। তবে রাজ-নৈতিক ও যুদ্ধ-বিগ্রহাদি ব্যাপারে ইংরাজের পরামর্শ নিয়ে চ'লতে হবে, এই রকম স্থির হয়। ১৯২১ সালে রাজকার্য্য ভাল ক'রে চালাবার জন্য মন্ত্রীসভা গঠন করা হয়।

ইউফ্রেটিশ নদীর পূর্ব্ব দিক থেকে বরাবর দক্ষিণে বসোরা পর্য্যন্ত কেবল একটানা মাঠের পর বিস্তীর্ণ মাঠ,—বালি ধূ ধূ ক'রছে। তার মধ্যে মধ্যে খেজুরগাছের সারি। এই একঘেয়ে ভাবে চ'লতে থাকলে, মনে স্বভাবতঃই অস্বস্তি বোধ হ'য়ে থাকে। এই অংশেরই নাম মেসোপোটেমিয়া।

সেখানকার গাছপালা ব'লতে খেজুর গাছকেই বোঝায়। এত খেজুর সেখানে জন্মায় যে, তা বলা যায় না। খেজুরই

সেখানকার প্রধান ও সুলভ কৃষি-জাত ফল। ইরাকবাসীরা এই খেজুর খেতে—ভালবাসেও যেমনি, তা বিদেশে চালান্ ক'রে অর্থ অর্জ্জনও করে তেমনি। তারা খেজুরের পাতায় থ'লে তৈরী ক'রে, তার ভিতরে খেজুর রেখে, নিজেদের খালি এবং নোংরা শ্রীচরণ দিয়ে বেশ ক'রে চেপে চেপে ভর্ত্তি করে। এই সব থ'লে বিদেশে চালান হয়, এবং পৃথিবীর লোক সেই খেজুর তৃপ্তির সঙ্গে খায়।

সেখানে কাঁটা-জাতীয় এক রকম ঘাস জন্মায়। কাঁটাতে মুখ ক্ষত-

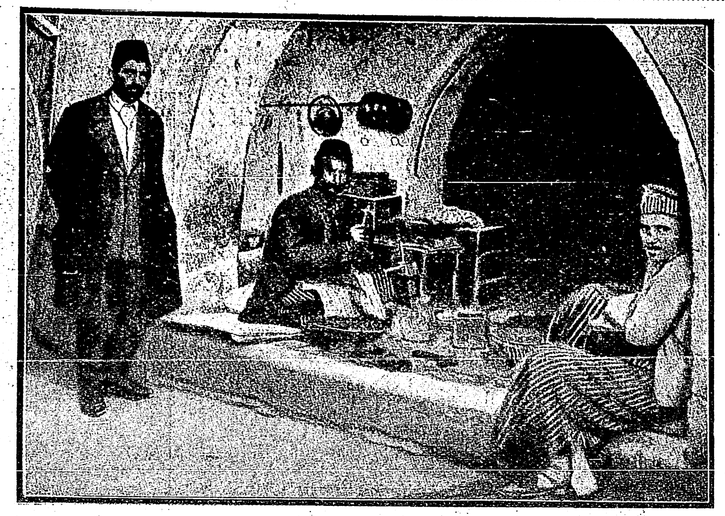

স্বর্ণকারের দোকান

বাগ্‌দাদের জু-মহিলা

বিক্ষত হ'য়ে গেলেও, সেখানকার উটেরা তা পরমানন্দে চর্ব্বণ করে,—এমনি প্রিয় খাদ্য ওটী তাদের। সেখানকার মরুভূমিতে চলাচলের ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে উট বিশেষ উপযোগী। সেখানে ঘোড়াও আছে, তবে সংখ্যায় খুব কম। লোকেরা উটের দুধ খেয়ে থাকে। মোরগ ও দুম্বা-ও সেখানকার অধিবাসীরা পোষে। দুম্বার মাংস তাদের প্রিয় খাদ্য।

ইরাক-দেশটীকে আজ মরুভূমির মতো দেখালেও, এককালে ওটী একটা জনাকীর্ণ, সমৃদ্ধিশালী দেশ ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যাবিলনের নাম করা যেতে পারে। আজও তার ভগ্নাবশেষ অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিচ্ছে। সেই সব ভগ্নাবশেষের কিছু অংশ নিয়ে হিলা ও বাগ্‌দাদের প্রাচীর তৈরী করা হ'য়েছে।

ইরাকে আজকাল নানা জাতীয় লোক বসবাস করে। আরবের উত্তরাংশের লোকেরা কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে সেখানে এসে আস্তানা গেড়েছিল। এখন তাদের বংশধরেরা সেখানে স্থায়ী হ'য়ে গেছে। আর্য্য-বংশীয় কেউ বোধ হয় সেখানে ছিল না। সেমেটিক নামে অর্দ্ধসভ্য এক জাতীয় লোক সেখানে বসবাস ক'রেছিল। এখনও তাদের বংশধরেরা সেখানে বংশ-বৃদ্ধি ক'রছে। এরা

অনেকটা ছিল দক্ষিণ-ভারতের দ্রাবিড়দের মতো। বেদুইনরাই সেখানকার আদিম অধিবাসী।

ইরাকের নারীদের ইরাণী সুন্দরী বলা উচিত। বাস্তবিকই এদের গায়ের রং ও গঠন দেখে অবাক্ হ'য়ে যেতে হয়। এদের কালিদাস-বর্ণিত তনু-শ্রী দেখলে স্বপ্ন-রাজ্যের পরীদের কথাই যেন মনে প'ড়ে যায়। কিন্তু তা হ'লে কি হবে, তারা বড় নোংরা। এরা যদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হ'য়ে থাকে, তাহ'লে তারা বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বেশী সুন্দরী।

ইরাকে পর্দ্দাপ্রথার বাধা নেই। কাজেই, মেয়েরা নিঃসঙ্কোচে পথে চলা-ফেরা করে। সেখানে মেয়ে চুরীও হয় না, কিম্বা, ব্যভিচারেরও তেমন প্রশ্রয় নেই।

তরুণী

বেদুইন্‌দের চেয়ে সেখানকার আরবদের শক্তি-প্রতিপত্তি ও বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হ'লেও, বেদুইনরা তাদের মোটেই প্রীতির চোখে দেখতে পারে না, এবং অন্তরের সঙ্গে ঘৃণাই করে। বেদুইনরা তাদের সঙ্গে কোনো লেন্-দেন্ না রাখতে

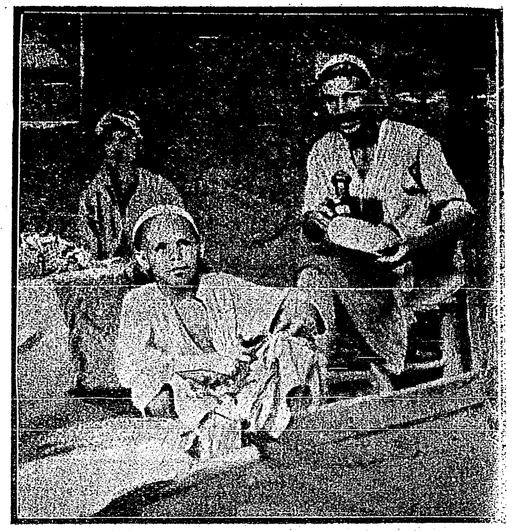

মুচির কাজ

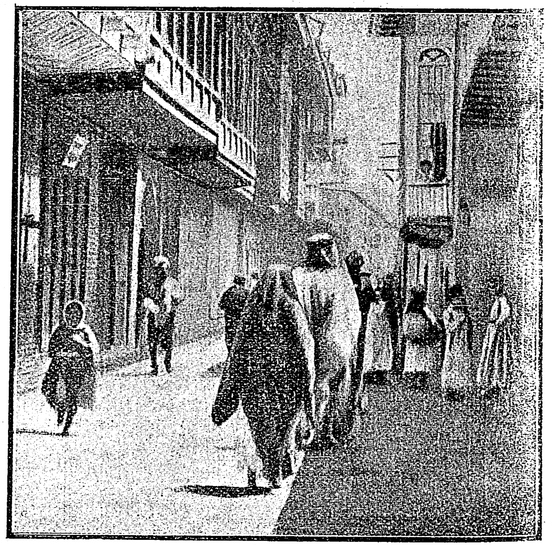

বাগ্‌দাদের পথ

হলেই যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। সর্ব্বদাই তারা আরবদের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়েই আছে! আরবদের কিসে

ক্ষতি হবে, তাই তাদের একমাত্র চিন্তা। বেদুইনরা চুরি-ডাকাতী এবং নানা উপায়ের দ্বারা আরবদের অস্থির ক'রে তুলতে ছাড়ে না। এদের ধ'রে সায়েস্তা করাও একটী বিষম হাঙ্গামা! এরা ন্যায়-অন্যায়ের ধার ধারে না। একগুঁয়েমি এদের প্রধান গুণ। এরা একবার যা 'গোঁ' ধ'রবে, নানা যুক্তি দিয়েও তা ছাড়ানো যাবে না;—তারা তা মোটেই শুনবে না;—বোঝা ত দূরের কথা! এই সব বেদুইন দেখতে যেমন ভীষণ, তাদের প্রকৃতিও তেম্‌নি ভয়ানক! এরা দলবদ্ধ হ'য়ে থাকে। প্রত্যেক দলে এক-একজন সর্দ্দার থাকে। এই সব সর্দ্দারের ইঙ্গিতেই তারা চলাফেরা করে। কোনো পথিক যদি এদের পাল্লায় প'ড়েছেন, ত গেছেন! এরা সাধারণ লোকালয়ে থাকে না। এদের বাসভূমি হচ্ছে মরুভূমির এমন জায়গায় যেখানে একেবারেই লোক-চলাচল হ'তে পারে না। মাটীর নীচে গর্ত্ত ক'রে তার ভিতরে এরা আস্তানা গড়ে এবং আলো ও হাওয়ার জন্য মাটীর উপর একটা চিমনীর মতো জিনিষ তৈরী ক'রে রাখে।

বিগত মহাসমরের আগে ইরাক ছিল তুর্কীর অধিকারে। তুর্কী-সরকার বহুবার ঐ সব বেদুইনদের হাতে 'নাস্তানাবুদ্' হ'য়েছিলেন। বেদুইনরা ছিল বিপ্লবপন্থী। আরবরাও তুর্কী-সরকারকে বড় একটা মেনে চ'লতো না; নিজেরাই জোর-জবর-দস্তি ক'রে খাজনা আদায় ক'রতো এবং সুযোগ পেলেই সরকারী অফিস্ পুড়িয়ে দিত। আবু আহম্মদ এবং বেন্ আলামের দল এ-বিষয়ে ছিল খুব সিদ্ধহস্ত। এরা কথায়-কথায় খুন-জখম ও লুটতরাজ ক'রতো। বেশী বাড়াবাড়ি ক'রলে, পথিককে হত্যা ক'রতেও এরা পশ্চাদ্‌পদ হ'তো না। নির্জ্জনে পথিক হত্যা ক'রে লুট করাই ছিল এদের নিত্য-কর্ম্ম। বিশ্বাসঘাতকও ছিল এরা খুব। কিন্তু তুর্কীদের সঙ্গে মনোমালিন্য থাকলেও, যুদ্ধে এরা তুর্কী-দের স্বপক্ষে থেকে' ইংরাজের বিরুদ্ধে লড়াই ক'রেছিল। এরা ছিল প্রথম শ্রেণীর খামখেয়ালী। কাজেই, কোনো কাজের ভার এদের ওপর দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকবার উপায় ছিল না। এরা এমন বদ্‌খেয়ালী যে, যুদ্ধের সময় সুযোগ পেলে স্বজাতি

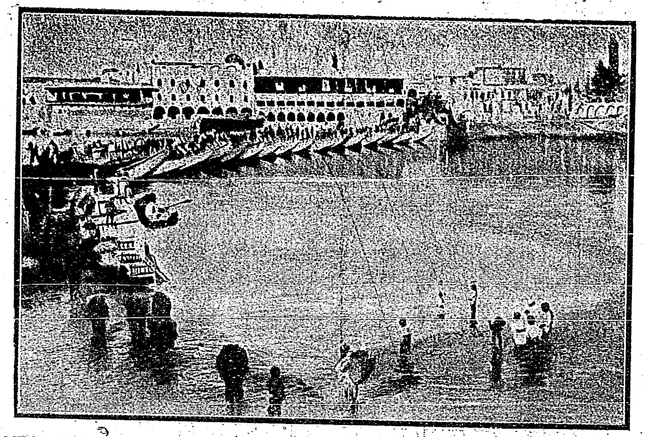

টাইগ্রিস্-নদীর উপরে নৌকার সেতু

ও স্বদেশবাসীদেরও ওপর অত্যাচার ক'রতে দ্বিধা বোধ ক'রতো না। শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করা ত দূরের কথা, তুর্কী সরকার এদের নিয়ে মহামুস্কিলে প'ড়েছিলেন।

নোমাদ্ জাতীয় পরিবার

ঐ উৎপীড়নেচ্ছার মূলে আছে প্রধানতঃ সাম্প্রদায়িকতা। মেসোপোটেমিয়াবাসীরা হচ্ছে সিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত, এবং তুর্কীরা

হচ্ছে সুন্নি। তুর্কীরা দেশের হর্ত্তা কর্ত্তা ছিল ব'লে তাদের রীতি-নীতি ও ধর্ম্ম-বিশ্বাসই প্রচলিত ছিল বেশী। ওদিকে,

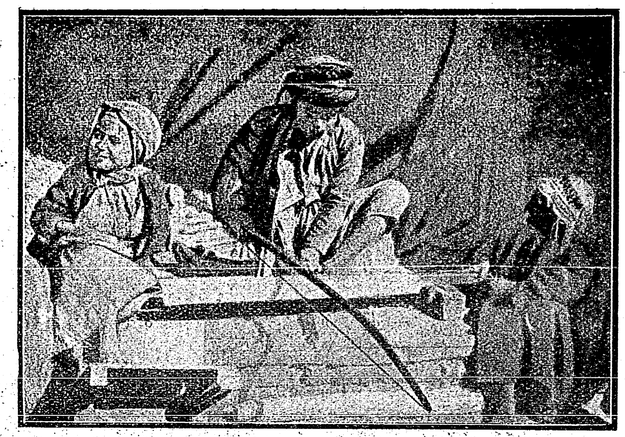

কাঠের কাজ

সিয়া-সম্প্রদায়স্থ লোকেরা সংখ্যায় বেশী হ'লেও, তাদের ধর্ম্মমত সুন্নি-শ্রেণীর লোকেরা মেনে চ'লতো না কাজেই—

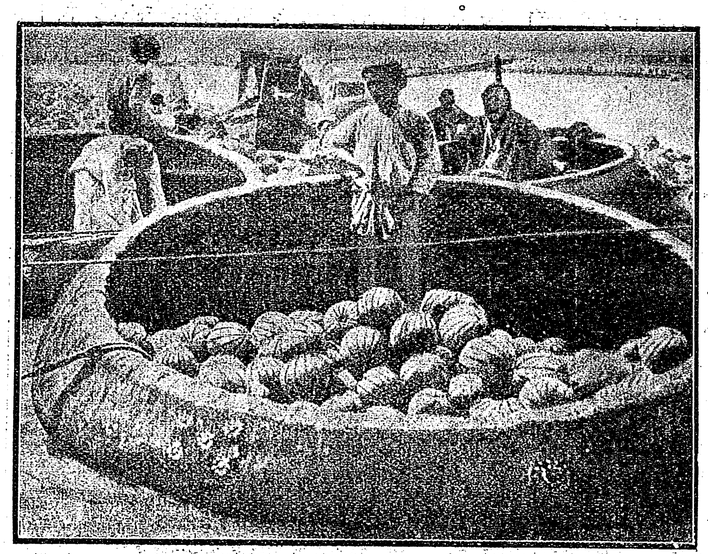

চুব্‌ড়ী-নৌকা। এর সাহায্যে ফল-আনাজ বহন করা যেতে পারে, আবার নদী পার হওয়াও চলে

কাজেই, মতান্তর মনান্তরে, এবং মনান্তর ক্রমে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় পরিণত হ'লো। কারবালার মাঠে ঐ দুই সম্প্রদায়ের যে তুমুল যুদ্ধ ঐ কারণে হ'য়ে গেছে, তার স্মৃতি-চিহ্ন বুঝি আজও সেখানে গেলে দেখতে পাওয়া যায়।

আর এক ধর্ম্মাবলম্বী লোক সেখানে দেখতে পাওয়া যায়। তারা কোন্ ধর্ম্মের লোক, তা তাদের আচারবিচার দেখে' বোঝা কঠিন। কোনো নদীর তীরে বাস করাই না কি তাদের ধর্ম্মের অঙ্গ। তাই, তারা নদীর তীরে বাস করে এবং বাস ক'রে নিজেদের ধন্য মনে করে। আচার ব্যবহারে এরা কতকটা খৃষ্টানদের মতো, এবং কতকটা মুসলমানদের মতো। বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ হ'তে কিছু কিছু সংগ্রহ ক'রে, এরা তাকে ধর্ম্ম-গ্রন্থ ব'লে আসছে। বাস্তবিক পক্ষে এদের নিজেদের ব'লতে কিছুই নেই। সপ্তাহের প্রথম দিন্‌কে এরা ঠিক খৃষ্টানদের মতো মানে। তবু তারা খৃষ্টান নয়, আবার ইহুদীও নয়! যাই হোক্, ধর্ম্মে এরা যা-ই হোক না কেন, এদের এমন একটী গুণ আছে, যার জন্য এদের দেশ-বিদেশে বেশ-একটু সুনাম আছে। তা হচ্ছে এদের স্বর্ণ ও রূপার জিনিষের উপর কারু-কার্য্য। উক্ত কারু-বিন্যাস ও চিত্র এমন সুন্দর হয় যে, অনেক ইংরাজই তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। এই কাজই তাদের জাতীয় ব্যবসা ও অর্থ অর্জ্জনের একমাত্র পথ। পাছে কেউ তাদের ওই কারু-কুশলতার কৌশল দেখে' শিখে নেয়, এই ভয়ে তারা নির্জ্জনে ব'সে কাজ করে; পরম আত্মীয় বা নিকটতম বন্ধুকেও কাছে আসতে দেয় না। একাধিক সন্তান থাকলে, পিতা তার বড় অথবা আদুরে ছেলেটীকেই

ঐ কাজ শেখান। অবশ্য ছেলে যাতে না অন্যের সুবিধাজনক ছিল না। উট, নৌকা কিম্বা মুটের দ্বারা ব্যবসা কাছে ঐ কাজের কৌশল প্রকাশ ক'রে দেয়, এজন্য ভাল ভাবে চ'লতো না। তাতে আমদানী জিনিষের দাম তাকে দিয়ে এক ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেওয়া হয়। ছেলে যদি ঐ কৌশল প্রকাশ ক'রে দেয়, তা হ'লে তার ভবিষ্যৎ ফল কি হবে, তাও ব'লে দেওয়া হয়। কাজেই উত্তরাধিকারসূত্রে বংশ-পরম্পরায় তারা ঐ কৌশল অন্যের কাছে চির-অজ্ঞাত ক'রে রাখে।

ইরাকের উত্তর সীমান্তে আর-এক দল লোক বাস করে। তারা হয় ত কুর্দ্দিস্থানের আদিম অসভ্য জাতি। তারা প্রেত-উপাসক। তাদের বিশ্বাস, সাপ-ই যত অনর্থ ও পাপের মূল! তাই, যাতে সাপের বংশ ধ্বংস হয়, সে জন্য তারা ময়ূর পুষে থাকে এবং অতি পবিত্র জ্ঞানে ময়ূরকে ভক্তি করে। যে কোনো সাপ দেখলেই, তাকে যে-তেন-প্র কা রে ণ মারা চাই-ই। এটীকে তারা একটী পবিত্র কাজ ব'লে মনে করে।

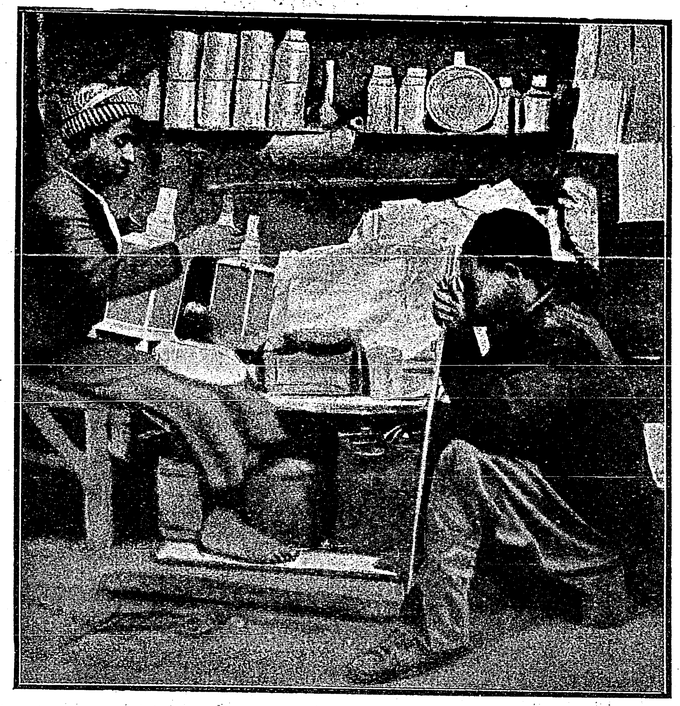

টিনের তৈরী জিনিষের দোকান

ইরাকে ব্যবসা বাণিজ্য আগে তেমন

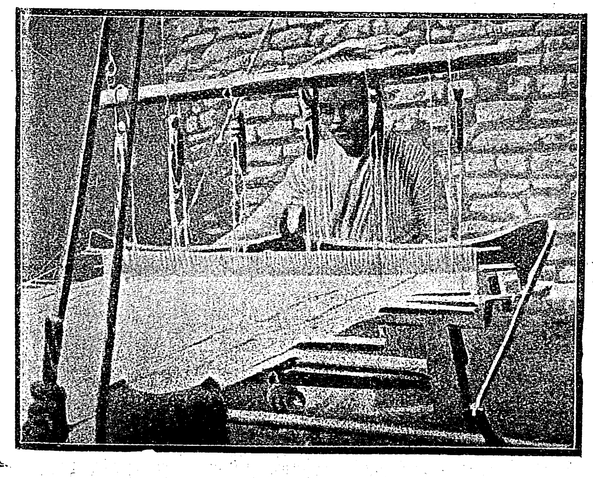

তাঁত

খুবই চড়া হ'তো। রপ্তানী জিনিষেও তেমন লাভ থাকতো না। বছর কয়েক ধ'রে রেল হওয়ায়, স্থলে ও জলে অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্যের সুবর্ণ সুযোগ হ'য়েছে। বাগদাদ থেকে চারি দিকে রেল লাইন চ'লে গেছে। দক্ষিণ দিকে রেল লাইন বসোরা পর্য্যন্ত এসেছে। বসোরা থেকে ষ্টীমারে পারস্যোসাগর দিয়ে বিদেশে অল্প সময়ে ও কম খরচে মাল চালান হ'য়ে থাকে। আবার, আমদানী মাল-ও বসোরা থেকে অল্প সময়ের মধ্যে দেশের সব যায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। ইরাক কৃষি-প্রধান না হলেও, আজকাল সেখানে চাষের খুবই উন্নতি হচ্ছে।

ইরাকের বর্ত্তমান রাজধানী বাগদাদ। এই বাগদাদ্-ই একদিন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হারুণ আল্'

রসিদের রাজধানী ছিল। অন্তর্বাণিজ্যের এটী একটী প্রধান কেন্দ্র। বিলাত ও ভারত-লাইনে যে এরোপ্লেন চলে, তার মধ্যে আবদুল কাদের মস্‌জিদই নামজাদা।

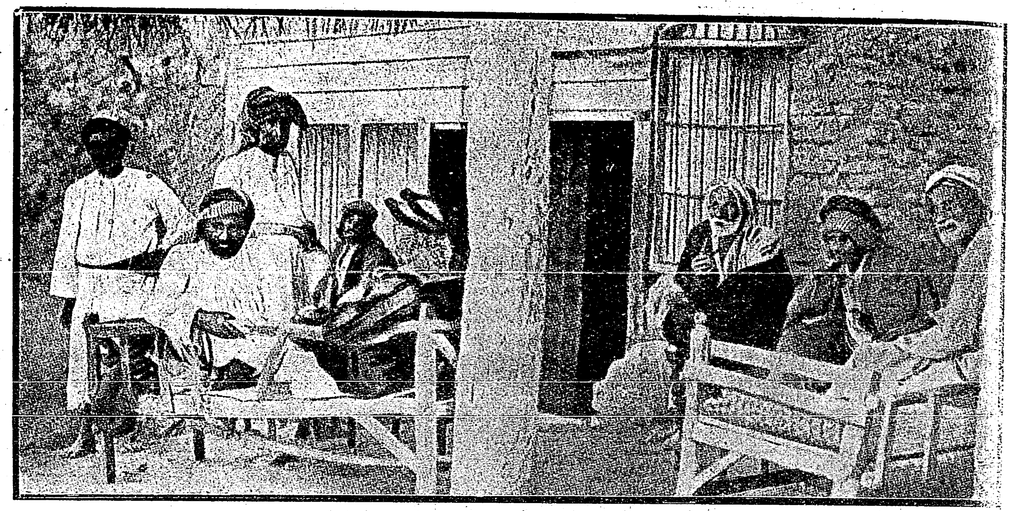

কাফিখানার বারাণ্ডায় বায়ু-সেবন

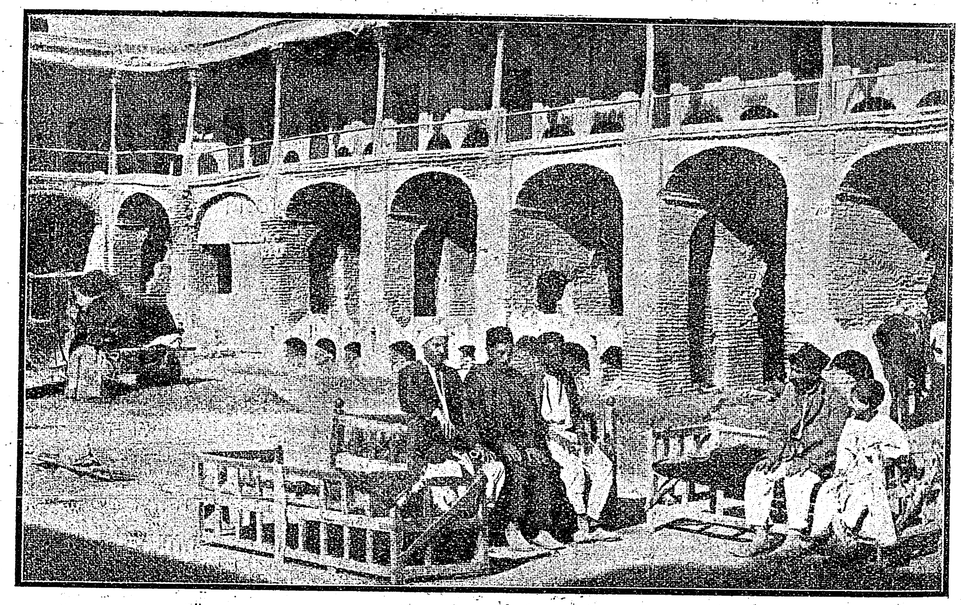

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কার্‌বালা-দেশের তীর্থযাত্রী

বাগদাদ তার একটা প্রসিদ্ধ ষ্টেশন। এর পরই উল্লেখযোগ্য সহর হচ্ছে বসোরা।

বাগদাদে অনেক প্রসিদ্ধ বাড়ী ও মস্‌জিদ আছে। অতি সুন্দর। সকালে ও সন্ধ্যায় আরব বালকেরা ছোট ছোট নৌকা নিয়ে খেলা করে। নৌকা চালাবার সময় তারা যে মধুর গজল-গান করে, তা কানের ভিতর দিয়ে মর্ম্ম স্পর্শ করে। কখনো কখনো মেয়েরাও তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। যে নৌকায় তারা বেড়ায়, সেই সব নৌকা বড় বড় খেজুর গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরী। নৌকাগুলো ৪।৫ মণ ওজনের মাল বহন ক'রতে পারে। আর এক রকমের নৌকা সেখানে আছে, যা পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। তাকে চুব্‌ড়ী-নৌকা বলা যেতে পারে। সেগুলো কাঠের তৈরী নয়। তার ফ্রেম্‌-গুলো কাঠের এবং ছাউনীগুলো খড়ের। তবে, খড়ের হলেও, নৌকার ভিতরে জল ঢুকতে পারে না, কারণ, আল্‌কাত্‌রা ও পিচ্‌-জাতীয় একরকম জিনিষ এমন ভাবে তার উপর প্রলেপ দেওয়া হয় যে, তা ঠিক সিমেণ্টের মতো চেপে ব'সে যায়। তাই-গ্রীস্‌-নদীতে এই নৌকা চালিয়ে ছোট ব্যবসাই এর দ্বারা সম্ভব। সময়ে আবার এই নৌকায় ফেরির কাজও হ'য়ে থাকে।

পথের ধারে নাপিতের কাজ

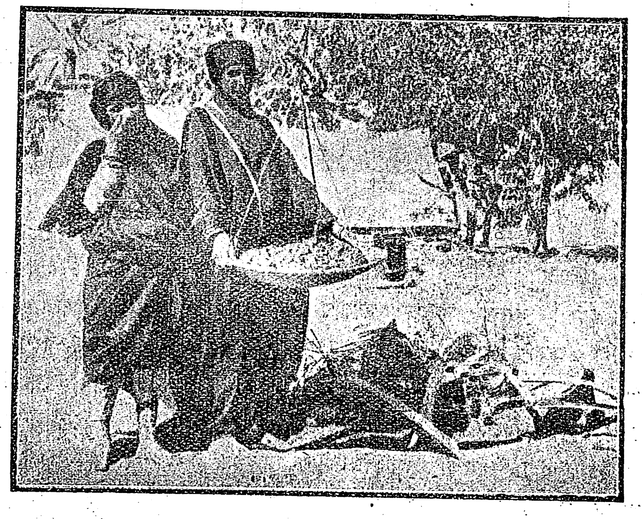

খেজুর-গাছের তলায় পড়া খেজুর সংগ্রহ ক'রছে

ইরাকের তুর্কী, আর্মেনিয়ান ও ইহুদী অধিবাসীরা পাজামা, কোর্ত্তা ও ফেজ্ টুপী ব্যবহার করে। তবে যারা সঙ্গতিপন্ন, তারা কেউ কেউ রেশমের টুপী কিম্বা ইয়োরোপীয় পোষাক পরে। গরীবরা দেশীয় কাপড়-জামাই ব্যবহার করে। এরা নিজেদের হাতে কার্পাস থেকে সূতা বের ক'রে সেই সূতায় তাঁতে কাপড় বোনে। আজকাল অনেক বিদেশী সস্তা কাপড় আমদানী হওয়ায়, অনেকে তাঁত বোনা ছেড়ে দিয়ে, বিদেশীদের পেট ভরাচ্ছে। অনেকে আবার বিদেশী জিনিষ কেনাকে অন্তরের সঙ্গে

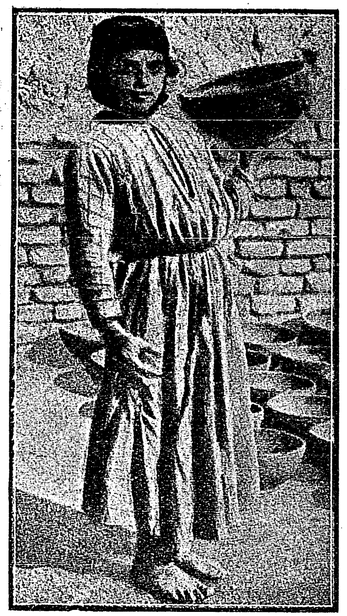

সদ্য-তৈরী মাটীর গাম্‌লা রোদ্দুরে শুকোতে দিতে যাচ্ছে

ঘৃণা করে। হাতের কাজে তাদের খুব দক্ষতা আছে, অর্থাৎ জুতা-সেলাই থেকে রাজপ্রাসাদ তৈরী ক'রতে তারা সিদ্ধহস্ত। তার একটু কারণ আছে। এরা লেখাপড়ার দিকে মনোযোগী একটুও নয়। লেখাপড়া ব'লতে এরা আগে আরবী, উর্দ্দু ভাষা বোঝে। আগে যে ব্যক্তি কোরাণ প'ড়তে পারতো, সে হ'তো মহা পণ্ডিত। এই জন্যই, মৌলবী ও মোল্লার দল এই দিকেই নজর দিতেন বেশী। সাধারণ লোকেরা তাই কোরাণে চোখ বুলিয়ে গিয়েই গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য হাতের কাজ শিখতে মন দেয়। আজকাল তারা কিন্তু লেখাপড়ার যে কিছু মূল্য আছে, তা বুঝতে শিখেছে। তারা বুঝেছে যে, কেবল হাতের কাজ নয়, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অঙ্ক প্রভৃতি শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জ্জন না ক'রলে উন্নতির আশা নেই। তাই, বর্ত্তমানে সেখানে দু-একটী স্কুল-কলেজের প্রতিষ্ঠা হ'য়েছে।

ডাক্তারী-শাস্ত্র ইরাকে অজ্ঞাতই ছিল। এখনো কারও কিছু অস্ত্র ক'রতে হ'লে, তাকে শরণাপন্ন হ'তে হবে নাপিতের। নরসুন্দর মহাশয় তাঁর যন্ত্রপাতি নিয়ে

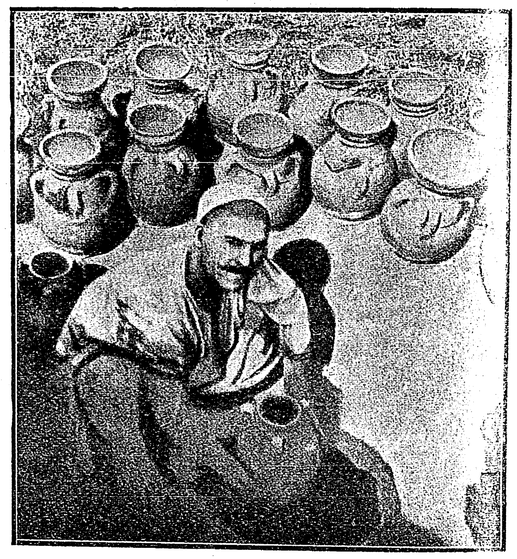

মৃৎ-শিল্প

রাস্তার ধারে ব'সে থাকেন। তিনি চুলও কাটেন, আবার দরকার হ'লে ক্ষুর্ অথবা নরুণ নিয়ে এমন সাংঘাতিকভাবে অস্ত্র করেন যে, তার কল্যাণে রোগী হয় বেঁচে যায়, আর নয় ভবলীলা সাঙ্গ করে।

শাস্ত্র-পড়া দু একজন ডাক্তার যে সেখানে নেই, তা নয়। তবে তাদের চাহিদা প্রচুর। কাজেই, সহর এবং ধনীদের বাড়ীতেই তাদের দেখতে পাওয়া যায়। পল্লীগ্রামের লোকেরা দুঃস্থ। কাজেই, অল্প পয়সায় হাকিমী মতে তারা চিকিৎসা করায়।

ইরাকের আরবী অধিবাসীদের কেউ কেউ ফেজ টুপী ব্যবহার করে বটে, কিন্তু অধিকাংশ লোকই মাথায় মোটা রুমাল পাগড়ীর মতো বাঁধে; খানিকটা আবার পিঠের দিকেও ঝুলিয়ে দেয়। অবস্থানুসারে তারা জুতা ও মোজা ব্যবহার করে। সেখানকার মেয়েরাও পা-জামা পরে এবং মাথায় কাশ্মীরী মেয়েদের মতো রুমাল জড়ায়। তারা পুরুষদের মতো আলখাল্লাও পরে এবং নাগ্‌রা জুতা পছন্দ করে। নাকে ও কাণে রিং প'রতে তারা অত্যন্ত ভালবাসে। এরা খুব পরিশ্রমী ও কর্ম্মঠ। সাংসারিক কাজকর্ম্ম শেষ হ'য়ে গেলে, অবসর সময়ে তারা বিক্রীর জন্য জিনিষ-পত্তর তৈরী ক'রে একটা আয়ের উপায় ক'র্‌তে আন্তরিক উৎসাহ ঢেলে দেয়। পুরুষরা অবসর সময়ে কোনো হোটেলে কিম্বা সরাইখানায় ব'সে কাফি খায়, দাবা খেলে, আর খোস্-গল্প ক'রে সময় কাটায়। সময় সময় আবার আর্থিক, সামাজিক ও রাজ-নৈতিক বিষয়েরও আলোচনা হ'য়ে থাকে। সেখানকার পুরুষদের মধ্যে একটা বিশেষত্ব এই যে, তারা দাড়ি রাখে কম।

ইরাকের লোকেরা এক স্ত্রী বর্ত্তমানে প্রায়ই অন্য স্ত্রী গ্রহণ করে না। আর, যদিও বা করে, তবে প্রথমা স্ত্রীকে তাড়িয়ে দেয় না। গমের রুটী সেখানকার প্রধান খাদ্য।

মেসোপোটেমিয়া অঞ্চলে সিয়াদের পবিত্র তীর্থ-স্থান হচ্ছে—নাজিক, কারবালা, কাজি মেইন ও সামারা। সপ্তম ও নবম সামেরা দ্বাদশ ও শেষ ইমামের কবর-স্থল—কাজি মেইন। নেজাকে খালিফা আলির, এবং কারবালায় আলির পুত্র হোসেনের কবর ও সমজিদ বর্ত্তমান। মহরম উপলক্ষে কারবালায় লোক-সমাগম হয় বেশী। হোসেন সেখানে মুষ্টিমেয় লোক নিয়ে যুদ্ধ ক'রে শত্রুর হাতে নিহত হন। তারই স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ অন্তর-ভরা দুঃখ জানাবার জন্য প্রতি বৎসর ওই পবিত্র তিথিতে সেখানে সিয়ারা বুকে আঘাত ক'রে অশ্রু ফেলে আসে। এদের বিশ্বাস, নাজিক

হাওয়ায়-ভরা চাম্‌ড়ার থলির সাহায্যে টাইগ্রিস্-নদীতে ভেসে যাচ্ছে

ও কারবালায় যদি তাদের মৃত্যু হয় এবং কবরও হয়, তাহ'লে তাদের আত্মা মুক্তি পাবে।

ইরাক, তুরাণ, আরব ও পারস্যদেশের লোকেরা অর্থাৎ মুসলমানেরা গরু জবাই করে না,—জবাই করে দুম্বা। তারা বলে, দুম্বা-জবাই-ই খাঁটী মুসলমানধর্ম্মের চিহ্ন!

মোট ১৪৩২৫০ বর্গ মাইল জায়গা ইরাকে আছে। সেখানকার মোট লোক-সংখ্যা প্রায় ত্রিশ লক্ষ।

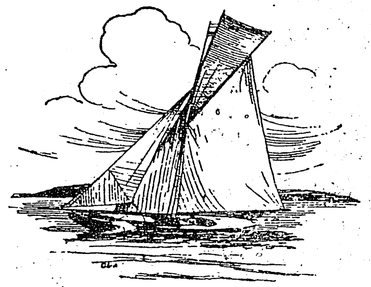

যথাস্থানে (?)

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

বাড়ীর পাশে বস্তি। নানা রকম লোক আসে, বাস করে, উঠে যায়।

দিন-পাঁচেক হবে একঘর হিন্দুস্থানী স্বামী-স্ত্রী এসেছে। একটী বছর দুয়েকের মেয়ে—আর তারা দুজন। রেণুদের শোবার ঘরের জান্‌লা দিয়ে তাদের খোলার ঘরের দোতলার বারান্দাটুকু দেখা যায়। বৌটী দেখতে বেশ, খুব ছেলেমানুষ মুখখানা। অবস্থাও নিতান্ত গরীব ব'লে মনে হয় না।

রেণু অবসরের সময় মাঝে মাঝে বস্তির ঘর-গেরস্থালী দেখে। বাঙালী বাসিন্দাদের ঘরকরণা, কাপড়চোপড় পরা, খাওয়া দাওয়া প্রায় একই ধরণের। প্রভেদ তাদের মাঝে শুধু দারিদ্র্যের আর অভাবের ইতর-বিশেষের।

এরা যেন ওদের মতন নয়। কেমন করে স'মনে কুঁচিয়ে রঙীন শাড়ীগুলি পরে, সাদা শাড়ী পরেই না। কানে মস্ত ফুল, নাকে ছোট নাকফুল, হাতে রূপার পৈছে, কাচের চুড়ী গোছা করা—গলায় মোটা হাঁসুলী, পায়ে সরু বাঁকমল। চোখ দুটীতে কাজলপরা, কপালে সোনালী রঙীন টীপ।

রেণু অবাক হয়ে দেখে, ওদের যে পারিপাট্য আছে সে পারিপাট্য ঐ অবস্থার ওদের অন্য প্রতিবেশীর নেই।

রেণুর তেতলার ঘরের জানলা থেকে ওদের দেখার শেষ নেই। সব বুঝতে না পারার যেন একটী বিশেষত্ব আছে—যেমন অজানা হিন্দী গানের চেনা সুর। ওদের রান্না সেই বারান্দার এক কোণে। কিসের ডাল করে তাতে রসুন কুঁচিয়ে ফোড়ন দেয়; আর একটা উৎকট গন্ধে রেণুদের দোতলার ঘর ভরে যায়। আর শুধু বেগুনের, শুধু আলুর, শুধু সীমের তরকারী—আলাদা আলাদা করে রাঁধবে।

খাবে তাও কি অনাসৃষ্টি।—স্বামীকে ভাত দিয়ে তারই ভাতের পাশে সব ভাত ঢেলে দেয়।—মস্ত একটা কানা-উঁচু থালে শলা শলা ভাত আর ডাল সে খেয়ে যা' থাকে, তার তামাক সেজে, মাদুর পেতে, বিছানা করে মেয়েকে শুইয়ে তার পর এসে খায়।

রেণুর মনে হয় ততক্ষণ ভাতগুলো যদি হাঁড়িতে থাকে, তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়!

* * * *

রাত কত, কে জানে। একটা গোলমালে রেণুদের ঘুম ভেঙে গেল। শুনলে, বৌটা কাঁদছে—আর তার বর তাকে খুব বকছে।

হয় ত মারলে।—

বকুনির প্রকোপ আর কান্নাও বেশী কোরে শোনা গেল।

রেণু উঠে বস্‌ল। শৈলেন বল্লে, 'হতভাগা মাতাল হয়ে আদ্ধেক রাত্তিরে বীরত্ব করছেন।'

রেণু বল্লে, 'আহা, বৌটা যে কি শান্ত, আর কি ছেলে-মানুষ কি বল্‌ব। মুখটা দেখলে এমন মায়া হয়! কি করে বা মারতে ইচ্ছে যায়।'

শৈলেন বল্লে, 'ছাড়াছাড়ি তো নেই। থাক্‌ত যদি, কে জানে এত মারধোর চল্‌ত কি না!—'

ততক্ষণে খোলার দোতলায় কান্না থেমে গেছে। ওরাও ঘুমিয়ে পড়ে।

রেণু ভাবে, বৌটা কোন্ দিন আত্মহত্যা করে বা! স্বামীকে বলে। স্বামী হাসে, বলে, 'না, তা' করবে না, পালাবে কোন দিন।—'

রেণুর তা' বিশ্বাস হয় না।

কিন্তু আত্মহত্যা নয়—ঐ ব্যাপারটাই ক্রমে যেন নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতি' হয়ে উঠ্‌ল।

সকাল নেই, সন্ধ্যে নেই, একটু আধটু শাসনের আভাস তো পাওয়া যায়ই; মাঝে মাঝে নিশুতি রাত্রে খুব সমারোহে শাসন-সংস্কার চল্‌তে থাকে। মূক প্রাণীর মতন এক পক্ষ চুপচাপ থাকে।

শৈলেন চলে যায় কোর্টে; সব সময় কানে যায় না; রেণুর তো তিষ্ঠনো দায় মনে হয়। শৈলেন যেদিন বাড়াবাড়ি দেখে, রাগ করে বলে, 'হতভাগাদের উঠিয়ে দিতে পারলে বাঁচা যায়—নিজেদের বাড়ীতে নিজেরা টেঁকা দায় হয়েছে। পুলিশ ডেকে বিদেয় করতে হবে।'

রেণু আবার ভয়ে বলেও না সব সময়,—তার কেমন মায়া হয়—আহা বৌটা চলে যাবে!

নিত্য শুনতে শুনতে রেণুর আর আশ্চর্য্য বোধ হয় না—যেন মারা আর মার-খাওয়া সমান স্বাভাবিক ওদের কাছে।

সন্ধ্যের পরই মেয়েটাকে খাইয়ে মাদুর পেতে বারান্দায় শুইয়ে স্বামীর অপেক্ষায় বৌটা বসে থাকে।—কত রাত্রে সে আসে কে জানে।

কাঠের রেলিংয়ে ঠেস্ দিয়ে বসে থাকে, অস্পষ্ট আলোয় মুখখানি যেন পেতলের প্রতিমার মুখের মতন দেখায়; ম্লানও নয়, দীপ্তও নয়, যেন কেমন বয়স ছাড়া গম্ভীর।

বস্তির অন্য ঘরে যদি বিবাদ-বিতণ্ডা হয়,—যে-কোনো সম্পর্কের মাঝেই হোক না—যে গালাগালি বর্ষিত হয়, তা যেমন অকথ্য তেমনি অশ্রাব্য। এ বেচারা কিন্তু চুপ করে মার খায়, আবার স্বামী চলে গেলে তার সেবার সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ আয়োজন করে; তামাক সাজা থেকে নিয়ে মেয়েটীকে খেলা দেয়, যেন কিছুই হয় নি মনে হয়।

স্বামী ফিরে এলে মৃদু অল্প হেসে কথা কয়।

রেণু ভাবে, রেণু হলে?—আবার হাসি—কথা?—

গলায় দড়ি দিয়ে কবে লম্বা হয়ে ঝুলে পড়ত।

আবার নিজের অসম্ভব কল্পনায় নিজেরি হাসি পায়।

আর কৌতূহলের ঠেলায় আর সমস্ত অবকাশ সময়টুকু জানলাতেই উঁকি ঝুঁকি দিয়ে কাটায়।

বেচারী উৎপীড়িত হলে ক্রটীটা যে কার রেণু তা বুঝতে পারে না। কারখানার সাহেবের, না, মিলের কর্ত্তার—কি কার কে জানে—এদিকে তো চওড়া চাপরাস বুকে বেঁধে যায়। কিন্তু, সে যাই হোক মার খায় বৌটাই।—

ক্রটী যার হবার তার হবেই—সেদিনও কি হ'ল কে জানে,—রেণুদের ঘুম ভাঙল আবার।

কি একটা জিনিষ ছুঁড়ে ফেলে দেবার শব্দ হ'ল। রেণু উঠে মুখ বাড়িয়ে জানলা দিয়ে দেখলে,বৌটার পায়ের কাছে কয়লার আগুনের টুকরো পড়ে আছে।—সে কাপড় ঝাড়ছে আর কাঁদ কাঁদ সুরে কি বলছে, আর তার বীর স্বামী পরুষ স্বরে তার জবাব দিচ্ছে।

রেণুর গা জ্বালা করতে লাগলো। স্বামীর সঙ্গে খানিকটা পুরুষজাতের অবিচার অত্যাচারের বিষয় আলোচনাতে দুজনে একমত হয়ে—কত রাত্রে বস্তির নিস্তব্ধতার সঙ্গে নিজেরাও ঘুমিয়ে পড়ল।

* * * *

জ্যৈষ্ঠের রাত্রি শেষ হয়ে এসেছে। গোটা পাঁচ সাত তারা ঘন নীল আকাশে ঝক্ ঝক্ করছে। পূবদিকটা প্রায় ফরসা হয়ে আসছে। রেণুর ঘুম ভাঙল। জল খেতে উঠে, দেখতে ইচ্ছে হ'ল, বৌটা কি করছে।—

মাদুরের এক পাশে মেয়ে—মাঝখানে তার বাপ, আর তার বুকের পাশটীতে মাথাটা নিচু করে—বৌটা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

দেখে মনেও হয় না রাত্রে ওই মেরেছিল—এখন যেন একান্ত নির্ভর; আর যে মার খেয়েছিল, সেও তার মতন কিচ্ছু ভাবই দেখাচ্ছে না—

যেন পরমাশ্রয় তার।—

রেণুর যেমন হাসি পেল, তেমনি রাগ হ'ল।

বেচারা শৈলেনের শেষ রাত্রির স্নিগ্ধ ঘুমটুকু ভাঙিয়ে বল্লে, 'দেখ, দেখ, একটী মজা দেখবে এসো।'

'আঃ আদ্ধেক রাত্তিরে কিসের মজা!—'

'আদ্ধেক রাত্তির না সন্ধ্যে, সকাল হোলো যে!—ওঠো, ওঠো, দেখ না,'—

'কি?'—বলে শৈলেন একবার চোখ খুল্লে।—

'ওরা কেমন ঘুমুচ্ছে দেখ,—যেন কিছু হয়নি রাত্তিরে।'—

'কি জ্বালা, আড়ি পাতছ, ছি! ছি! শোও, শোও, পাগল।'—

'হ্যাঁ, আড়ি হ'ল বুঝি'—

'না দেখে না, ছি! শোবে এসো।'—

নিরুপায় রেণু বিছানায় এসে বস্‌ল। বল্লে, 'রাত্তিরে ঐ কীর্ত্তি, আর সকালে কি ভাব। আমরা কত কি বলছিলাম—মোকদ্দমা ছাড়াছাড়ি!"—'

শৈলেন আবার চোখ বুজে ভাঙ্গা ঘুমের রেশটুকু ফিরিয়ে আনবার চেষ্টায় ছিল।—সে বল্লে,—'ঐ রকম হয়,—কি করবে আর,—'

'না গো! ভালবাসে। দেখলে না তো কেমন ঘুমচ্ছে নিশ্চিন্ত হয়ে ;'—রেণু বল্লে।

শৈলেন বল্লে 'যেন নিজের জায়গায়—না ?—তা' নয়, বোধ হয় ভীতু মেয়েটা ;—'

'আহা !'—

'না, না, একটু ব্যবস্থা থাকা দরকার ছিল বৈ কি—। আজ নয়, কাল পীড়ন ভোগ করবেই, মার খাওয়াই থাকবে। কথা কইবারও তো অধিকার নেই।'—

'ভারি অধিকার !—ওর স্বামীর কাছে ওর অধিকার ও বুঝবে। নইলে ও সয় কেন ?'—

'তা' বটে, তোমাদের দশাই ঐ !'—বলে শৈলেন এবার চোখ খুলে একটু হাস্‌লে,—'সয় যে উপায় নেই বলে ;—'

রেণু বল্লে—'আচ্ছা তাই যদি,—তবে মাথা ব্যথাই বা কেন অধিকারের ?'

'তোমরা বুঝেও বুঝবে না। দরকার আছে,—হয়ে পড়েছে যে !'—

'অর্থাৎ ?'—

শৈলেন বল্লে, 'অর্থাৎ দরকার হলে সম্মান রাখতে পারবে তাই ;—ও দেখ না রোজই মার খায়, রোজই সয়,—ঐ যে কাছে ঘুমচ্ছে,—সেবা করছে,—ওর মানে ভালবাসা নয়,—ভয় ভক্তি ;—'

রেণু রাগ করলে, 'না, কিছুই নয় ওটা ! ভারি তর্ক ! তুমি ওর মনের কথা বুঝতে পারছ যেন ;—সত্যি আপনার মনে না করলে'—

সিঁড়ি থেকে ঝি ডাকলে, 'বৌমা, উনুন ধরেছে গো,—চায়ের জল বসাও'—

রেণু যেন চেয়ে দেখলে, কখন ভোর কেটে গিয়ে সকাল প্রসন্ন মুখে চেয়ে রয়েছে। বেশ বেলা হয়েছে।

একটু হেসে শৈলেন বল্লে 'যাক্ তুমি ওর স্বামীর পক্ষের উকীল হয়েছ আজ দেখছি—ভালই ;—'

রেণু বল্লে,—'আমার কারুর উকীল হবার সময় নেই—আমার সংসারের ঢের কাজ আছে। তুমি ভাব তোমার তর্কের সত্যি লোকের কথা।'—

স্বামী হাসলে,,—'আপাততঃ চা খাওয়া অবধি আমিও তোমার দলে,'—

উঠে যাবার সময় দুজনেই জানলা দিয়ে উঁকি মারলে বস্তির ঘরে,—দেখলে, লোকটা মাদুরে বসে মেয়েটীকে আদর করছে, আর বৌটা নতুন একটা কলকেয় তামাক সাজছে।—একটী ভাঙ্গা কল্কের টুকরা ছড়ানো মাদুরের কাছে।—

স্বামীকে রেণু বল্লে, 'দেখলে ?'—

মৃদু হেসে স্বামীও বল্লে, 'দেখ্‌লে ? আবার রাত্তিরে দেখো—'

রেণু রাগ করে নেবে গেল।—

পারের বাঁশী

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়

যেতেই যখন হবে আমার অচিন দেশের পার,
তখন কেন পিছু ডেকে পরাও মায়ার হার ?
পথে যেতে যদিই বাধে,
যদিই আমার পরাণ কাঁদে,
তখন না হয় আসব ফিরে, খুলো তোমার দ্বার।

ফিরব কবে শুধাও তুমি ? যাচ্ছি কাহার পুরে ?
তাও জানি না ; জানি শুধু ডাক শুনেছি দূরে,
অজানা ওই ডাকের মাঝে,
গভীর গোপন বাঁশী বাজে,
ঘর ছাড়ালো আমারে তা'র মন হারানো সুরে।

বিদায় বেলায় বলব কিছু ? বলব কি গো আর ?
বলার পালা শেষ হয়েছে, নাইক বাকি তা'র ?
আজকে আমার কথার ছুটী,
কাজ নিল তাই নয়ন দুটী,
অলখ পথে খুঁজে নিতে যাহা সারাৎসার।

ছাড়ছি কেন জীবন সাথী ? কিসের এত ভয় ?
প্রিয়ার কাছে হার মানাতেই আনবে যে মোর জয়।
আর যদি না ফিরিই আমি,
রইল তোমার স্বামীর স্বামী,
তারে তুমি দিবস-যামই রেখো পরাণময়।

আজকে প্রিয়া খেয়াঘাটে চাইছ উপহার ?
নাই যে আজি কিছুই তোমার নর-দেবতার।
শুধু তুমি সঙ্গোপনে,
এস আমার নিমন্ত্রণে,
দুলবে যখন প্রাণে অসীম সুধার পারাবার।

উর্ব্বশী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সমর দে

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

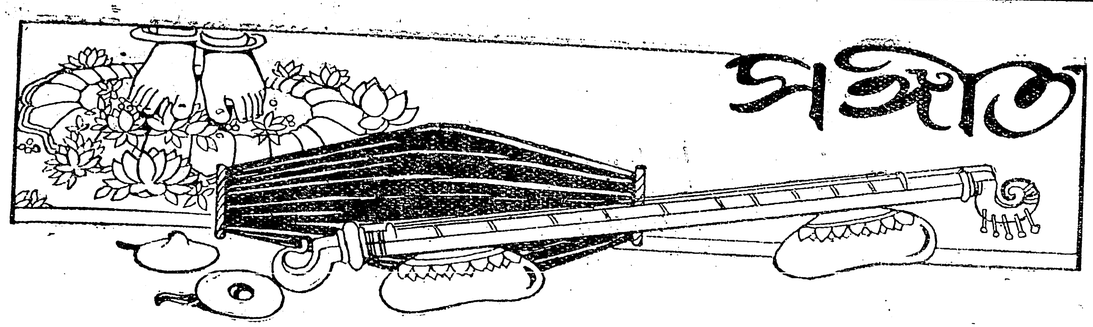

স্বরলিপি

কথা ও সুর—
কাজী নজরুল ইস্‌লাম

স্বরলিপি—
শ্রীউমাপদ ভট্টাচার্য্য এম্-এ, ও শ্রীজগৎ ঘটক

কত আর এ মন্দির-দ্বার, হে প্রিয়,
রাখিব খুলি।
বয়ে যায় যে লগ্নের ক্ষণ, জীবনে—
ঘনায় গোধূলি॥

নিয়ে যাও বিদায়-আরতি
হল ম্লান আঁখির জ্যোতি—
ঝরে যায় যে শুষ্ক স্মৃতির মালিকার
কুসুমগুলি॥

কত চন্দন ক্ষয় হ'ল হায়—
কত ধূপ পুড়িল বৃথায়—
নিরাশায় যে পুষ্প কত ও-পায়ে—
হইল ধূলি॥

ও বেদীর তলে কত প্রাণ—
হে পাষাণ নিলে বলিদান—
তবু হায় দিলে না দেখা, দেবতা,—
রহিলে ভুলি॥

গা মা ‖ গমা -গমা -পণদা পা | মা -জ্ঞা রা রজ্ঞা | রা -সা ন্া রা | -সা -া -া সা ‖
ক র আ০ ০০ র০০ এ | ম ন্ দি র০ | দ্বা র্ হে প্রি | য় ০ ০ রা
যা০ ০০ য়০০ যে | ল গ্ নে র০ | ক্ষ ণ্ জী ব | নে ০ ০ ঘ

‖ সরা -সরজ্ঞরা সণ্ধ্া ধ্ণ্া | ধ্ণ্া -সরা -জ্ঞা -া | সরা -রমা -া -া | -সা া গা মা ‖
খি০ ০০০০ ব০ খু০ | লি০ ০০ ০ ০ | ০০ ০০ ০০ | ০০ ব য়ে
ণা০ য়্ ০০০ গো০ ধূ০ | লি০ ০০ ০ ০ | ০০ ০০ ০০ | ০০ ক ত

গা মা II পা -া -া পা | পদা -পমা মগা -মা | পা -া -া -া | -া । পা পা I

নি য়ে যা ০ ও বি দা০ য়০ আ০ র তি ০ ০ ০ ০ ০ হ ল

I মা -া -ধপা মা | মজ্ঞা -া রা রজ্ঞা | রসা -া -া -া | -া । সা সা I

ম্লা ০ ন্০ আঁ থি ০ ০ র জ্যো০ তি০ ০ ০ ০ ০ ০ ঝ রে

I সরা -জ্ঞরা -সা ধ্ণ্া | সা -া সা রা | রজ্ঞা -রমা জ্ঞা রজ্ঞা | সা । -া সা I

যা০ ০০ য় যে০ শু ষ্ ক স্ম তি০ র্০ মা লি০ কী ০ র্ কু

I মজ্ঞা -রসা -ণ্া ণা | ধ্ণ্া -সরা -জ্ঞা -া | -সরা মা -া -গমা | -সা । গা মা I

সু০ ০০ ম গু লি০ ০০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০০ ০ ০ ক ও

[র্সা -র্সা -রর্সা]

গা মা II { পা ণা -ণা -ণা | পণা -ণা ণা -ণা | ধণা -ধণা -া -া | -পা । পা -পা } I

ক ত চ ন্ দ ন ক্ষ য় হ ল হা০ য়০ ০ ০ ০ ০ ক ত

I মা -া -মধপা পা | মজ্ঞা -া -রা রজ্ঞা | -সা -া -া -া | -া । সা সা I

ধূ ০ প০০ পু ড়ি০ ০ ল ব্০ থা য়্ ০ ০ ০ ০ নি রা

I সরা- জ্ঞরা- সা ধ্ণ্া | সা -া সা রা | রজ্ঞা রমা জ্ঞা রজ্ঞা | -সা -া । । I

শা০ ০০ য়্ যে০ পু ষ্ প ক ত০ ০০ ও পা০ য়ে ০ ০ ০

I সা -সজ্ঞরসা -ধ্ণ্া ণ্া | ধ্ণ্া -সরা -জ্ঞা -া | -সরা মা -া -গমা | -সা । গা মা II

হ ই০০০ ল০ ধূ লি০ ০০ ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০ ০ ক ত

পা পা II পমা -ধপা -া মপা | মজ্ঞা -মা পা পণা | পা -ণা -ণা -র্সা | -ণর্সা । র্সরা র্স I

ও বে দী০ ০০ র্ ত০ লে০ ০ ক ত০ প্রা ০ ০ ০ ণ০ ০ হে০ পা

I ণা -া -া ণা | ধণণধা- পক্ষপা ধা ধর্সণধা | পা -া -া -া | -া । পা পধা I

যা ০ ণ্ নি লে০০০ ০০০ ব লি০০৮ দা ০ ন্ ০ ০ ০ ত বু০

I ধা -মা -া পা | মা -জ্ঞা রা ঋা | রসা -া ন্া রা | -সা -া -া সা I

হা ০ য়্ দি লে ০ না দে খা০ ০ দে ব তা ০ ০ র

I সজ্ঞা -রসা -ণ্া ণ্া | ধ্ণ্া -সরা -জ্ঞা -া | -সরা মা -া -গমা | -সা । গা মা II II

দি০ ০০ লে ভু লি০ ০০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০০ ০ ০ ক ত

ভারত-শিল্পে অতি-আধুনিকতার ভয়

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

অতি-আধুনিকতার ঢেউ উঠেচে আর্টের মধ্যে। অন্য সব ঢেউ যেদিক থেকে আসে, এও সেই পশ্চিম থেকে এসেচে; আর তার তালে তালে আমরা নেচে উঠেচি। অবশ্য পশ্চিমের যা ঢেউ, তাই আমাদের পক্ষে আনন্দকর, এ কথা ধরে নিলে আর কোনো গোলই থাকে না। কিন্তু যাঁরা তা' মেনে নিতে চান না, তাঁরাই দেখি সমস্যা জটিল করে তোলেন। এখন দেখা যাক্, অতি-আধুনিকতায় মূলটা ইউরোপ কোথায় রোপণ করেচেন এবং তার শাখা-প্রশাখার প্রসারই বা কি ভাবে কত দূর এগিয়েচে। দেখলে দেখতে পাই যে, তার মূল হ'ল একালের সভ্যতার আওতায় অসভ্যদের অসম্পূর্ণ পটুতার আদর্শে; এবং ডালপালার বহর এখনো সংকীর্ণ। যাঁরা কোমর-বেঁধে-আধুনিক, বা তরুণের দল, তাঁরা বলবেন সংকীর্ণ বটে, কিন্তু প্রবল। আবার অপর পক্ষ হয়ত জোর গলায় বলবেন যে দল টেঁকলে হয়। অতি-আধুনিক দল টিকে আছেন অতি আধুনিক ক্রিটিকের কলমের ও করতালির জোরে। ক্রিটিক যা দেখেন বা না দেখেন, তাও কথার রঙে ফলিয়ে গেলেন। অনেক সময় কুটো অবলম্বনে কাব্য রচনাও হ'তে দেখা যায়। তার ফলে হয় অনেক সময় এই যে, তাঁদের লেখার খোরাক জোগাবার ও বাহাবা পাবার লোভে শিল্পীদের মধ্যে লেগে যায় স্ক্রু প্যাঁচ, জিলিপির প্যাঁচ বা ছোপছাপ ধাচ প্রভৃতি অতি অদ্ভুত ও কিম্ভূতের প্রতিযোগিতা। শেষটা পর্ব্বত প্রমাণ হয়ে ওঠে এর ভার। সার অপেক্ষা ভার হয়ে ওঠে পর্ব্বত-প্রমাণ। এই জন্যে সংখ্যায় কম অতি-আধুনিক শিল্পীরা থাকায় এখনো পর্য্যন্ত যাঁরা জগতে শিল্পকলায় নাম করেচেন, তাঁদের সম্মান এখনো ঘোচেনি। আর্ট গ্যালারী-গুলো অতি-আধুনিকের কবলে কবে পড়বে জানি না; যদি কখনো পড়ে, হয়ত তখন সনাতন আর্ট সংহারের পথ মুক্ত হবে। কিন্তু তার ভয়ের কোনোই কারণ দেখি না। কেন না আর্ট কেবল কতকগুলি রেখা-সমষ্টিকে স্বচ্ছন্দে সাজিয়ে স্বছন্দে ছেড়ে দিলেই যদি হ'ত, ত art composition এর কেতাবের চার্টগুলিই আর্ট হয়ে উঠ্‌তো। Abstract art বল্লে আমরা বুঝি ছন্দের ধ্বনি। যেমন বাণীকে বাদ দিয়ে ধ্বনি শুধু জোযনা করে ছন্দ রচনা করলে কাব্য হয় না, হয় অব্যক্ত-অবুঝ তবলার বোল, তেম্‌নি ছবি আঁকার রেখা যদি চেহারা বাদ দিয়ে খালি রেখার কাঠামোর সাজাবার কৌশল দেখানোতেই পর্য্যবসিত হয়, ত সেটা হয়ে ওঠে—সেই নীরস চোরাগণ্ডি, যেখান থেকে সীতা-দেবীকে রাবণ হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল, সেই রাক্ষুসে গণ্ডি; তার ভিতর প্রাণ নেই আছে গণ্ডীর রেখাটি। অতি-আধুনিক বল্‌বেন, তা' নেই বা চেহারা ফুট্‌ল, নেই বা ছবিটা কিছু বল্‌লে? ছবিটা ছবির মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে স্থির! অতি-সনাতনী পন্থার চেয়ে অতি-আধুনিক পন্থার বিপদ হচ্চে এই যে, আর্টে 'ডেমক্রাসী' চলে না। সস্তা বাজার-চলিত করবার সহজ উপায় অসংখ্য থাকতে পারে, কিন্তু তার মূল্য বাজারেই পর্য্যবসিত। আর্টের কাঠামোটাকে নিয়ে যা কিছু করাই আর্টের চূড়ান্ত নয়। তাহলে অশিক্ষিত পটুয়ার পটে বাজার ছয়লাপ হয়ে যাবে।

একদা ইউরোপ শিখিয়েছিল প্রকৃতির নকল করাই আর্ট; এখন আবার Paul Klee, Pablo Picasso, Jaun Gris, Fernand Leger, Andre, Masson, Joan Miro প্রভৃতি শিল্পীরা দেখাচ্চেন যে, প্রকৃতির প্রতিকৃতির যত প্রকারের বিকৃতিই হ'ল আর্ট। আমাদের দেশের সমস্যা এই যে, ইউরোপকে আর্টের মাষ্টারীতে বাহাল ক'রে নিশ্চিন্ত হয়ে আছি। একদিকে ইউরোপের এ্যাকাডামীর ভণ্ডামী, অপরদিকে এই অতি-আধুনিক খ্যাপামীর মাঝ-পথে পড়ে আমরা আমাদের অন্তর্য্যামীকে নির্য্যাতিত করচি। জাপানকে একসময় কাউণ্ট ওকাকুরা এই up-start বা বিধর্ম্মী আর্টের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন দেশের শিল্পের ঐতিহ্যের সাধনায় শিল্পীদের চিত্তকে

উদ্বুদ্ধ করে। তেম্‌নি আমাদের দেশে শিল্পী শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর করেচেন। দেখচি যে, এই ২৫।৩০ বৎসরের মধ্যেই তাঁর প্রেরণায় দেশীয় শিল্পের গৌরব করতে সারা ভারতবর্ষ শিখেচে; কিন্তু এখন আবার বাঙলা দেশের মধ্যে বিদেশী অতি-আধুনিক শিল্পের নকলে দেশের কলা-সরস্বতীর নির্ব্বাসনের আয়োজন হবার সূত্রপাত হয়েচে। তাই ভক্তরা তাঁর ভাসানের জন্যে খালি শোকবস্ত্র না পরে তার সাধনা আরতির দ্বারা প্রাণ-প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করলেই ভাল হয় না কি? বাঙলা দেশ এত অল্পকালের মধ্যেই দেশের শিল্পে বীতরাগ হয়ে যে তার সপিণ্ডকরণের ব্যবস্থা কয়তে সহসা বস্‌বে, তা' আমাদের ধারণার অতীত। অবনীন্দ্রনাথের নব নব উন্মেষশালী প্রতিভার এই মধ্যাহ্ন কাল; এখনই অকালে তাঁর প্রতিষ্ঠানটি ভেঙেচুরে যায়, এর চেষ্টা কোনো দেশহিতৈষীই করতে চাইবেন না। তা ছাড়া দেশের আর্টের বিষয়ে আমাদের দেশের লোকের দরদ হবারই কথা।

দেশের শিল্পের কাঠামোটা নিয়েই খেলা এতদিন হয়েচে, —অজন্তা ধরণ, মোগল ধরণ, তিব্বতি, রাজপুত প্রভৃতির ধরণের অনুকরণে। সত্যিকার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা যে পুরোহিত করেচেন, তিনি তাঁর স্বধর্ম্ম কখনো ত্যাগ করেননি। তাঁর শিষ্যদের ভিতর চাঞ্চল্য দেখা দিয়েচে, Masson, Miro, Klee, Gris প্রভৃতি বিদেশী শিল্পীদের অতি শিশুর ভানে অতি অদ্ভুত রচনার সুলভতার সুযোগ দেখে। ছবি আঁকার জন্যে কোনো বিষয় (subject) বর্ণনার দরকার যদি না হয়, আঁকতে আঁকতে ছবি আপনি যদি ফুটে ওঠে, তাহলে শিল্পীরা মাভৈঃ বলে কাগজ ভরাতে লেগে যাবেন। তাহ'লে অত ছবির ফ্রেম ও কাচ যোগানোই অসম্ভব ব্যাপার হয়ে উঠ্‌বে। আর যদি রচনা করতে হ'লে বিষয়-বস্তুর নির্ব্বাচন বা নিরিখের প্রয়োজন থাকে, তাহলে শিল্পকলা সহজ-সুলভ হ'তে পারবে না। তাহলেই ব্যক্তিগত অঙ্কন-পদ্ধতি কেবল নয়, বিষয়-বস্তুর চিন্তা-শক্তিরও বিষয় ভাববার বিষয় হবে। আমাদের দেশের আর্টের ভিতর এইটেই বেশী ফুটেচে প্রাচীন ভরহুত, সাঁচী, অমরাবতী প্রভৃতির পাথরের চিত্রগুলিতে। Abstract ভাবেও বিদেশী শিল্পীরা যদি এগুলিকে দেখেন ত তার মধ্যে রেখা-ছন্দেরও আনন্দ তাও পাবেন, আবার যাঁরা জাতকের গল্পগুলি যা তাতে ফেলানো হয়েচে তা জানেন, তাঁরাও সেগুলি দেখলে দেখতে পাবেন যে বিষয়-নির্ব্বাচন-ক্ষমতাও সে সব প্রাচীন শিল্পীদের কত অসাধারণ ছিল।

ছবি এক হিসাবে abrstact না হয়ে যায় না—যথা, একই ছবিতে ঘটনা-পরম্পরা দেখানো যায় না (সিনেমা ছাড়া—সিনেমা আর্ট নয়)। তাই ছবিতে juxta-position এবং বিষয়-নির্ব্বাচনের বিশেষ প্রয়োজন। বিষয়-নির্ব্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে তার আনুসঙ্গিক সজ্জা প্রভৃতিরও প্রয়োজন। অবশ্য সুশ্রী চেহারা আঁকাই আর্ট, এ কথা এখনকার যুগে কেহই বল্‌বেন না; কেন না সুন্দরের প্রকাশ দুনিয়ার সব তাতেই আছে; কেবল সেটিকে আহরণ করার ক্ষমতার উপরই তার অভিব্যক্তি। আর্টের কাঠামোটির বিশেষ ভাবে দরকার হয় কারুকার্য্যের যেখানে দরকার, তার প্রকাশ কাঠামোটির মোলায়েম সুছন্দ সজ্জায়। তাই যে ছবি কেবল রেখা-চাতুরীতে দাঁড়িয়ে আছে, কিছু বলচে না যে কি ভাব তার মধ্যে আছে, সেটাকে ছুঁচের কাজে কার্পেটে ফলিয়ে তোলা দেখচে, সেটি সেখানে কেমন খাপ খেয়ে গেছে। মোগল আমলের ছবিগুলি বৌদ্ধ আমলের ছবিগুলির এই কারণেই অনেক পৈঁঠা নিচে। যদিও উভয় ক্ষেত্রেই শিল্পীদের নামধাম গাঁই গোত্র আমাদের কিছুই জানা নেই, তবুও অজন্তার ছবির প্রাণবান সুবর্ণিত ভাব সহজেই ধরা পড়ে। মোগল-রাজপুত শিল্পের রঙে ও রেখায় সূক্ষ্মতার বাহার ছবির প্রাণের দিকে খাটো করেচে। হয়ত আধুনিক রেখাগুলি শিল্পীর চক্ষে রেখাঙ্কনের দোষ অজন্তার ছবিতে বেশী আছে—কিন্তু তাতে যে জীবন-কথা ব্যক্ত করচে প্রাণবেগে, সে প্রাণবেগ মোগল যুগের আর্টে বিরল। অবশ্য এ বিষয়ে নানান মুনির নানান মত থাকতে পারে। কিন্তু আমাদের নিকট যা' ঠেকে তাই এস্থলে বলা হ'ল।

অতি-উৎসাহী অতি-আধুনিক বিলাত-ফেরতের দল বিলাতের অতি-আধুনিক আর্টের প্রদর্শনীগুলি দেখে দেশে ফিরে আসেন এবং সেইমত একটা ব্যাপার দেশের আর্টে না দেখতে পেলেই মনঃক্ষুণ্ণ হ'ন্। বেশীর ভাগ তাঁরাই ইউরোপের অতি-আধুনিকতার ঢেউ দেশে এনেচেন। দেশের ঐতিহ্যের ভিতর দিয়ে অতি-আধুনিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অতি-আধুনিক আর্ট যদি কোনো শিল্পী সৃষ্টি করতে পারেন ত তাঁর কথাই আলাদা। কিন্তু এই ইউরোপীয় আমদানী আর্টের ফলে দেশের নিজস্ব আর্টের যে এক সজীবতার সাড়া পড়চে তাতে না দ' পড়ে, তাই ভাবনা হয়। এক্ষেত্রে শ্রীভগবানের গীতার উক্তি বারবার মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন মনে করি "স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয়ঃ পরোধর্ম্ম ভয়াবহঃ।"

নারী

শ্রীশিবপ্রসাদ মুস্তোফী, বি, এ,

প্রায় পাঁচ বছর পরে তা'র চিঠি পেলুম। সে খিদিরপুরে বাপের বাড়ীতে এসেচে; আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমাকে যেতে লিখেচে।

সকালে চিঠিটা পাওয়ার পর থেকে সব্ কিছুই ভারী ভালো লাগ্‌চে। এমনও হয়, দীর্ঘ পাঁচ বছর কেটে যাওয়ার পরেও স্মৃতি মরে না, সে ক'ল্‌কাতার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ব্যাকুল চিঠির ইসারা করে।

ফিট্‌ফাট্ হ'য়ে রাস্তায় বেরিয়েচি। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা দেশবন্ধু-পার্কের দিকে যাচ্চে। সাঁ ক'রে একটা বাইসিকল্ একদিকে হেলে চ'লে গেলো। মোটরে যাচ্চে একটি পুরুষ ও একটি নারী, দুজনেরই মুখে চোখে অত্যন্ত খুসীর ভাব।

হ্যারিসন রোড, ওয়েলিংটন, ধর্ম্মতলা, ভবানীপুর, কালীঘাট, ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে শ্যামবাজারের বাস্ ছাড়্‌লো। চোখের সাম্‌নে দিয়ে চ'লে যাচ্ছে কত মোটর, ট্রাম, বাস; ফুট্‌পাতে অগণ্য নরনারী। আমাদের বাস্ একটু আস্তে চল্‌চে।

হঠাৎ দেখলুম, একটি বৃদ্ধ স্থানাভাবে দাঁড়িয়ে রয়েচেন। তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ব'ললুম, এই যে, আপনি এইখানে বসুন না।

থাক্, থাক্ বাবা, তুমি ব'সো—

সে কি হয়? আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ যাবেন?

বৃদ্ধকে বসানো গেলো। তুমি বৃদ্ধ, তোমাকে কি কেউ আজ তা'র পাঁচ বছরের অদর্শনের ব্যথা অত্যন্ত সাধারণ ভাষায় লিখে জানিয়েচে?

ধর্ম্মতলায় বাস্ বদল ক'রে ট্রামে উঠ্‌লাম। ও-দিকে ট্রামে যেতেই ভালো লাগে, তা ছাড়া বেশ জোরেই যায়।

খোলা মাঠের মধ্য দিয়ে শব্দ ক'রে ট্রাম ছুটে চ'লে যায়। যেন কি এক অভাবনীয় সম্ভাবনার দিকে মহা আনন্দে সমস্ত পৃথিবী সশব্দে ছুটে চ'লেচে। বাইরে দুটি একটি ঘোড়ায় চড়া সাহেব দেখা যায়; কেউ বা গল্‌ফ্ খেল্‌চে। আমার সাম্‌নের সিটে দুটি তরুণী মেম ব'সেচে, মাথার টুপী খুলে রেখেচে, বব্ করা সোণালী চুল উড়্‌চে।

তখন সন্ধ্যা হ'তে আর বেশী দেরী নেই। যখন গিয়ে দাঁড়ালাম, দেখি ঘরের দরজার কাছে ব'সে গা-ধোয়ার পরে মাথার খোঁপা ঠিক্ ক'র্‌চে। সীঁথিতে সিঁদুর।

আমাকে দেখে মাথা তুলে একবার ব'ল্‌লে, কি ভাগ্যি।

আমি কোন উত্তর না দিয়ে ঘরের ভিতরে গিয়ে বস্‌লাম। খোঁপা ঠিক্ ক'রে এবং নিজের আরো কি কাজ শেষ ক'রে যখন ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ালো, তখন আমার ভারী বিশ্রী লাগ্‌চে। দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে যা'র সঙ্গে দেখা হবে, সে কোথায়?

হঠাৎ লক্ষ্য ক'রলুম, ও অন্তঃসত্ত্বা।

বাইরে সন্ধ্যার আকাশে কি চাঁদ উঠ্‌লো? আজও বোধ হয় একটি একটি ক'রে তারাগুলি ছড়িয়ে পড়্‌বে।

কবি, তোমার বীণায় ছন্দের তাল কাটেনি ত? দেখো তোমার কাব্যের শেষে যেন সত্যের অপমান না হয়।

ওর বিবাহের সময় ভেবেছিলাম, বিধাতা মানুষের চেয়ে নিষ্ঠুর।

—কতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা বলো ত, বিজনদা। ওঃ, তা প্রায় চার বছরেরও বেশী হবে। তা' তোমরা তো আর আমাদের খবর নাও না, ম'রে গেলেও না। মা ব'লছিলেন, তুমি নাকি অনেকদিন এখানে আসো নি। মা ব'লছিলেন, আমি চ'লে গেছি ব'লেই আসো না। আচ্ছা, এইবার আস্‌বে ত? এসো, এসো, মাঝে মাঝে এক-একবার তোমার গরীব বোন্‌টির কাছে এলে তোমার পয়সা বাজে খরচ হবে না। এখনো সেই রকম বন্ধুদের আড্ডা আছে ত? আচ্ছা, এটাই বা

তোমার কি রকম হ'লো শুনি? এক্‌জামিনে যে পাস্ ক'র্‌লে, সন্দেশ কই? দেখো সে আমি আদায় ক'রে নেবোই। তুমি কি আর আমার হাত থেকে এড়ান্ পাবে? হ্যাঁ, আমাকে কিন্তু ভাই খানকতক গল্পের বই এনে দিতে হবে, বুঝ্‌লে?

তা'র কথার উত্তর দেওয়ার অবসর পেয়ে ব'ললাম, হ্যাঁ, তা'র আর কি?

গল্পের বই কিন্তু, বুঝ্‌লে ত, গল্পের বই। তোমার সেই কবিতার বই পোষাবে না কিন্তু। এই সংসারে কি আর কবিতা কর্‌বার সময় আছে আমার?

এম্‌নি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লাম, সময় নেই তো গল্পের বই পড়্‌বে কখন?

সে আমি পড়্‌বো 'খন, তোমাকে ভাব্‌তে হবে না। খেয়ে নিয়ে বই হাতে ক'রে শুলে ঘুমটা শীঘ্র আসে। তা'ছাড়া···অনেকগুলো বই দিয়ো কিন্তু, তখন তো আর কোন কাজ থাক্‌বে না।

একবার জিজ্ঞাসা ক'রলে, আমি এখনো কবিতা লিখি কি না।

যাক্, যাক্, সে সব্ পাগলামী—

তা'র মুখের দিকে একবার অত্যন্ত ব্যাকুল হ'য়ে চেয়ে দেখ্‌লাম। হেসে উঠ্‌লো, ব'ল্‌লে, এইবার বল্‌চি, বিজনদা, বিয়ে-থা করো। একটি টুকটুকে বউ আস্‌বে ঘরে, তা'কে কবিতা পড়িয়ে শোনাবে—

সমস্তটা অত্যন্ত কুৎসিত মনে হ'লো, যা'কে বলে vulgar; এত বিশ্রী লাগ্‌লো যে তখনই সেখান থেকে চ'লে আস্‌তে ইচ্ছা হ'লো। হাতে যদি তখন চায়ের বাটি থাক্‌তো এবং সেটা প'ড়ে ভেঙে গিয়ে ঝন্‌ঝন্ আওয়াজ ক'রে উঠ্‌তো, তবেই পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মিল্‌তো। আমি সমস্তই শুনে গেলাম। অত্যন্ত কুৎসিতভাবে 'জলটল' খেয়ে, আবার আসার প্রতিজ্ঞা ক'রে চ'লে এলাম।

তবু আশা ছিলো যে যখন বিদায় দেবে তখন তা'র চোখের মধ্যে এমন একটি অদ্ভুত ইঙ্গিত থাক্‌বে, যা শুধু বুঝ্‌বো আমি; এবং যা আমার সমস্ত ব্যথাকে মধুর ক'রে দেবে। ওর ঠোঁটের একটু হাসি, ওর চোখের একটু চাওয়া!

যে পথ দিয়ে এসেছিলাম, সেই পথেই ফিরে যাই। ট্রামের শব্দ শুধু কাণে শুন্‌চি। আরো জোরে চলুক্। যেন কি একটা ভীষণ কুৎসিতের সামনে থেকে পালিয়ে যেতে পার্‌লে বাঁচি। পথে আস্‌তে বিশেষ কিছু লক্ষ্য করিনি। নিজের কথাই ভাব্‌ছিলাম। ওর পাঁচ বছর আগেকার কথা ভাব্‌ছিলাম। ওর লেখা চিঠিগুলো এখনো আমার কাছে আছে। ওর দেওয়া মাথার কাঁটা আমার বালিশের তলায় রয়েচে।

একবার মনে হ'লো যে, আমরা একদিন পালিয়ে যাওয়ার কল্পনা ক'রেছিলাম। কোন্ সুদূর দেশে গিয়ে নিজেদের কুটীর তৈরী ক'র্‌বো, সেখানে আমাদের সন্ধান পাবে না কেউ।

গাড়ীতে গাড়ীতে ধাক্কা লেগেচে। যাত্রীর চোখের ওপরে হঠাৎ একসঙ্গে অনেক আলো, হাসি, রঙ্ নেচে ওঠে। তা'র পরেই অন্ধকার।·····

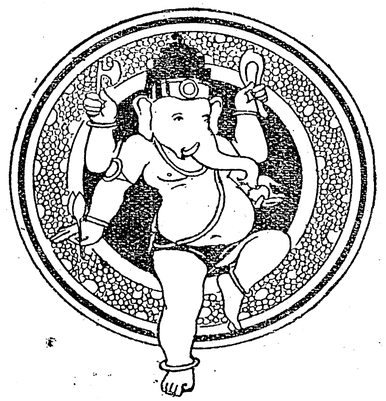

পারস্যে রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিগত ১১ই এপ্রিল দমদম হইতে বিমান-রথে পারস্য যাত্রা করিয়াছেন, এ সংবাদ পূর্ব্বেই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। তাঁহার সহিত তাঁহার পুত্রবধূ শ্রীমতী প্রতিমা দেবী ও প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় গমন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অমিয়বাবু ভ্রমণ-পথের বিভিন্ন স্থান হইতে বিমান-ডাকে যে সমস্ত বিবরণ ও সংবাদ যতদূর প্রেরণ করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

আমরা গত ১১ই এপ্রিল প্রাতে ৬টায় দম্‌দম্ ত্যাগ করিয়া বেলা ১০টা ১০ মিনিটের সময় এলাহাবাদ পৌঁছি। আকাশ-ভ্রমণকারীর নিকট বাঙ্গালার দৃশ্য বাস্তবিকই যেন এক অপরূপ ছবি। তাহার সেই শ্যামলাঞ্চল-ঘেরা পল্লী-গ্রাম, নদী, পুকুর, মন্দিরশ্রেণী ও ছায়া-ঢাকা পথঘাট আকাশ হইতে এক বিচিত্র শোভা চোখের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করে।

মানভূম ও হাজারীবাগ জেলার পর্ব্বতশ্রেণী ও ঘন-বনের একটা নিজস্ব গাম্ভীর্য্য আছে। যুক্ত-প্রদেশের বিস্তীর্ণ মাঠ, প্রান্তর ও বিক্ষিপ্ত গ্রামসমূহ এবং হরিৎ ক্ষেত্র শস্য-শোভিত হইলেও বাঙ্গালার সেই নয়ন-স্নিগ্ধকর শ্যামলতা যেন সেখানে নাই। মারবারের দৃশ্য অতি উদার। ট্রেণের গবাক্ষ-পথে যেমন দৃশ্য দেখা যায়, বিমান-পোতের গবাক্ষ-পথেও ঠিক তেমনি পাহাড়, প্রস্তর ও সুদূরপ্রসারি অনন্ত বালুকারাশি আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। এই একঘেয়ে দৃশ্যের মাঝে মাঝে রাজপুত দুর্গের ভগ্নাবশেষ ও পাহাড়ের চূড়ায় সামরিক ঘাঁটীগুলি আমাদের চমক লাগাইয়া দিতেছিল।

এলাহাবাদ পর্য্যন্ত আমরা বেশ আরামেই আসিয়াছি। বিমান-পোতের কম্পন কিম্বা এঞ্জিনের গর্জ্জন আমাদিগকে একটুও বিচলিত করিতে পারে নাই। কিন্তু যতই আমরা যোধপুরের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম এবং গরম বাতাসের হাত এড়াইয়া বিমান-পোত যতই উপরে উঠিতে আরম্ভ করিল, এই শীতোষ্ণ বায়ুর তারতম্য হওয়াতে ততই আমরা অসুস্থ বোধ করিতে লাগিলাম,—আমাদের হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া যেন গোলমেলে হইয়া উঠিতেছে অনুভব করিতে লাগিলাম। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই—আকাশ-পথে ভ্রমণের আতঙ্ক-মিশ্রিত আনন্দ আমাদিগকে সুবিধা অসুবিধার কথা চিন্তা করিবারও অবকাশ দেয় নাই। ওলন্দাজ বিমান-চালকের দক্ষতা ও সৌজন্যের নিমিত্ত আমরা এই নূতন অভিজ্ঞতায় কিছুমাত্র অসুবিধা বোধ করিতে পারি নাই। বাস্তবিক আকাশ-পথে ভ্রমণ যে আজ এতখানি আরামপ্রদ হইয়া উঠিয়াছে তাহা আমরা স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই।

এলাহাবাদ হইতে যোধপুর পর্য্যন্ত কবির একটু ক্লান্ত ভাব আসিয়াছিল; কিন্তু তাঁহার চির-তরুণ চিত্ত বিকালের দিকে সকল ক্লান্তির ভাব দূর করিয়া দিয়াছিল। যোধপুরে আমাদিগকে সরকারী ভাবে অভ্যর্থনা করা হয়। প্রেসিডেণ্ট মহারাজ সিং আমাদিগকে চা-এর নিমন্ত্রণ করেন। রাজ-অতিথি রূপে আমাদিগকে সাদরাহ্বান করা হয় এবং সন্ধ্যার সময় স্বয়ং মহারাজা বাহাদুর নিজে আসিয়া কবির কক্ষে উপস্থিত হন ও সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন। মহারাজা নিজেও একজন বিমান-চালক। তাই, তিনি কবিকে আকাশ-পথে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হন এবং বলেন যে, অন্যান্য বহু বিষয়ে কবি যেমন অগ্রগামী, এই আকাশ-ভ্রমণেও দেশবাসীর নিকট তিনি যে পথপ্রদর্শক হইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? মহারাজা যোধপুরে একটী ফ্লাইং ক্লাব গঠন করিয়াছেন এবং তাঁহার নিজের দুইটী বিমান-পোত আছে। শুনিলাম যে, ঐ ফ্লাইং-ক্লাব উদ্বোধন করিবার দিন মহারাজা নিজে আকাশে নানা রকম অদ্ভুত বিমান-পরিচালন-চাতুর্য্য দেখাইয়াছিলেন।

সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে আমরা যোধপুর পরিত্যাগ করি। করাচীর পথে আমাদের এই সকাল-বেলার ভ্রমণ ভারি চমৎকার লাগিয়াছিল। করাচী পৌঁছিতেই দেখা গেল, কবিকে সম্বর্দ্ধনা করিতে সহরের বিশিষ্ট অধিবাসিগণ সকলেই সমবেত হইয়াছেন। সেখানে বহু

বন্ধুবান্ধব ও করাচীর জনসাধারণ কবিকে সম্বর্দ্ধনা করেন। করাচীতে কয়েক মিনিট মাত্র আমরা ছিলাম। আমাদের বিমান-পোত চলিতে আরম্ভ করিলে সমবেত পুরুষ ও মহিলাবৃন্দ মিলিত কণ্ঠে যখন "জন গণ-মন-অধিনায়ক জয় হে" সঙ্গীত গাইয়া উঠিলেন, তখন প্রাণে প্রচুর আনন্দ অনুভব করিলাম। কবিকে তাঁহার বন্ধুগণ যে ফুল ও ফল উপহার দিয়াছিলেন, সে কথা ভুলিতে পারিব না। করাচী রবীন্দ্রনাথ-নাট্য ও সাহিত্য ক্লাব যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই অত্যন্ত প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কবি যখন করাচী আসিয়াছিলেন, তখন তিনি মিঃ মেটার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিঃ মেটা ও মিঃ গুরুদয়াল মল্লিকও সেদিন আমাদের অভ্যর্থনায় উপস্থিত ছিলেন।

করাচী হইতে জাস্ক ভ্রমণ অত্যন্ত আরামপ্রদ হইয়াছিল। বেলা ১১টায় আমরা পুনরায় আকাশে উঠি এবং দেখিতে দেখিতে সিন্ধু দেশের মরুভূমি আমাদের দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যায়। তারপরের দৃশ্য অতি চমৎকার;—এক দিকে বেলুচিস্থানের জ্বলন্ত ধু ধু বালুকারাশি, অপর দিকে পারস্য-উপসাগরের নীল জলোচ্ছ্বাস। তখন বেশ ঠাণ্ডা বোধ হইতেছিল, বাতাসও বেশ স্নিগ্ধ ছিল। আমরা আরাম-কেদারায় হেলান দিয়া কমলা লেবু খাইতে খাইতে দূরে তটভূমি ও সাগরের দৃশ্য দেখিতেছি ও কত কল্পনার সাগরে বিচরণ করিতেছি, এমন সময় কবিকে পারস্য দেশে 'স্বাগতম্' সম্ভাষণ জানাইয়া বেতারে খবর আসিল—

বুসায়ার হইতে—

জনাব ডক্টর ঠাকুর,

পারস্য-সাম্রাজ্যের সীমানায় আপনার আগমনে আমি আপনাকে সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। আমি নিজে আপনাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উৎসুক চিত্তে অপেক্ষা করিতেছি।

তেলখানি,

পারস্য উপসাগর ও পারস্যের দক্ষিণ বন্দর সমূহের গভর্ণর জেনারেল।

অপরাহ্ণ ২-২০ মিনিটের সময় আমরা জ্যাস্ক পৌঁছিলে পারস্যের রাজকর্ম্মচারীগণ আমাদের অভ্যর্থনা করেন। জ্যাস্ক পারস্য-সাম্রাজ্যের মরুভূমির একটী ঘাঁটী-বিশেষ।

এখানে কবি পারস্যের গভর্ণরের অতিথি রূপেই অবস্থান করিবেন। জাস্ক অতি অদ্ভুত জায়গা। এখানে কোন গাছ নাই, শুষ্ক বায়ু কেবল হু হু করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। দূরে সমুদ্র-বেষ্টিত গ্রামটী দেখা যায়। বেতার-ষ্টেশন ও বিমান-পোতাশ্রয়ের জন্যই এই স্থানটীর একটু কদর বাড়িয়াছে। ইম্পিরিয়াল বিমান-বিভাগ, কে এল এম ও ফরাসী বিমান-বিভাগ প্রত্যেকেই তাঁহাদের পূর্ব্ব-দেশীয় বিমান চলাচলের পথে এখানকার বিমান-পোতাশ্রয়ে আশ্রয় লইয়া থাকেন।

পারস্যে রবীন্দ্রনাথ

কবি সদলবলে দক্ষিণ সমুদ্রতীরবর্ত্তী বুসায়ারে পৌঁছিলে বিরাট জনসভার আয়োজন হয় এবং সরকারী ভাবে ও নাগরিকদের পক্ষ হইতে কবিকে মানপত্র দেওয়া হয়। তাহার পর কাজরাণ নগরে সম্বর্দ্ধনায় সমস্ত নগরবাসী উপস্থিত ছিল। ভোজসভারও আয়োজন হইয়াছিল। ১৬ই তারিখে সিরাজে পৌঁছিলে সরকারী ভাবে কবিকে অভ্যর্থনা করা হয়। সামরিক ভাবে সম্মান প্রদর্শন করিয়া কবিকে গভর্ণরের প্রাসাদে লইয়া যাওয়া হয়। নাগরিক এবং সাহিত্যিকদের পক্ষ হইতেও অভ্যর্থনা করা হয়। কবি গভর্ণরের প্রাসাদে অবস্থান করিতেছেন। ১৭ই তারিখ সেখ সাদীর সমাধিপ্রাঙ্গণে কবিকে সর্ব্ব-সাধারণের পক্ষ হইতে অভ্যর্থনা করা হয়। গবর্ণর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সাদির সমাধিক্ষেত্র দর্শন

১৮ই এপ্রিল তারিখে পারস্যের অন্তর্গত সিরাজ সহর হইতে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্ত্তী তারযোগে জানাইতেছেন :—

বুসায়ার নগরে আমাদের আর অবসর ছিল না। কবিকে বহু ভোজসভায় আপ্যায়িত করা হইয়াছে। সরকার-পক্ষ এবং জনসাধারণের পক্ষ হইতে মানপত্র দিয়া ভারতের মহান সন্তানের প্রতি সম্মান দেখান হইয়াছে।

বুসায়ারের পর আমরা কাজেরণে পৌঁছি। সেখানকার অভ্যর্থনা সত্যই অভূতপূর্ব্ব হইয়াছিল। কারণ, এই অভ্যর্থনায় উক্ত সহরের সমস্ত অধিবাসী যোগদান করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এখানে এক ভোজসভায়ও উপস্থিত হইয়াছিলেন।

১৬ই তারিখে আমরা স্বপ্নরাজ্য সিরাজ সহরে উপস্থিত হই। কবিকে সরকারী ভাবে অভ্যর্থনা করা হয় এবং সেনাদল সামরিক কায়দায় তাঁহাকে অভিবাদন করে। বহু নাগরিক ও সাহিত্যিক-সভা এশিয়ার মহাকবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আসিয়াছিলেন।

কবি স্থানীয় গবর্ণরের প্রাসাদে অবস্থান করিতেছেন।

পরদিন ১৭ই এপ্রিল বিশ্ব-বিখ্যাত কবি সাদীর সমাধিক্ষেত্রে অপূর্ব্ব শোভা দৃষ্ট হয়। জনসাধারণ এক প্রকাণ্ড সভায় মিলিত হইয়া তথায় মহাকবি রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করেন। এই সভায় গবর্ণর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং কবিকে অনেকগুলি মানপত্র দেওয়া হয়।

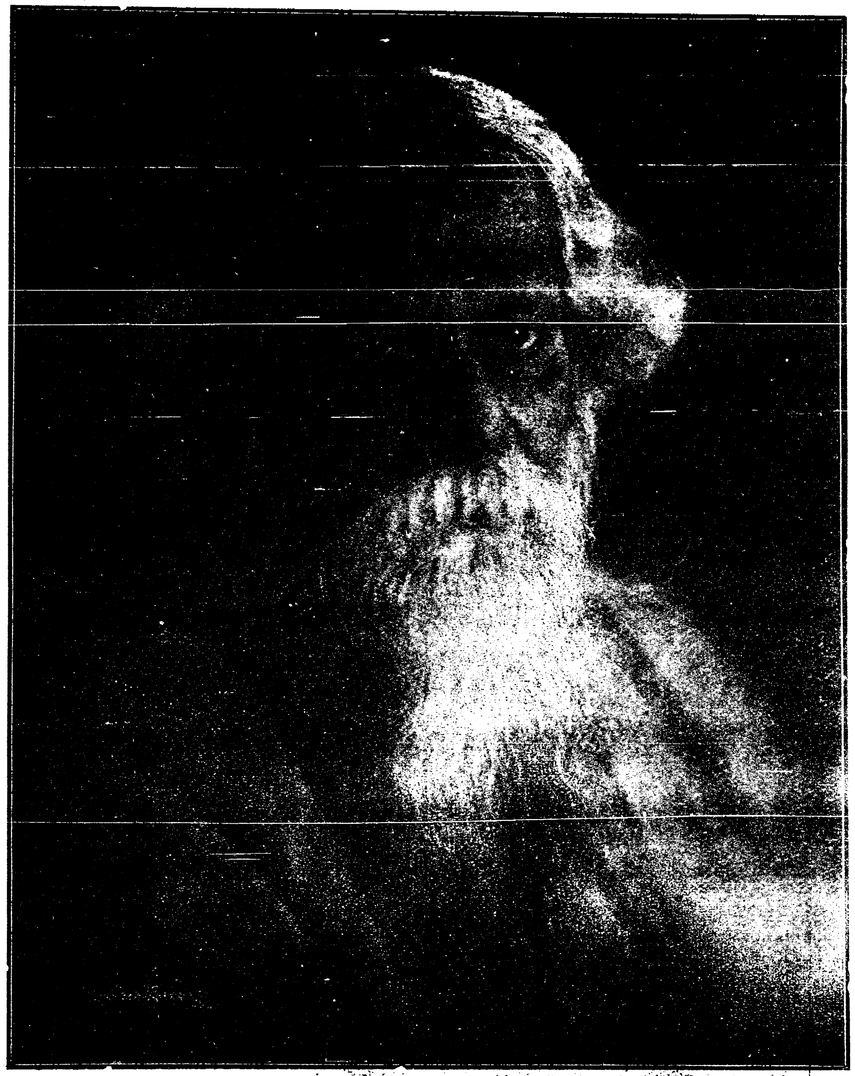

বিশ্বকবি শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯শে এপ্রিল বুসায়ার হইতে রাত্রি ৩টার সময় নিম্নলিখিত তারটি পাওয়া গিয়াছে :—

কবি হাফেজের সমাধিক্ষেত্র দর্শন করিয়া রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত ভাবাকুল-চিত্ত হইয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে সিরাজনগরীর খলিলাবাদ উদ্যানে অবস্থান করিতেছেন।

ইস্পাহানে বিশ্বকবি

ইস্পাহান, ২৩শে এপ্রিল—আমরা নির্ব্বিঘ্নে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। ইস্পাহান পরিদর্শনে কবি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। প্রফেসর হের্‌স্ ফেল্‌ডের সহিত অনেকক্ষণ ধরিয়া আলাপ হইয়াছিল।

গত কল্য কবির আগমনে তাঁহাকে রাজকীয় সম্বর্দ্ধনায়,

সম্বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। অন্ত সৈন্তবিভাগ, অসামরিক বিভাগ, শিক্ষা-বিভাগ ও বণিক-সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করা হইল। বুধবার দিন মিউনিসিপ্যালিটি জনসাধারণের পক্ষ হইতে টাউন-হলে এক মানপত্র দান করিবেন।

কবি এখানে চারি দিন অবস্থান করিবেন বলিয়া ইচ্ছা করেন। তার পর কোমের পথে তেহারাণ অভিমুখে যাত্রা সুরু হইবে।

তেহারাণ, ৩০শে এপ্রিল—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তেহারাণে পৌঁছিয়াছেন। নগরের ফটকের বাহিরে এক উদ্যানে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীবৃন্দ ও জনসাধারণ কর্ত্তৃক তিনি বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। শিক্ষামন্ত্রী তাঁহাকে মিঃ আসাদীর বাসভবনে লইয়া যান। মিঃ আসাদীর বাড়ীতেই তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কবিবরের উপস্থিতিতে সহরে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছে। এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হইতেছে।

তেহারাণ, ৩রা মে—বিগত কল্য অপরাহ্ণে পারস্যের মহামান্য শাহের সহিত কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের অনেকক্ষণ আলাপ হইয়াছে।

শোক-সংবাদ

স্বর্গত মহিমানাথ ভট্টাচার্য্য

স্বর্গত মহিমানাথ ভট্টাচার্য্য

ইনি স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র। ইঁহার জন্ম হয়—১৭ই এপ্রিল, ১৮৭০, মৃত্যু হইয়াছে ২৬শে মার্চ্চ, ১৯৩২ (বাঙ্গালা ১২ই চৈত্র, শুক্রবার, ১৩৩৮) প্রাতঃকালে। দেশবিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের তিন পুত্র, এক কন্যা ছিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র মন্মথনাথ (M.A.) বহু দিন পূর্ব্বেই পরলোকগত হইয়াছেন। ইনি বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম একাউণ্টেণ্ট-জেনারেল হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র মুণীন্দ্রনাথ (M A, B.L.) হাইকোর্টের উকিল ছিলেন। তিনিও অকালে চলিয়া গিয়াছেন। কন্যাও কিছু দিন পূর্ব্বে গত হইয়াছেন। ছিলেন কনিষ্ঠ পুত্র মহিমানাথ (B.A.)। তিনিও গত ১২ই চৈত্র, শুক্রবার প্রাতঃকালে চলিয়া গেলেন। তিনি অতি মিষ্টভাষী, অমায়িক, অহমিকাশূন্য ; সকলের সঙ্গে সমানে মিশুক অতি ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁর শরীর অনেক দিন হইতেই খারাপ হইয়া গিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে নানা স্থানে বায়ু পরিবর্ত্তনে যাইতেন। হাঁফানির ব্যারাম ছিল। হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পরলোকগত হইয়াছেন। মহিমানাথ প্রথম চাকরি গ্রহণ করেন ওপিয়ম্ ডিপার্টমেণ্টে। তার পর—যশোহর, মৈমনসিং, বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর, হাবড়া, আলিপুর প্রভৃতি স্থানে ডেপুটিগিরি করেন। কার্য্যে তাঁহার বিশেষ সুখ্যাতি ছিল ; তিনি সুবিচারক ছিলেন। আলিপুরে ডেপুটিগিরি হইতে ৮ বৎসর হইল পেন্সন লইয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণনগরে যখন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, তখন নদীয়ার ডিষ্ট্রিক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট হঠাৎ মারা গেলে, তাঁর পদেও কিছুদিন কাজ করিয়াছিলেন। স্বগ্রাম নারিটের প্রতি ইঁহার ভালবাসা ছিল। অনেক সময় তথায় গিয়া থাকিতেন। মহিমানাথ বাবুর পরলোকগত আত্মার কল্যাণের জন্য আমরা শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি।

স্বর্গীয় বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

৭৪ বৎসর বয়সে প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দেহাবসান হইয়াছে। এ যুগের শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে অনেকেই বামাপদ বাবুকে চিনিতে পারেন কি না সন্দেহ—কিন্তু ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এই চিত্রশিল্পীকে সেকালের দেশীয় রাজা মহারাজা হইতে পদস্থ বাঙ্গালী সকলেই যথেষ্ট স্নেহ ও সমাদর করিতেন। বর্দ্ধমান জেলার সাতগাছিয়া গ্রামে মাতুলালয়ে বামাপদ বাবুর জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই ছবি আঁকার দিকে তাঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল। পাঁচ ছয় বৎসর বয়সেই তিনি মাতুলালয়ে বারোয়ারীর সং দেখিয়া তাহার অনুকরণে গঙ্গামাটীর পুতুল গড়িয়া দিতেন। পরে শ্রীধরপুরে স্কুলে পড়িবার সময় মধ্যে মধ্যে সং গড়িয়া তাহাকে হরিতাল মাখাইয়া বাহির করিতেন এবং সঙ্গীদের বিকৃত মূর্ত্তি গড়িয়া নীরব ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করিতেন।—জনাইয়ের জমিদার পূর্ণচরণ মুখোপাধ্যায় ও প্রসিদ্ধ সাংবাদিক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শে তিনি সরকারী আর্ট স্কুলে ভর্ত্তি হয়েন। কিছু দিন এখানে শিক্ষালাভ করিবার পর তিনি তৈল-চিত্রাঙ্কন শিক্ষা করিবার ইচ্ছায় তখনকার প্রথিতনামা চিত্রকর প্রমথনাথ মিত্রের নিকট অয়েল-পেণ্টিং শিক্ষা করিতে চেষ্টা করেন এবং পরেও Becker নামে একজন অভিজ্ঞ জার্ম্মাণ চিত্রকরেরও নিকট কিছুদিন চিত্রাঙ্কন শিক্ষা করেন। ১৮৭৯ হইতে তিনি স্বাধীনভাবে ব্যবসা চালাইতে লাগিলেন। এলাহাবাদ, লাহোর, অমৃতসর, গোয়ালিয়র জয়পুর যোধপুর প্রভৃতি নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া তখনকার রাজা মহারাজগণের চিত্র অঙ্কিত করিয়া যথেষ্ট যশ ও অর্থলাভ করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন ও প্রায় ১২ বৎসর কলিকাতায় বসবাস করিতে থাকেন। এই সময়েই তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ সেন, মনোমোহন ঘোষ ও মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতির তৈল-চিত্র অঙ্কন করিয়া যশস্বী হয়েন। রবি বর্ম্মার পৌরাণিক চিত্র দেখিয়া তিনি পৌরাণিক চিত্র প্রকাশের ইচ্ছা করেন। তিনি পৌরাণিক চিত্রের শিল্পী হিসাবে বাঙ্গলার বাহিরেও যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করেন। তাঁহার "দুর্ব্বাসা শকুন্তলা" "শান্তনু গঙ্গা" "কলঙ্কভঞ্জন"

স্বর্গীয় বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

"অর্জ্জুন উর্ব্বশী" তাঁহার নাম এ দেশে চিরকাল অক্ষয় করিয়া রাখিবে। মানুষ হিসাবে তিনি সরল নিরহঙ্কার ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন। জীবনের শেষ কয় বৎসর তিনি শালিখায় বসবাস করিতেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত আত্মীয় স্বজনগণের শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

স্বর্গীয় অধ্যাপক পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়

হুগলী জেলার অন্তঃপাতী ইলিপুর গ্রামে ১৩০২ সালে পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্ম হয়। তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষগণের মধ্যে তাঁহার প্রপিতামহ পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম নৈয়ায়িক পণ্ডিত ৺প্রাণকৃষ্ণ ন্যায়ভূষণ মহাশয় ও শিক্ষকতায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও অভিধান প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা ৺বেণীমাধব গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ খ্যাত। তাঁহার পিতা

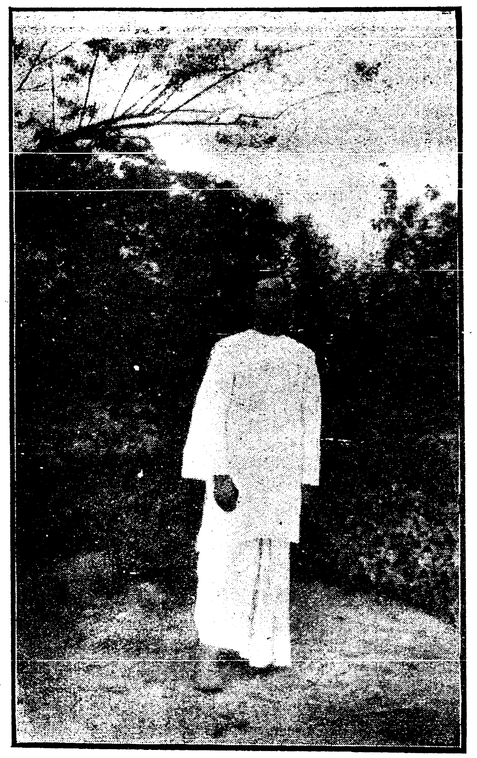

স্বর্গীয় অধ্যাপক পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়

৺কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় স্মৃতি-শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা করিতেন এবং তাঁহার গৃহসংলগ্ন বিস্তৃত চতুষ্পাঠী গৃহে বঙ্গদেশের অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিত ছাত্র-জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। বহু কাল হইতেই পঞ্চানন বাবুর তীব্র বিদ্যানুরাগ ও অদম্য জ্ঞানপিপাসার লক্ষণ পরিস্ফুট হয়, এবং শিয়াখালা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সর্ব্বনিম্ন শ্রেণী হইতে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী পর্য্যন্ত প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ১৯১২ খৃঃ ১৫৲ টাকা বৃত্তি লাভ করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি যখন বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন তখন তিনি ও উক্ত বিদ্যালয়ের হেড পণ্ডিত মহাশয় দুইজনে কাশীধামের ধর্ম্ম-রক্ষিণী সমিতির পরীক্ষা দেন ও তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া 'সরস্বতী' উপাধি লাভ করেন ও ৫৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল প্রকাশ হইবার পূর্ব্বেই অকস্মাৎ তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয় ও তাঁহার মাতা, অবিবাহিতা কনিষ্ঠা ভগ্নী ও ভ্রাতা জানকীনাথের ভরণ-পোষণের ভার আদর্শচরিত্র বিংশতিবর্ষবয়স্ক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত তুলসীদাস গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর পতিত হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অত্যধিক পরিশ্রম ও কষ্ট সহ্য করিয়া পঞ্চাননের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেন। সেই সময় পঞ্চানন-বাবুর জীবন অতিরিক্ত অর্থকষ্টের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইয়াছিল। দারিদ্র্যের কঠোর নিপীড়নে প্রতিভাশালী পঞ্চাননবাবু কিছুমাত্র বিচলিত বা হতাশ না হইয়া একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় বাণী সাধনায় আত্মনিয়োগ করিলেন ও বাগ্দেবীর অপার করুণা লাভ করিয়া ১৯১৬ খৃঃ বি-এ পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম স্থান অধিকার করিলেন ও ১৯১৯ খৃঃ এম এ পরীক্ষায়ও শীর্ষ স্থান লাভ করেন। ১৯১৮ খৃঃ এম-এ পরীক্ষার পূর্ব্বেই বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ১৯১৯ খৃঃ তাঁহার বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ হইয়া গুণগ্রাহী স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে ইউনিভার্সিটী কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক পদ প্রদান করেন এবং জীবনের শেষদিনাবধি বিশেষ কৃতিত্বের সহিত তিনি সেই বরণীয় পদের মর্য্যাদা রক্ষা করেন। পড়াশুনা করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র নেশা ছিল এবং সাংসারিক কর্ম্মে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকিয়া নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে তিনি যেন সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন। ইংরাজী সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ হইয়াও তিনি বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শন-শাস্ত্রে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। বালক-সুলভ সরলতা ও নিরহঙ্কার ছিল তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব। তাঁহার পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি অসাধারণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইতেন।

তাঁহার জন্মস্থান ইলিপুর গ্রামে ম্যালেরিয়া-নিবারণী সভা স্থাপনের তিনি ছিলেন প্রধান উদ্যোগী ও বহু দিন উক্ত সমিতির সম্পাদক রূপে কর্ম্ম করিয়া গ্রামের লুপ্ত শ্রী ফিরাইতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। কলিকাতা আদর্শ বাণীমন্দির নামক বিদ্যালয়ের পাঁচ বৎসর কাল তত্ত্বাবধায়ক থাকিয়া উক্ত অনুষ্ঠানের যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। ইহা ভিন্ন মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি বহু সদনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, জননী ভ্রাতা ও বহু আত্মীয় স্বজনকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া মাত্র ৩৭ বৎসর বয়সে তিনি অকালে পরলোকের যাত্রী হইলেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত আত্মীয় স্বজনগণের এই গভীর শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

স্বর্গীয় রাইমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিগত ১২ই বৈশাখ সোমবার রাত্রি এগারটার সময় আমাদের পরম বন্ধু, লব্ধপ্রতিষ্ঠ হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক রাইমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি মাস দুই হইতে সামান্য জ্বরে ভুগিতেছিলেন; অনেক চিকিৎসাতেও কোন ফল হইল না। ১২৬৭ সালের বৈশাখ মাসে অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন ২৪-পরগণার অন্তর্গত তারাগুনিয়া গ্রামে রাইমোহন বাবু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন পুলিশের দারোগা। রাইমোহন বাবুর অদৃষ্টে পিতৃদর্শন ঘটে নাই; তাঁহার ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব্বেই তাঁহার পিতৃদেব পরলোকগত হন। অনাথা মাতা ও পিতৃঋণ স্কন্ধে লইয়াই রাইমোহন বাবু জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজের চেষ্টা, যত্ন ও অধ্যবসায়ের বলে কলিকাতায় চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং হোমিও-প্যাথী চিকিৎসকপ্রবর ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য হন। তাঁহার চিকিৎসার খ্যাতি চারি দিকে প্রচারিত হয়। তাঁহার প্রণীত হোমিওপ্যাথী

স্বর্গীয় রাইমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

চিকিৎসা-গ্রন্থগুলি যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। তিনি কলিকাতা হোমিওপ্যাথা মেডিকেল কলেজ ও রাজকুমারী মেডিকেল স্কুলে অনেক দিন অধ্যাপনা করিয়াছেন। তাঁহার দুই পুত্র ও দুইকন্যা বর্ত্তমান আছেন। আমরা তাঁহার বিধবা সহধর্ম্মিণী পুত্রকন্যা ও আত্মীয়স্বজনগণের গভীর শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

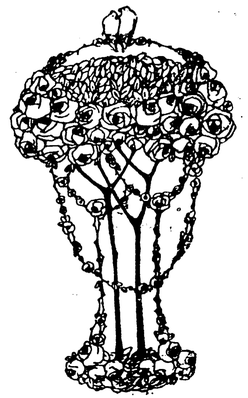

সাময়িকী

সংবর্দ্ধনা—

বর্ত্তমান বর্ষে ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়ের কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর মেয়র পদে পুনরায় নির্ব্বাচিত হওয়ার জন্য আমরা তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করিতেছি। বিগত বৎসরেও তিনিই মেয়র পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ বৎসর নির্ব্বাচন-ক্ষেত্রে তিনি ব্যতীত আরও দুইজন

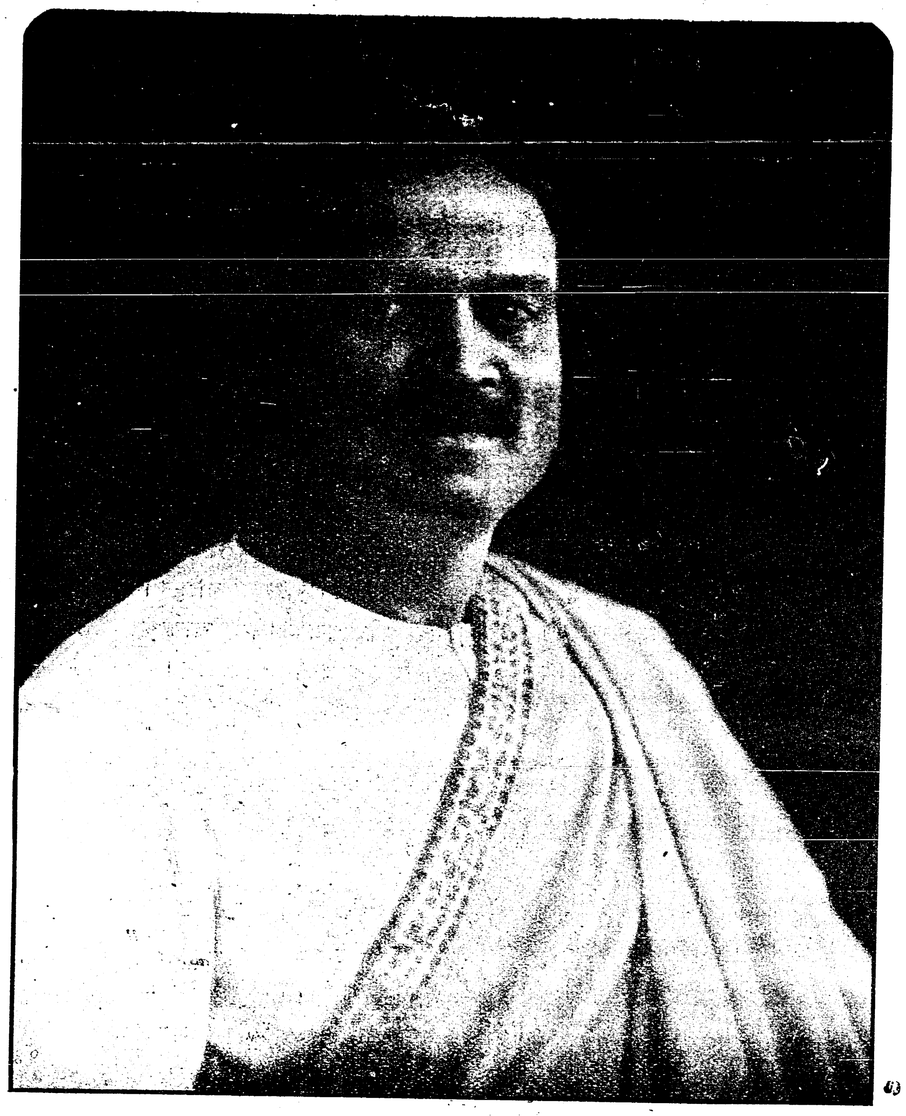

শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় (মেয়র)

(কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সৌজন্যে)

প্রার্থী অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চক্ষু-চিকিৎসক শ্রীযতীন্দ্রনাথ মৈত্রেয় মহাশয়; দ্বিতীয় জন সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব শ্রীযুক্ত এ, কে, ফজলল হক মহাশয়। অধিকাংশ সদস্যের ভোটানুসারে শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় উক্ত পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন; এ জন্য তাঁহাকেও আমরা সাদর অভ্যর্থনা করিতেছি।

শ্রীযুক্ত এস, এম, ইয়াকুব (ডেপুটী মেয়র)—কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সৌজন্যে

মহাশয়ই পুনর্নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মেয়র নির্ব্বাচনের পর ডেপুটী মেয়র নির্ব্বাচনে অধিকাংশ সদস্যের ভোটানুসারে খ্যাতনামা ব্যবহারাজীব শ্রীযুক্ত এস, এম, ইয়াকুব মহাশয়

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়—

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সপ্ততিতম জন্মোৎসবের আয়োজন দ্রুত চলিতেছে। ইতিমধ্যে কার্য্যনির্ব্বাহক

সমিতির দুইটী সভা হইয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে পত্রিকাদিতে তেমন প্রচার না হইলেও তাঁহার গুণমুগ্ধ বন্ধু-বান্ধবগণ এই উৎসবে নিজেকে সংশ্লিষ্ট রাখিবার জন্য স্বেচ্ছায় যোগদান করিতেছেন ;—শুনা যায় কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর অসুস্থতা নিবন্ধন তাঁহাদিগকে কর্ম্মকর্ত্তা করা হয় নাই। কিন্তু তাঁহারা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া জানাইয়াছেন যে, ইহাতে তাঁহাদের সহানুভূতি ও সমর্থন আছে। বিগত ১৮ই এপ্রিল সোমবার রামমোহন লাইব্রেরী-হলে এক সাধারণ সভা হয়। কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিকে অধিকতর প্রতিনিধিমূলক করিবার জন্য আরও কতকগুলি নূতন নাম যোগ করা হইয়াছে। কার্য্য-তালিকা যাহা প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, জনসাধারণের পক্ষ হইতে কলিকাতা কর্পোরেশন, বেঙ্গল নেশন্যাল চেম্বার অব কমার্স, বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ ও অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে আচার্য্য-দেবকে এক-একটি অভিনন্দন দেওয়া হইবে। আচার্য্য রায়ের কার্য্যাবলী ও আদর্শ চরিত্র সম্পর্কে যে-সকল বিখ্যাত লোক যাহা লিখিবেন, তাহা স্মৃতিপুস্তক হিসাবে প্রকাশিত হইবে, সভায় ইহাও স্থির হইয়াছে। ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (সভাপতি), শ্রীযুক্ত মেঘনাথ সাহা, ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ সত্যচরণ লাহা, শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারু ভট্টাচার্য্যকে লইয়া একটি সম্পাদকীয় বোর্ড গঠন করা হইয়াছে। বোর্ড ইতিমধ্যেই সভা করিয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। আরও স্থির হইয়াছে যে, সদস্যগণের নিকট হইতে দুই টাকা হিসাবে চাঁদা দ্বারা যে টাকা সংগৃহীত হইবে, এবং স্মৃতি-পুস্তকের বিক্রয় দ্বারা যে অর্থ লাভ হইবে, তাহার একটী পয়সাও অভ্যর্থনা-উপলক্ষে ব্যয় করা হইবে না ; সে সমস্ত টাকাই ছাত্রবন্ধু আচার্য্য রায়ের অভিপ্রায় অনুসারে দরিদ্র ছাত্র-ফণ্ডে জমা হইবে ; অভ্যর্থনার জন্য যাহা ব্যয় হইবে, তাহা আচার্য্য রায়ের গুণমুগ্ধ কয়েকজন বন্ধু ও ছাত্র সম্পূর্ণরূপে বহন করিবেন। এ ব্যবস্থা যে অতি সুন্দর হইয়াছে, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমরা অবগত হইলাম, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ হইতেই দলে দলে লোক সদস্য-শ্রেণীভুক্ত হইতেছেন।

সুনীতি সঙ্ঘ—

যাহাতে তরুণবয়স্কদিগের মন নীতি ও পবিত্রতার আদর্শে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, এবং যাহাতে সাহিত্য, অভিনয়, নৃত্য অথবা চিত্রের পথ দিয়া তাহাদের মধ্যে নীতির প্রতি অবহেলার ভাব অথবা অন্য কোনও রূপ দূষিত ভাব প্রসার লাভ করিতে না পায়, এই উদ্দেশ্যে "সুনীতি সঙ্ঘ" নামে একটি সঙ্ঘ স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে। দেশের কল্যাণের জন্য এইরূপ একটি অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হওয়া যে কিরূপ প্রয়োজন, ভাষায় তাহা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আপাততঃ কয়েকজন ছাত্র ছাত্রী ও অপর কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়া এই কার্য্যের প্রাথমিক উদ্যোগ করা হইতেছে। গ্রীষ্মাবকাশের পরে তাঁহারা জনসাধারণের, এবং বিশেষ ভাবে ছাত্রসাধারণের ও তাঁহাদিগের অভিভাবকগণের সাহায্য লইয়া ক্রমশঃ একটি শক্তিশালী সমিতি গঠন করিবার চেষ্টা করিবেন। কয়েকজন ছাত্রছাত্রী এই সঙ্ঘের স্বেচ্ছাসেবকরূপে গ্রীষ্মাবকাশের সময়ে এক আবেদন-পত্র লইয়া বন্ধুদিগকে ঐরূপ সমিতি গঠনের জন্য উৎসাহিত করিতে চেষ্টা করিবেন। যাঁহারা এই কার্য্যে যোগদান অথবা সাহায্য করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা এখনই স্বেচ্ছাসেবকগণের হস্ত হইতে সুনীতি সঙ্ঘের মুদ্রিত ফর্ম্ম লইয়া ইহার জন্য চাঁদা দিতে পারেন ; অথবা ইচ্ছা করিলে এখন হইতেই নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞাপত্র-(pledge) সংবলিত কার্ডে স্বাক্ষর করিয়া সঙ্ঘের সভ্য হইতে পারেন,"আমি চিন্তায়, বাক্যে ও কার্য্যে পবিত্র থাকিব। আমি নীতিবিরুদ্ধ সাহিত্য পাঠ হইতে, নীতিবিরুদ্ধ অভিনয়, নৃত্য ও চিত্র দর্শন হইতে বিরত থাকিব, এবং অপরকেও বিরত রাখিতে চেষ্টা করিব।" যাঁহারা সুনীতি সঙ্ঘে যোগদান করিতে অথবা ইহার বিষয়ে কিছু জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা অন্যতম অস্থায়ী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দত্ত, ৬নং রামকৃষ্ণ দাস লেন, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় অনুসন্ধান করিবেন। এক্ষণে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সঙ্ঘের অস্থায়ী সভাপতি এবং শ্রীযুক্তা কামিনী রায়, শ্রীজলধর সেন, মুজীবর রহমান, শ্রীযতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস, শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়গণ সহকারী সভাপতি হইয়াছেন।

আমদানী-শুল্ক বৃদ্ধি—

আমদানী শুল্কের নূতন আইন অনুসারে বিগত ২৫শে এপ্রিল হইতে কারখানা-উৎপাদিত প্রায় সমস্ত আমদানী পণ্যের উপর শতকরা ২০৲ টাকা শুল্ক নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যে সমস্ত জিনিষের উপর শতকরা ৫০৲ টাকা শুল্ক নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে, সেগুলির উপর বর্ত্তমানে মূল্যের হিসাবে শতকরা ১০৲ টাকা কর ধার্য্য হইয়াছে এবং অন্যান্য অধিকাংশ দ্রব্যের উপরই আরও অতিরিক্ত কর বসান হইবে। সুতা ব্যতীত বস্ত্র-শিল্পের অন্যান্য জিনিষ, কাগজ, কাচের জিনিষ, রবারের দ্রব্য, চামড়া, বিদ্যুৎ সম্পর্কিত জিনিষপত্র ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্ত পণ্যের উপর শতকরা ২০৲ টাকা হারে কর ধার্য্য হইয়াছে ; অর্থাৎ যে সমস্ত জিনিষ কারখানায় উৎপন্ন হয়, তাহার প্রায় সমস্তগুলির উপরই নূতন শুল্ক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

জার্ম্মাণ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভারতীয়দের বৃত্তি।—

"ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট অব ডিউটস্ অ্যাকাডেমি" জানাইতেছেন যে, বিভিন্ন জার্ম্মাণ বিশ্ব-বিদ্যালয় ১৯৩২—৩৩ সালের জন্য নিম্নলিখিত বৃত্তিগুলি ভারতীয় ছাত্রদের জন্য নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। ভারতীয় ছাত্রগণ উহার জন্য আবেদন করিতে পারেন—

(১) ব্রেস্‌লো—ব্রেস্‌লো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বৃত্তিতে বিনা বেতনে অধ্যয়নের ব্যবস্থা আছে ; এবং ৩০ মার্ক হাতখরচের বাবদ দেওয়া হইবে। (কেবল দর্শন, ভাষা, গণিত, শিল্পকলা এবং ভারত সম্বন্ধীয় বিষয়ের জন্য)।

(২) ড্রেস্‌ডেন—ড্রেস্‌ডেনের টেক্‌নোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটির বৃত্তিতে কেবল বিনা বেতনে অধ্যয়নের ব্যবস্থা আছে।

(৩) হোহেনহীম—হোহেনহীমের কৃষি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বৃত্তিতে বিনা বেতনে অধ্যয়নের এবং বিনা ব্যয়ে থাকিবার ব্যবস্থা আছে।

(৪) নুরণবার্গ—এই স্থানের বাণিজ্য ও শ্রমশিল্প বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বৃত্তিতে মেনসা একাডেমিতে বিনা বেতনে অধ্যয়নের ও বিনা ব্যয়ে খাইবার ব্যবস্থা আছে।

এই চারিটী বৃত্তি ১৯৩২ সালের নভেম্বর হইতে ১৯৩৩ সালের জুলাই পর্য্যন্ত চলিবে। যে সকল ভারতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় বিদেশে স্বীকৃত, সেই সকল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটগণ বৃত্তির জন্য আবেদন করিতে পারেন। যাঁহারা গ্রাজুয়েট নহেন, তাঁহারা যদি কোনরূপ সাহিত্য কিম্বা বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সাফল্য অর্জ্জন করিয়া থাকেন, তবেই তাঁহাদের আবেদন বিচার্য্য হইবে। আবেদনের সহিত যে অধ্যাপকের অধীনে আবেদনকারী অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহার প্রশংসাপত্র দিতে হইবে।

ল্যাবুনচুষ পুষ্প—

যে বালিকাটীর আলোক-চিত্র এখানে প্রকাশিত হইল, তাহার নাম—পুষ্পরাণী ঘোষ। (ল্যাবুনচুষ পুষ্প—এই নাম

শ্রীমতী পুষ্পরাণী ঘোষ—(ল্যাবুনচুষ পুষ্প)

রেডিও ব্রড্‌কাষ্টিং হইতে প্রদত্ত হয় এবং এই নামেই বালিকাটী সাধারণে পরিচিত ; মেয়েটীর বর্ত্তমান বয়স সাড়ে পাঁচ বৎসর। তিন বৎসর বয়স হইতেই মেয়েটী সঙ্গীত শিক্ষা করিতেছে। এক্ষণে ঠুমরী, খেয়াল, রামপ্রসাদী ও আধুনিক কণ্ঠ-সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া গায়ক মহলে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহার সঙ্গীত-শিক্ষক—শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার ঘোষ। ইনি

পুষ্পর খুল্লতাত এবং ইঁহারই কাছে পুষ্প বরাবর সঙ্গীত শিক্ষা করিতেছে। বালিকাটীর পিতার নাম শ্রীজহরলাল ঘোষ, নিবাস—৪৯ সচ্চাসীপাড়া রোড, কাশীপুর, কলিকাতা। বালিকাটী অনেক উপহার পাইয়াছে, তাহার মধ্যে কয়েকটীর উল্লেখ করা গেল ;—ঝামাপুকুরের রাজা—একটী হারমোনিয়ম্, আন্দুল মৌরীর জমিদার—একটী বীন্, বঙ্গীয় সঙ্গোপ-সভা—একটী এস্‌রাজ, B.N.R.—Bengali Association Kharagpur—একটী স্বর্ণ-পদক ; এতদ্ভিন্ন প্রচুর রৌপ্যপদক, খেলনা প্রভৃতি। বাংলায় এরূপ দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। এত অল্প বয়সে এরূপ প্রতিভার বিকাশ প্রশংসার্হ। বহু প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া পুষ্প বেশীর ভাগ প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া পারিতোষিক লাভ করিয়াছে।

এক কোটি পাউণ্ড ঋণ গ্রহণ—

ভারতের জন্য শতকরা ৫ পাউণ্ড হার সুদে এক কোটী পাউণ্ড (প্রায় ১৪ কোটী টাকা) ঋণ গৃহীত হইয়াছে। এক শত পাউণ্ডের ঋণপত্রের দাম ৯৫ পাউণ্ড। ১৯৪২—৪৭ সালে উহা পরিশোধ করা হইবে। নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক সরকারী ইস্তাহার প্রচারিত হইয়াছে ;—

অদ্য ভারত-সচিব এক কোটী পাউণ্ড ঋণের অনুষ্ঠানপত্র প্রচার করিতেছেন। উহা ১৯৪২-৪৭ সালে পরিশোধ করা হইবে। এক শত পাউণ্ডের ঋণের দাম বর্ত্তমানে ৯৫ পাউণ্ড হইবে। উহার সুদ শতকরা বার্ষিক ৫ পাউণ্ড হিসাবে প্রদত্ত হইবে। যদি পূর্ব্বে পরিশোধ নাও হয়, তাহা হইলেও ১৯৪৭ সালের ১৫ই জুন পরিশোধ করা হইবে। কিন্তু ভারত-সচিব লণ্ডন গেজেটে তিন মাস পূর্ব্বে নোটিশ দিয়া ১৯৪২ সালের ১৫ই জুনের পর যে কোন যান্মাষিক সুদের তারিখে উহা পরিশোধ করিতে পারিবেন। আগামী ২৭শে এপ্রিল লণ্ডনে ঋণ গ্রহণ আরম্ভ এবং ঐদিনই সমাপ্ত হইবে। ভারতবর্ষে কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, রেঙ্গুন ও করাচীস্থিত ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার অফিসে ঋণ প্রদত্ত হইতে পারিবে। উল্লিখিত স্থান সমূহে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের অফিসে অনুষ্ঠানপত্রের সর্ত্তাবলী সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে পারা যাইবে। ভারতবর্ষে রেলওয়ে ও অন্যান্য কার্য্যের জন্য শতকরা সাড়ে ছয় পাউণ্ড হারে ১৯৩২ সালে পরিশোধের সর্ত্তে গৃহীত ৬০ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছে।

এই ইস্তাহার প্রচারের পর বিগত ২৭শে এপ্রিল তারিখে অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিলাতে এই এক কোটী পাউণ্ড ঋণ পাওয়া গিয়াছে।

সার দোরাব টাটার দান—

বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ পার্শী ব্যবসায়ী এবং ক্রোড়পতি সার দোরাব টাটা তাঁহার তিন কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি দাতব্য কার্য্যে নিয়োজিত করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। প্রকাশ, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া সার দোরাব টাটা সম্পত্তি উয়াদিয়া চ্যারিটি ট্রাষ্টের আদর্শে একটি ট্রাষ্ট দলিলের খসড়া করিয়াছেন। কিন্তু এই দলিলের সর্ত্তগুলি সার দোরাবের জীবিতকালে কার্য্যকরী হইবে না। জীবিতকাল পর্য্যন্ত স্বত্বাধিকারী হিসাবে তাঁহার ট্রাষ্টের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব বর্ত্তমান থাকিবে। ট্রাষ্টের উদ্দেশ্য হইল—পৃথিবীর সর্ব্বত্র যে সমস্ত লোক হঠাৎ দৈব-দুর্ব্বিপাকে পতিত হইবে, তাহাদিগকে এবং জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সমূহকে—জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে—সকল প্রকারে সাহায্য করা। এই তিন কোটি টাকা ব্যতিরেকে সার দোরাব "অনারোগ্য ব্যাধিসমূহ" সম্পর্কে গবেষণা কার্য্যের জন্য বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে ২৫ লক্ষ টাকা পৃথক করিয়া রাখিয়াছেন। পৃথিবীর যে কোন স্থানে এইরূপ গবেষণা-কার্য্যের জন্য উৎসাহ দেওয়া হইবে এবং যাঁহারা তাঁহাদের প্রচেষ্টায় সফলতা লাভ করিবেন, তাঁহাদিগকে মোটা রকম পুরস্কার দেওয়া হইবে।

ভারতে জাপানী মাল—

১৯৩১ অব্দের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৩২ অব্দের মার্চ্চ মাসের হিসাবে জাপান ও ভারতবর্ষের মধ্যে বাণিজ্যে কতকগুলি অসুবিধা ঘটিয়াছিল। প্রথম ছয় মাস ভারতের আর্থিক অবস্থা ভাল না থাকায় এবং রাজনৈতিক অবস্থার কোন ঠিক-ঠিকানা না থাকায় ব্যবসায়ীরা দীর্ঘকালের জন্য কোন কনট্রাক্ট করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। পরে মহাত্মা গান্ধীর সহিত গবর্ণমেণ্টের একটা আপোষ রফা হওয়ায় ব্যবসায়ের অধোগতি সাময়িকভাবে বন্ধ হয়। অতঃপর সেপ্টেম্বর মাসে গ্রেটব্রিটেন স্বর্ণমান প্রত্যাহার

করায় আবার মুস্কিল হয়। সে সময় জাপান স্বর্ণমান বজায় রাখায়, মুদ্রা-বিনিময়-বিভ্রাটে পড়িয়া ভারতের বাজারে জাপানী মালের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া জাপানী ব্যবসায়ের প্রবল বিঘ্ন উৎপাদন করে। তদুপরি ভারত সরকার অর্থাভাবে পড়িয়া রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য আমদানী শুল্ক শতকরা ২৫৲ টাকা বৃদ্ধি করিয়া দেন। সর্ব্বোপরি জাপান মাঞ্চুরিয়ার হাঙ্গামায় জড়িত হইয়া পড়ায় জাপানের টাকার বাজারে টান পড়ে। ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি জাপান স্বর্ণমান পরিত্যাগ করে ; তখন জাপানী ব্যবসায়ীরা ভারতে সস্তাদরে মাল দিতে সক্ষম হওয়ায় তাহাদের ব্যবসায় উন্নতি লাভ করে। জানুয়ারী মাসে বিরামসন্ধি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা পুনরায় জটিল হইয়া উঠে। এই সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে জাপানী ব্যবসায়ের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। নিম্নে যে তালিকা প্রদত্ত হইল, তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, গত বৎসরের তুলনায় জাপান হইতে জুতা, কাপড় প্রভৃতির আমদানী হ্রাস পাইয়াছে বটে ; কিন্তু অন্যান্য দেশের তুলনায় জাপানের অংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, জাপানী মাল সস্তা বলিয়া অন্যান্য দেশের মাল অপেক্ষা জাপানী মালের ভারতে বেশী কাট্‌তি হয়। আমদানী শুল্ক বৃদ্ধি না পাইলে আরও অনেক জাপানী মাল ভারতে আসিত।

জিনিষের নাম	১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত।		
	১৯২৯-৩০	১৯৩০-৩১	১৯৩১-৩২
বুট ও জুতা	১৮১০৩৬৪৲	৫২৯৬৬৬৫৲	৪১৫৬০৬৬৲
কর্পূর	১৮৩৯৪২৫৲	৭৮৬৩৭০৲	৬৯৪৭১৮৲
সিমেণ্ট	৫৪১১১৪৲	৯৭১৫৯৭৲	৮১৭৮৭৩৲
প্রসেলিন	২৬৪২৬৪৯৲	১৭৫৯০৮৯৲	১৩৫৬০৮৭৲
কাচ ও কাচের জিনিষ	৬৪৪৩২৩৯৲	৪৭২৫৮৬৭৲	৩৩৮২২৫০৲
লৌহের জিনিষ	২২৩২৮১৮৲	১৭৫৮৮০৩৲	১২৬৯৩২০৲
বৈদ্যুতিক তার	১৯৮৪০৭৲	১৯১৩৯৪৲	১৭৬৪৭৮৲
কার্পাস সূতা	১৪৯০৬০৫৯৲	৭২৯৭৮২২৲	৬৯২৫৭৯৫৲
মোজা গেঞ্জি	১০০৬৮৪৩১৲	৬৯১১৮৬৩৲	৩৬৮৮৭২২৲
কোরা কাপড়	৭৬৩০৪২২৲	৩৪৭৯৪৪০০৲	২৪২০০৯২৮৲
ধোয়া কাপড়	২২৭৭৫৮২৲	৪০৬৮৮৯৫৲	৮০৭৮৯৮০৲
রঙ্গীন ও ছাপা	২৮৮০১৩১২৲	১১৮০৫৪৩৬৲	১৩৮৯৩৪৮৫৲
লেস ফিতা ইত্যাদি	১৭৪১০১৬৲	১১৫৩৮০২৲	৮৬৭৪৪০৲
রেশমী সূতা	১১৮৩৭৩৩৲	৭৯৪৯৩৩৲	৪৫১৫৭৬৲
মিশ্রিত রেশমী মাল	১৬৮৮১৫৮৲	১৪৯৭৩০৮৲	১৫৫৩৪৫৯৲
রেশমী কাপড়	১০৮৬৯২০৮৲	৫০৩২৭৮৲	৫৭৮৩৯০৭৲
পশমী কাপড়	৪৬০০৮৩৲	২৮৫৭৯৬৲	৬২৮২১৲
কৃত্রিম রেশমের কাপড়	—	৪৪৮০৫৩৮৲	১৭৬০৪৩৭৪৲
মিশ্রিত কৃত্রিম ঐ	—	১৯৭৭৮২৲	৩০৫০২৪৲

ম্যালেরিয়া—

ম্যালেরিয়ায় ত দেশ উজাড় হইয়া গেল। ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য কর্ত্তৃপক্ষের এবং দেশের প্রতি মমত্বশীল ব্যক্তিগণের উদ্বেগেরও সীমা নাই। দেশের এই শত্রুকে দমন করিবার জন্য নানা জনে নানা রকম পরামর্শ দিতেছেন। ম্যালেরিয়ার বাহন মশককে বধ করিয়া ম্যালেরিয়াকে খোঁড়া করিবার উদ্যোগ আয়োজন হইতেছে মন্দ নয়। কলিকাতায় যদি ম্যালেরিয়া আসিয়া থাকে, কিম্বা অদূর ভবিষ্যতে আসিবার সম্ভাবনা ঘটিয়া থাকে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া কলিকাতা কর্পোরেশন মশককুলকে

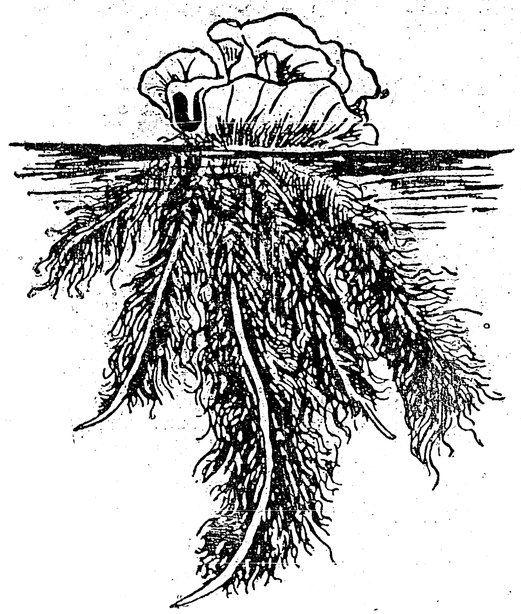

টোপাপানা

ধ্বংস করিবার জন্য বার্ষিক অনেক টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। ম্যালেরিয়াবাহী মশককুল যে জলে ডিম্ব প্রসব করে, সেই জলে কেরোসিন নিক্ষেপ করিয়া মশকের শাবকগুলিকে শ্বাসরোধ করিয়া মারিবার জন্য এই টাকা ব্যয় হইবে স্থির হইয়াছে। কেহ কেহ এই টাকার কিয়দংশ দিয়া কই মাছের চাষ করিবার পরামর্শ দিতেছেন; কারণ, ম্যালেরিয়া-মশার বাচ্চা কই মাছগুলির প্রিয়তম খাদ্য। কই মাছের ন্যায় চুণাপুঁটি, ট্যাংরা, বাটা এবং বড় মাছের ছোট ছোট পোনারা মশকের বাচ্চা খায়। সেইজন্য অনেকে আবার বাঙ্গলার পল্লীগুলিতে এই সকল মাছের চাষ করিবার পরামর্শ দিতেছেন। ইহা এক রকম ম্যালেরিয়া দমনের পদ্ধতি। কিছুদিন হইল, মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর, খাগড়ার ডাক্তার শ্রীযুক্ত পৃথ্বীশচন্দ্র রায় মশা মারিবার আর এক প্রকার পদ্ধতির আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি হাতে না মারিয়া মশার শাবকগুলিকে ভাতে মারিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি খাদ্যে বঞ্চিত করিয়া উহাদের ধ্বংস করিতে চাহেন।

ডাক্তার রায়ের পদ্ধতি অভিনবও বটে এবং বিজ্ঞানানুমোদিতও বটে; এবং দেখা যাইতেছে, বেশ ফলপ্রদও বটে। তিনি বলেন, বঙ্গদেশের পুকুরগুলিতে টোপাপানা নামে এক প্রকার পানা জন্মে। এই পানার শিকড়ের গায়ে এক প্রকার সরু সরু সূত্রবৎ পদার্থ লম্বমান ভাবে ঝুলিয়া থাকে। এই বস্তুটি মশক-শাবকের খাদ্য। উহারা যদি এই খাদ্য না পায় তাহা হইলে বাঁচিতে পারে না। ডাক্তার রায় পুকুরগুলি হইতে টোপাপানা তুলিয়া ধ্বংস করিয়া মশক শাবককে খাদ্যে বঞ্চিত করিতে চাহেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি এই বিষয়ে পরীক্ষা করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, এই উপায়ে তিনি অনেক পল্লীগ্রাম ম্যালেরিয়া-শূন্য করিয়াছেন, অনেক স্থানের ম্যালেরিয়া কমাইয়া দিয়াছেন। এমন কি তিনি ইচ্ছা করিলে ম্যালেরিয়া-শূন্য স্থানে টোপাপানার চাষ করিয়া ম্যালেরিয়ার সৃষ্টি করিতে পারেন। বীরভূমের ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত ডাক্তার পি, সি, রায়ের ম্যালেরিয়া দমনের এই পদ্ধতির অনুমোদন করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায়, অন্যান্য পদ্ধতির ন্যায় মশক ধ্বংস করিয়া ম্যালেরিয়া দমন করা যখন ডাক্তার রায়েরও উদ্দেশ্য, তখন তাঁহার পদ্ধতিটি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে মন্দ হয় না। টোপাপানা ধ্বংস করিলে আর কিছু না হউক, অন্ততঃ পুকুরগুলিও ত পরিষ্কার হইবে। তাহাও বড় কম লাভ নহে।

ভারতে বিদেশী বস্ত্র—

গত ১৬ই এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে সপ্তাহে ভারতের কোন্ বন্দরে কত হাজার গজ কাপড় আসিয়াছে

এবং পূর্ব্ব সপ্তাহে ও ১৯৩১ সালের অনুরূপ সপ্তাহে কত আমদানী হইয়াছিল তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল—

কোরা কাপড়

বন্দর,	আলোচ্য সপ্তাহ,	পূর্ব্ব সপ্তাহ,	গত বৎসর—
কলিকাতা	১৪৭৯	৩৫৬২	৪৫১৮
বোম্বাই	১৩৫২	১৬৫২	১৪৯৬
করাচী	৪৪	২০১	৩৯
মান্দ্রাজ	৯৯৯	৯৬৯	৫৮৪
রেঙ্গুন	২০৮	১৮৪	৩৬৬

ধোয়া কাপড়

কলিকাতা	২০৪	১৩৮৪	৫৭৪
বোম্বাই	১২৫৯	১৮৫০	৪৯৬
করাচী	৬৪৩৫	১০৫৭	৪৩২৪
মান্দ্রাজ	৭৮৪	২৫২	৪৩৫
রেঙ্গুন	১১১৪	১৪৯৬	৬২১

রঙ্গীন ও ছাপা

কলিকাতা	৩৭০	১৭২২	১০৩৯
বোম্বাই	৩১৫৪	৩৮৯০	৯৯১
করাচী	৩০৭৯	৭১৫	১৭১০
মান্দ্রাজ	২৭৪	১৫৬	২১৫
রেঙ্গুন	১৪৫৬	১৬৭৬	৬১৯

গত তিন মাসে কোন্ দেশ হইতে কত লক্ষ গজ কাপড় আসিয়াছে তাহার হিসাব এবং ১৯৩১ সালের জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কোন্ দেশ হইতে কত লক্ষ গজ কাপড় আসিয়াছে তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

কোরা কাপড় (লক্ষ গজ)

দেশ	ডিসেম্বর,	জানুয়ারী,	ফেব্রুয়ারী	১৯৩১
বিলাত	৪০	৪৩	৫৫	৫৪৮
জাপান	১২১	১৮০	১৯৩	১৯০
আমেরিকা	×	×	১	২
অন্যান্য দেশ	×	১৫	১৩	১৬

ধোয়া কাপড় (লক্ষ গজ)

বিলাত	৮৯	১৬২	১৪৪	১৯৭৭
অন্যান্য দেশ	৬৪	৮৩	৫৭	৬৫২

রঙ্গীন ও ছাপা

বিলাত	৭৩	১০৪	৯০	৯৮৪
ইয়োরোপ	৭	১৫	৬	১৫২
জাপান	৫৭	১০৭	৭০	৯০৮
অন্যান্য দেশ	২	১	৩	৩২

বিলাতে ভারতীয় খেলোয়াড়গণ—

ঈদ উৎসব উপলক্ষে বিলাতে নিখিল ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড় দলকে ইণ্ডিয়ান সোসিয়েল ক্লাব এক ভোজসভায় আপ্যায়িত করেন। ঐ ভোজে বহু ভারতীয় এবং বৃটিশ উপস্থিত ছিলেন। মিঃ ইরুলকার ভারতবর্ষের মঙ্গল কামনা করিয়া এক উদ্বোধনী বক্তৃতা দেন এবং ঈদ পর্ব্বের ত্যাগের কথার উপর জোর দেন। মিঃ শাপূরজী শাকলাৎওয়ালা অতিথি-বর্গের মঙ্গল কামনা করিয়া বলেন যে, নিখিল ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড় দলের ইংলণ্ডে উপস্থিতি একটী বৈশিষ্ট্যমূলক ব্যাপার। এই দল বহু প্রকার ব্যক্তি লইয়া গঠিত এবং ইহা দ্বারা বৃটেনের সহিত ভারতের ঐক্যবদ্ধতার সূচনা করিতেছে। মিঃ সি, কে, নাইডু বলেন যে, পোরবন্দরের মহারাজা খেলোয়াড় দলকে বক্তৃতা দিতে নিষেধ করিয়াছেন। লণ্ডন মস্‌জিদের ইমাম বলেন যে, এই প্রকার সভাসমিতির দ্বারা ইঙ্গ-ভারতীয় মিলনের পথ প্রশস্ত হইবে এবং ভারতেও ইহার অনুকরণ হইবে। লর্ড সভা ও কমন্স সভার ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ ভারতীয় খেলোয়াড়দিগকে রিগত ২৬শে এপ্রিল কমন্স সভায় এক ভোজে আপ্যায়িত করিয়াছেন। লর্ড এবিসাম এই সভার সভাপতি হইয়াছিলেন।

ভারতে আমদানী রপ্তানি—

"ষ্টেটস্‌ম্যান" পত্রিকা বলিতেছেন—ভারতে যাভা চিনির আমদানী একেবারে নাই বলিলেই চলে। মনে হয় যে, ভারতে গুড়ের ব্যবহার খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে; কেন না বিদেশী চিনির আমদানী শতকরা ৪০ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে, অথচ ভারতবর্ষে তদনুরূপ চিনি মাত্রই প্রস্তুত হয় নাই।

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য—
মার্চ্চ মাসের হিসাব—

গত মার্চ্চ মাসে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে ১০ কোটী ৯১ লক্ষ টাকার মাল আমদানী এবং ১৩ কোটী ২৩ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছে।

কলিকাতা বন্দরের শুল্ক-সংগ্রাহক মহাশয়ের প্রচারিত বিবরণে প্রকাশ—

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সান্ন্যাল

গত মার্চ্চ মাসে কলিকাতা বন্দরে আমদানীর পরিমাণ ২ কোটী ৬০ লক্ষ টাকা (ফেব্রুয়ারী) হইতে ২ কোটী ৪৯ লক্ষ টাকায় নামিয়াছে। গত বৎসর মার্চ্চ মাসে ছিল ৩ কোটী ৪৫ লক্ষ টাকা। রপ্তানীর পরিমাণ ও মূল্য হিসাবে ৪ কোটী ২৪ লক্ষ হইতে ৩ কোটী ৭৮ লক্ষ টাকায় নামিয়াছে। গত বৎসর মার্চ্চ মাসে ছিল ৪ কোটী ৩ লক্ষ টাকা। কোন্ জিনিষ কত লক্ষ টাকার আসিয়াছে এবং গত বৎসরের মার্চ্চ মাসের তুলনায় কত লক্ষ টাকা হ্রাস-বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

কাপড়	৪৩ লক্ষ	হ্রাস ৭ লক্ষ
কলকব্জা	৩১ „	„ „ ৮ „
তৈল ও খনিজ	১৭ „	বৃঃ ১ „
লৌহ ও ইস্পাত	১৫ লক্ষ	হ্রাঃ ১০ „
চিনি	১৩ „	„ „ ৪ „
ধাতু	১২ „	বৃঃ ১ „
মদ্য	৬ „	×
তামাক	১ „	হ্রাঃ ৫ „
লৌহের জিনিষ	৬ „	„ „ ৩ „

প্রধান প্রধান সমস্ত জিনিষেরই আমদানী হ্রাস পাইয়াছে। কাপড়ের আমদানী ২ কোটী ১০ লক্ষ গজ হইতে ১ কোটী ৯০ লক্ষ বর্গগজে এবং মূল্য হিসাবে ৩৬ লক্ষ টাকা হইতে ৩৫ লক্ষ টাকায় নামিয়া গিয়াছে। চিনির আমদানী ১৫ হাজার টন হইতে ১০ হাজার টনে নামিয়াছে এবং মূল্য হিসাবে ১৬ লক্ষ টাকা হইতে ১২ লক্ষ টাকায় নামিয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের বাঙ্গালী চীফ ইঞ্জিনীয়ার

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সান্ন্যাল কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ ইঞ্জিনীয়ার নিযুক্ত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। এতকাল এই পদটী ইয়োরোপীয়দিগেরই অধিকারভুক্ত ছিল। ইনি মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের নিকটবর্ত্তী মঙ্গলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ হইতে বাহির হইয়া কলিকাতা কর্পোরেশনে সামান্য কর্ম্ম গ্রহণ করেন। স্বীয় দক্ষতা ও কার্য্যপটুতার ফলে

জ তিনি সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগরী কলিকাতার চীফ জিনীয়ার।

প্রবাসে ভারতীয়গণ—

বর্ত্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকাস্থিত ভারতবাসীর অধিকার ক্ষে ভারত-সরকারের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের কটী নূতন চুক্তি হইয়াছে; কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সব ভারতবাসী স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছেন, তাঁহাদের ধিকার রক্ষার এ পর্য্যন্ত তেমন কোন চেষ্টা হয় নাই। ম্নে বিদেশে মোট কতজন ভারতবাসী আছেন এবং কোন্ দেশে কতজন আছেন, তাহা দেওয়া হইল।

ভারতের বাহিরে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন দেশে বর্ত্তমানে মোট ২৫ লক্ষ ২৫ হাজার ৬৫ জন ারতবাসী আছেন এবং বৃটিশ সাম্রাজ্য ছাড়া অন্যান্য দেশে মাট ১ লক্ষ ৫ শত ২৫ জন ভারতবাসী আছে। বিভিন্ন দেশে ভারতবাসীর সংখ্যা এইরূপ—

দেশ	ভারতীয়ের সংখ্যা	আদম-সুমারীর বৎসর
সিংহল	৯৫৯০০০	১৯২৯
বৃটিশ মালয়	৭০০০০০	১৯২৯
হংকং	২৫৫৫	১৯১১
মরিসস	২৮,০২৫	১৯২৮
সিসেইলস	৩৩২	১৯১১
জিব্রালটার	৫০	১৯২০
নাইজিরিয়া	১০০	১৯২০
কেনিয়া	২৬৭৫৯	১৯২৬
উগাণ্ডা	১১৬১৩	১৯২৬
নিয়াসাল্যাণ্ড	৫১৫	১৯২১
জাঞ্জিবর	১২৮৪১	৯২১
তাঙ্গানিকা	১৮৪৮৩	১৯২৭
জ্যামেকা	১৭৬৭১	১৯১৮
ত্রিনিদাদ	১৩,৫৪২	১৯২৯
বৃটিশ গিয়েনা	১২৮২০৯	১৯২৯
ফিজি	৬৮৭১৩	১৯২১
বাসুতোল্যাণ্ড ও সোয়াজিল্যাণ্ড	১৮৬	১৯১১
রোডেশিয়া	১৩০৬ (এশিয়াবাসী)	১৯২১
কানাডা	১২০০	১৯২০
অষ্ট্রেলিয়া	২৬০৬	১৮২২
দক্ষিণ আফ্রিকা	১৬১,৩৯	১৯২১
আমেরিকার যুক্তরাজ্য	৩১৭৫ (এসিয়াবাসী)	১০১০
মাদাগাস্কার	৫২৭২	১৯১৭
রিইউনিয়ন	২১৯৪	১৯২৫
ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ	৫০০০০ (?)	১৯২০
সুরিনাম	৩৪৯৫৬	১৯২০
মোজাম্বিক	১১০০ (এশিয়াবাসী)	১৯২২
পারস্য	৩৮২৭	১৯২২

আমেরিকা যুক্তরাজ্যে প্রবাসী ভারতবাসীর সংখ্যা ৩১৭৫ জন ধরা হইয়াছে, কিন্তু এই সংখ্যা ঠিক বলিয়া মনে হয় না; কেননা, আমেরিকায় গদর দল নামে যে ভারতীয় বিপ্লবীদল আছে, তাহাদেরই সদস্য সংখ্যা প্রায় ৩ হাজার বলিয়া প্রকাশ।

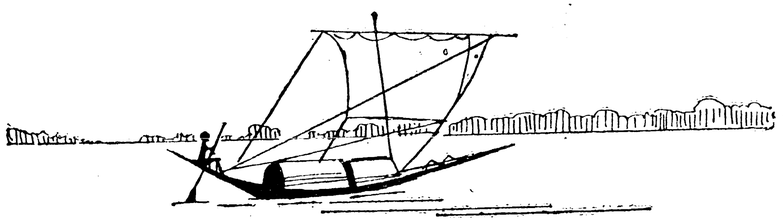

সাহিত্য-সংবাদ

নব প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন প্রণীত গানের বহি "গীতিগুঞ্জ" ; মূল্য—২৲

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত গল্পের বই "আকাশ প্রদীপ" ; মূল্য—৷৷৵০

শ্রীশচীন্দ্রকুমার সিংহ প্রণীত "ব্যথার সাথী" ; মূল্য—১৷০

শ্রীবিধুভূষণ জানা প্রণীত "স্বাস্থ্য ও ব্যায়াম" ; মূল্য—১৷৵০

শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "দেবদাসী"—মূল্য ১৲

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "স্বপ্ন-ছবি" মূল্য—১৲

শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত কৌতুক-নাটিকা "আপন ভোলা" ; মূল্য—৷০

শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত নাটক "প্রহ্লাদ" ও "গয়াসুর" মূল্য প্রত্যেক খানি ১

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ঐতিহাসিক নাটক "ভাস্কর পণ্ডিত"—১৷

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত 'রহস্য-লহরী' উপন্যাস মালায় অন্তর্গত ১৬৪নং উপন্যাস "চীনের চাতুরী" ও ১৬৫নং উপন্যাস "পায়রা ও হীরার তারা" প্রত্যেকখানি—৸

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "রাজ্যশ্রী" মূল্য—৷৷০

নিবেদন

আগামী আষাঢ় মাসে 'ভারতবর্ষে'র বিংশ বর্ষ আরম্ভ হইবে।

ভারতবর্ষের মূল্য মণিঅর্ডারে বার্ষিক ৬৷৵০, ভি, পিতে ৬৷৷৴০, ষাণ্মাসিক ৩৴০ আনা, ভি, পিতে ৩৷৷০। এই জন্য ভি, পিতে ভারতবর্ষ লওয়া অপেক্ষা **মণিঅর্ডারে মূল্য প্রেরণ করাই সুবিধাজনক।** ভি, পির টাকা বিলম্বে পাওয়া যায় ; সুতরাং পরবর্ত্তী সংখ্যার কাগজ পাইতে বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা। **২০শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে টাকা না পাওয়া গেলে আষাঢ় সংখ্যা ভি, পি করা হইবে।** পুরাতন ও নূতন গ্রাহকগণ কুপনে কাগজ পাঠাইবার পূর্ণ নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ কুপনে **গ্রাহক নং** দিবেন। নূতন গ্রাহকগণ **নূতন** বলিয়া উল্লেখ করিবেন ; নতুবা টাকা জমা করিবার বিশেষ অসুবিধা হয়।

পুনশ্চ—এই ঊনবিংশ বর্ষকাল "ভারতবর্ষে" সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের যে সকল শ্রেষ্ঠ গবেষণা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠক-পাঠিকা মহোদয়গণের অগোচর নাই। কেবল এক বৎসরের কথাই বলি—ঊনবিংশ বর্ষে কিঞ্চিদধিক ২০০০ পৃষ্ঠা পঠিতব্য বিষয়, ৬০ খানি বহুবর্ণ চিত্র ও ন্যূনাধিক ৯০০ একবর্ণ চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। আর একটী বিষয় বিশেষ অনুধাবন-যোগ্য ; এই বৎসরে চারিখানি খ্যাতনামা কথা-শিল্পীর উপন্যাস সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। বিংশ বর্ষেও এই রীতি অনুসৃত হইবে। আমাদের সৌভাগ্য এই যে, প্রথম বর্ষ হইতে "ভারতবর্ষ" যে শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব লাভ করিয়াছিল, আজও তাহা একটুও ম্লান হয় নাই। বিংশ বর্ষের জন্য "ভারতবর্ষ" কিরূপ আয়োজন করিয়াছে, আমরা নিজ মুখে সে সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতে চাহি না—বিগত ঊনবিংশ বর্ষের "ভারতবর্ষে"র পরিচালনার কথা আলোচনা করিলেই পাঠকগণ স্বয়ং তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কর্ম্মকর্ত্তা—"**ভারতবর্ষ**"

Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJAE.
of Messrs. GURUDAS CHATTERJEA & SONS.
201, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.

Printer—NARENDRANATH KUNAR.
THE BHARATVARSHA PRINTING WORKS.
203-1-1, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.